Preface

With its grounding in the "guiding pillars of Access, Equity, Equality, Affordability and Accountability," the New Education Policy (NEP 2020) envisions flexible curricular structures and creative combinations for studies across disciplines. Accordingly, the UGC has revised the CBCS with a new Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP) to further empower the flexible choice based credit system with a multidisciplinary approach and multiple/ lateral entry-exit options. It is held that this entire exercise shall leverage the potential of higher education in three-fold ways - learner's personal enlightenment; her/his constructive public engagement; productive social contribution. Cumulatively therefore, all academic endeavours taken up under the NEP 2020 framework are aimed at synergising individual attainments towards the enhancement of our national goals.

In this epochal moment of a paradigmatic transformation in the higher education scenario, the role of an Open University is crucial, not just in terms of improving the Gross Enrolment Ratio (GER) but also in upholding the qualitative parameters. It is time to acknowledge that the implementation of the National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF)and its syncing with the National Skills Qualification Framework (NSQF) are best optimised in the arena of Open and Distance Learning that is truly seamless in its horizons. As one of the largest Open Universities in Eastern India that has been accredited with 'A' grade by NAAC in 2021, has ranked second among Open Universities in the NIRF in 2024, and attained the much required UGC 12B status, Netaji Subhas Open University is committed to both quantity and quality in its mission to spread higher education. It was therefore imperative upon us to embrace NEP 2020, bring in dynamic revisions to our Undergraduate syllabi, and formulate these Self Learning Materials anew. Our new offering is synchronised with the CCFUP in integrating domain specific knowledge with multidisciplinary fields, honing of skills that are relevant to each domain, enhancement of abilities, and of course deep-diving into Indian Knowledge Systems.

Self Learning Materials (SLM's) are the mainstay of Student Support Services (SSS) of an Open University. It is with a futuristic thought that we now offer our learners the choice of print or e-slm's. From our mandate of offering quality higher education in the mother tongue, and from the logistic viewpoint of balancing scholastic needs, we strive to bring out learning materials in Bengali and English. All our faculty members are constantly engaged in this academic exercise that combines subject specific academic research with educational pedagogy.We are privileged in that the expertise of academics across institutions on a national level also comes together to augment our own faculty strength in developing these learning materials. We look forward to proactive feedback from all stakeholders whose participatory zeal in the teaching-learning process based on these study materials will enable us to only get better. On the whole it has been a very challenging task, and I congratulate everyone in the preparation of these SLM's.

I wish the venture all success.

Professor Indrajit Lahiri
Vice Chancellor

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) & Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes

Course Type : Multi-Disciplinary Courses (MDC)

Course Title : Chemistry in Daily Life

Course Code : NMD-CH-01

First Print : April, 2025

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি ও জাতীয় শিক্ষানীতি (2020) অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the University Grants Commission– Distance Education Bureau

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

Four Year Undergraduate Degree Programme

Under National Higher Education Qualifications Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Course Type : Multi-Disciplinary Courses (MDC)

Course Title : Chemistry in Daily Life
Course Code : NMD-CH-01

: Board of Studies :

Members

Prof. Bibhas Guha
(Chairperson)
Director, School of Sciences,
NSOU

Professor Chitta Ranjan Sinha
Department of Chemistry,
Jadavpur University, Kolkata

Professor Jayanta Maity
Department of Chemistry,
Diamond Harbour Women's University,
Sarisha, South 24-Pargana

Dr. Sukanya Chakraborty
Associate Professor,
Department of Chemistry,
Lady Brabourne College, Kolkata

Dr. Partha Sarathi Guin
Associate Professor,
Department of Chemistry,
Shibpur Dinobundhoo Institution (College), Howrah

Dr. Paritosh Biswas
Associate Professor,
Department of Chemistry,
Chakdah College, Nadia

Dr. Sanjay Roy
HOD & Associate Professor of Chemistry, NSOU

Dr. Sintu Ganai
Assistant Professor of Chemistry, NSOU

Dr. Puspal Mukherjee
Assistant Professor of Chemistry, NSOU

: Course Writer :

Unit–1 to 6 : Dr. Sintu Ganai
Associate Professor of Chemistry, NSOU

Unit–6 to 10 : Dr. Puspal Mukherjee
Assistant Professor of Chemistry, NSOU

: Course Editor :

Unit–1 to 5 : Dr. Puspal Mukherjee
Assistant Professor of Chemistry, NSOU

Unit–6 to 10 : Dr. Sintu Ganai
Associate Professor of Chemistry, NSOU

: Format Editor :
Dr. Sintu Ganai
Assistant Professor, Department of Chemistry
School of Sciences, NSOU

Notification

All rights reserved. No part of this Study material be reproduced in any form without permission in writing from Netaji Subhas Open University.

Ananya Mitra
Registrar(Add'l Charge)

Netaji Subhas Open University

UG : Chemistry (MDC)

Course Title : Chemistry in Daily Life
Course Code : NMD-CH-01

একক ১	:	খাদ্য রসায়ন	৭
একক ২	:	পুষ্টিবিজ্ঞান	১৯
একক ৩	:	খাদ্যের বিষ-বিষয়ক বিজ্ঞান	৪০
একক ৪	:	সন্ধান	৪৯
একক ৫	:	খাদ্য প্রযুক্তি	৬৪
একক ৬	:	জলদূষণ	৮৪
একক ৭	:	বায়ুদূষণ	৯৮
একক ৮	:	জ্বালানী	১১৯
একক ৯	:	সাবান ও পরিষ্কারক	১৩৭
একক ১০	:	প্রসাধন সামগ্রী এবং রঞ্জকপদার্থ	১৫১

একক ১ ❑ খাদ্য রসায়ন

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য
১.১ প্রস্তাবনা
১.২ খাদ্যের রাসায়নিক যৌগ
১.২.১ জল
১.২.২ শর্করাজাতীয় যৌগ
১.২.৩ প্রোটিন
১.২.৪ তেল ও চর্বিজাতীয় যৌগ
১.২.৫ ভিটামিন
১.২.৬ খনিজ বা মিনারেল
১.২.৭ খাদ্যদ্রব্যে রং
১.২.৭.১ ক্যারোটিনয়েড
১.২.৭.২ ক্লোরোফিল
১.২.৭.৩ হিমোগ্লোবিন
১.২.৭.৪ সাইটোক্রোম
১.২.৭.৫ ফ্লেভোন ও ফ্লেভোনয়েড
১.২.৭.৬ এন্থসায়ানিন
১.২.৭.৭ কৃত্রিম রং
১.২.৮ খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ (ফ্লেভার)
১.২.৯. জিন পরিবর্তিত (মডিফাইড) খাদ্য
১.২.১০ বিষকারী দ্রব্য
১.২.১০.১ বিষকারক প্রাকৃতিকভাবেই খাবারে থাকা
১.২.১০.২ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণজাত
১.২.১০.৩ খাবারের নানা রাসায়নিক
১.২.১০.৪ ব্যবহার থেকে আসা রাসায়নিক

১.২.১০.৫ দূষণকারী রাসায়নিক পরিবেশ থেকে খাদ্য আসা
১.২.১১ হোমো-সেলুলোজ, লিগনিন ও অন্যান্য রাসায়নিক
১.২.১২ এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট
১.৩ সারাংশ
১.৪ অনুশীলনী

১.০ উদ্দেশ্য

খাদ্যের মধ্যে কি কি রাসায়নিক যৌগ আছে, কি কি বিভিন্ন শ্রেণীর তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে। ভিন্ন-ভিন্নভাবে বা শ্রেণীগতভাবে ওদের কি কি গুণ তাও জানা দরকার। রাসায়নিক গুণ বিচার করেই খাদ্য কি রকম পুষ্টি দেবে, প্রক্রিয়াতে কি রকম হবে, কি রকম পুষ্টি বদলে যাবে, কিভাবে ও কি রকম হজম হবে, এবং স্বাস্থ্য ও শরীরের কি কি রকম সুবিধা হবে এদের ধারণা জন্মাবে। পৃথিবীর যে-কোন দ্রব্য (ম্যাটার বা সাবস্টেনস) অনেক রাসায়নিক দ্রব্যের সমষ্টি বা মিশ্রণ। মৌলিক কণাগুলো নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক ধর্ম হেতু যুক্ত হয়, এরা রাসায়নিক যৌগ। খাদ্যেও বলাবাহুল্য হাজার হাজার যৌগ আছে। অধাতু মৌলিক পদার্থের মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে; নাইট্রোজেন ও ফরফরাস বেশ খানিকটা; তারপর সালফার, ক্লোরিন ও অন্যান্যেরা রাসায়নিক যৌগে আছে। ধাতুর মধ্যে সোডিয়াম, কেলসিয়াম, পটাশিয়াম, লৌহ, তামা, দস্তা, সিলেনিয়াম ত আছেই এবং আরও অনেক ধাতুর অণু খুব অল্প অল্প পরিমাণে থাকে। এই মৌলিক অণু থেকে নানা রকমের যৌগ হয়; যৌগগুলো কয়েকটা শ্রেণীর হয়, যেমন—কার্বহাইড্রেট বা শর্করা, চর্বি, প্রোটিন, জল, অনেক রকমের ভিটামিন ও হরমোন, উদ্ভিদখাদ্যে ক্লোরোফিল, প্রাণীজাতীয় খাদ্যে হিমোগ্লোবিন বা এর মত অক্সিজেন ব্যবহারকারী যৌগ; কিছু কিছু যৌগ মিলে ফাইবার তৈরী করে—এই নানা রকমের মৌলিক থেকে যৌগ রাসায়নিক খাদ্যে থাকে। অনুঘটক (এনজাইম) রাসায়নিকভাবে প্রোটিন, কিন্তু খাবারে থেকে অনেক প্রক্রিয়া করে। এরা সবাই যেমন—জল, শর্করা, প্রোটিন, চর্বি, অনেক রকমের ভিটামিন, নানা রকমের ধাতু (বেশির ভাগ পুষ্টিতে লাগে এবং কিছু বিষক্রিয়া করে), ফাইবার, অনেক রকমের এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইত্যাদির জ্ঞান দরকার। এদের রাসায়নিক গঠন কি; গুণাগুণ কি যাতে নিজের মধ্যে বা অন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে কি ব্যবহার করতে পারে; পুষ্টি বা অপুষ্টি কিভাবে করতে পারে। খাদ্য রসায়ন এই এই বিষয়ে আমাদের অবহিত করে।

১.১ প্রস্তাবনা

এই দ্রব্যগুলোকে রাসায়নিক হিসাবে বিচার করা সুবিধাজনক। মহাবিশ্বে যত দ্রব্য আছে এরা ৯২ বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ (এলিমেন্ট)-এর কণাগুলো নানাভাবে রাসায়নিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হাজার হাজার যৌগের সৃষ্টি করে। এই সব রাসায়নিক যৌগগুলোর নাম ও শ্রেণী বিচার করে চিহ্নিত করা হয়। এদের ধরণ, চরিত্র বা গুণাগুণ জানা আছে এবং জানা যেতেও পারে রসায়নশাস্ত্র অনুযায়ী।

রসায়নিক বন্ধনে তৈরী নানা শ্রেণীর যৌগ খাদ্যদ্রব্যে থাকে পাশাপাশি এমনিতে বা দ্রবিত হয়ে, কখনও বা নানারকম রাসায়নিক বা কায়িক (ফিজিক্যাল) বন্ধনে বা কোষ বন্ধনী (সেল ওয়াল)-র আবরণীতে। বিশেষ করে রাসায়নিক যৌগই গুণাগুণ ঠিক করে দেয় যেগুলো খাদ্যের গুণের রকম ঠিক করে। খাদ্য পুষ্টিকর হবে কি না, ভালমত জারিত হবে কি না, শরীরে গ্রহণীয় হবে কি না অথবা, খাদ্যের রান্না, অন্য প্রক্রিয়া বা সংরক্ষণ যে যে প্রযুক্তিতে সম্ভাব্য হতে পারে এর বিচার সাধারণভাবে খাদ্যের রাসায়নিক চেহারার উপর নির্ভর করবে। সুতরাং অন্য সব বস্তু, যাকে নিয়ে কোন কাজ বা প্রযুক্তি করার কথা এদের মতই খাদ্যের রাসায়নিকের জ্ঞান অবশ্য থাকা দরকার। খাদ্য অম্ল না ক্ষার, অক্সিজেন নেবে না বাদ দেবে, কি কি বন্ধন তৈরী করতে পারবে, যেমন—আয়নজাত, হাইড্রোজেন বা হাইড্রোফোবিক, কোথায় কি শুষে যাবে (এ্যাবজার্ব বা এ্যাডজার্ব), দ্রবণীয়তা কি রকম বা কি রকমভাবে বদলাবে ইত্যাদি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় খাদ্য নিয়ে যে কোন কাজেই লাগবে। খাদ্য বা খাদ্যাংশের রাসায়নিক চেহারাই এই সব গুণাগুণের হদিস দেবে। এদের রাসায়নিক ভাবে বিচার করা হয়েছে এবং কিছু কিছু গুণ, প্রক্রিয়াজাত পরিবর্ত্তন এবং পুষ্টি নিয়ে ভাবা হয়েছে। বস্তুগত (ফিজিক্যাল) গুণ এই আলোচনায় খুব দরকার হয় না বলে এদের আলোচনা করা হয়নি; আপেক্ষিক গুরুত্ব (স্পেসিফিক গ্রাভিটি) এবং রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স এদের গুরুত্ব আছে। আর, খাদ্যের জীবাণুবিদ্যা বিস্তৃত এবং আলাদাভাবে পড়তে হয়। খাদ্যের প্রক্রিয়াকরণও অনেক বিস্তৃত এবং আলাদা অধ্যয়ন করতে হয়।

১.২ খাদ্যের রাসায়নিক যৌগ

খাদ্যে অনেক অনেক শ্রেণীর রাসায়নিক যৌগ আছে। আবার প্রত্যেক শ্রেণীতে অনেক আলাদা আলাদা যৌগ আছে। এদের অনেকটাই যে-কোন একটি খাদ্যে থাকতে পারে, কম বা বেশী পরিমাণে। সংক্ষেপে কিছু বিবেচনা করা যেতে পারে।

১.২.১ জল

কাঁচা খাদ্য প্রাণীজ বলে জল থাকবেই, সাধারণভাবে ১০ থেকে ৯০ শতাংশ। বদ্ধ এবং মুক্ত দুভাবেই থাকে। কয়েকরকমে বদ্ধ থাকতে পারে, যেমন—ক্রিষ্টাল এবং যৌগের খাঁচা বা আকৃতিতে অপরিহার্য্য, ক্যাপিলারীর জন্য বিশেষ উপস্থিতি এবং হাইড্রোজেন বন্ধন-জনিত ইত্যাদি। মুক্ত জলের আলগা এবং আলাদা উপস্থিতি, দরকার মত সহজেই আসা-যাওয়া বা আনাগোনা করতে পারে, এবং রাসায়নিক ক্রিয়া করতে পারে। এছাড়া বাইরের পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখে যেমন শুষ্ক আবহাওয়ায় বাস্প হয়ে বেরিয়ে যায় এবং আর্দ্র পরিবেশে জলীয় বাষ্প বাইরে থেকে ঢুকে খাদ্যকে ভিজিয়ে দেয়। এই দেয়া এবং নেয়ার প্রক্রিয়া চলে যে পর্য্যন্ত বাইরের বায়ুর জলের চাপ (ভ্যাপার প্রেশার) খাদ্যের ভেতরের জলের চাপ সমান হয়। এই সমানীকৃত জলজ চাপ সৃষ্টিকারী জলকে সন্তুলিত (ইকুইলিব্রিয়াম ময়েশ্চার কনটেন্ট) বলা হয়। বলাবাহুল্য মুক্ত জলই এই প্রক্রিয়াতে ভাগ নেয়।

রসায়নগতভাবে জল একটি খুব সরল ও সাধারণ যৌগ, শুধু হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন যারা খুব

ওতঃপ্রোতভাবে জৈব রাসায়নিক যৌগতে উপস্থিত আছে। অন্য অণু উপস্থিত থাকলে কার্যকারিতা সীমাবদ্ধ হতে পারত—সব প্রক্রিয়াতে সাধারণভাবে থাকতে পারত না। তবে এই সরল যৌগ এমনিতে বাষ্প হতই, যদি না হাইড্রোজেন বন্ডের সাহায্যে অসংখ্য H_2O অণু মিলে সর্বত্র সহজে ব্যবহার ও রক্ষা করা যায় এমন একটি অভূতপূর্ব তরল পদার্থের সৃষ্টি করত।

১.২.২ শর্করাজাতীয় যৌগ

কয়েক রকমের চিনিজাতীয় লম্বা কার্বন শৃংখলের এ্যালকোহল, এ্যালডিহাইড এবং কিটোন থাকে মনোসেকারাইড, ডাইসেকারাইড, ট্রাইসেকারাইড, ওলিগোসেকারাইড ও পলিসেকারাইড হিসেবে। গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ ও গ্যালাকটোজ মনোসেকারাইড; চিনি (সুক্রোজ বা কেইন সুগার) ও ল্যাকটোজ ডাইসেকারাইড; র‍্যাফিনোজ ট্রাইসেকারাইড; কয়েকটা জানা ও অজানা ওলিগোসেকারাইড; এবং স্টার্চ, গ্লাইকোজেন ও সেলুলোজ পলিসেকারাইডের দৃষ্টান্ত।

তাছাড়া পেন্টোজ চিনি আছে কয়েকরকমের যাদের মধ্যে রাইবোজ খুব দরকারী বিশেষ করে ডি. এন. এ-তে থাকে বলে।

জীবনবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানের কয়েক রকম প্রক্রিয়াতে এই শর্করাজাতীয় যৌগগুলি অনেক কাজ করে থাকে। প্রধানতঃ শর্করাজাতীয় খাদ্য থেকে জৈব অনুঘটকের সাহায্যে জারিত হয়ে গ্লুকোজ তৈরী হয়। গ্লুকোজ খুব দরকারী রাসায়নিক। শরীরের পুষ্টির কাজ ছাড়াও এর এবং সুক্রোজের অনেক প্রযুক্তিগত ব্যবহার আছে। মনোসেকারাইডগুলোর রিডিউজ হওয়ার প্রবণতা খুব বেশী।

এইজাতীয় যৌগ সাধারণতঃ ভেঙে ভেঙে বিশেষতঃ জলবিভাজিত (হাইড্রলাইজ) হয়ে গ্লুকোজ হয়। এ্যাসিড এবং এ্যালকালী (ক্ষার) রাসায়নিকভাবে এই কাজটা করে, আবার জৈব অনুঘটকও শরীরের ভিতর করে। শর্করাগুলো জলে দ্রবণীয়, এমনিতে বেশ স্থায়ী (স্টেবল) এবং বেশী তাপে রঙ্গীন পদার্থ (ক্যারামেল) হয়। শরীরের ভেতর পর পর জারিত হয় অনুঘটকদের সাহায্যে, প্রথমে গ্লাইকোলিসিসের মাধ্যমে এবং পরে ক্রেব চক্র ও ইলেক্ট্রন পরিবহন পথের দ্বারা। এইভাবে শরীরকে ৪ কিঃ ক্যালরী গ্রাম প্রতি শক্তি দেয়।

১.২.৩ প্রোটিন

আলফা-এ্যামাইনো এ্যাসিড ২০ বা বেশী রকমের হয় কার্বন শংখল এবং অন্যান্য গ্রুপের উপস্থিতির জন্য। অনেক এ্যামাইনো এ্যাসিড এ্যামাইনো এবং এ্যাসিড গ্রুপের দ্বারা যুক্ত হয়ে খুব বড় এক-একটা যৌগের সৃষ্টি করে এদেরকে প্রোটিন বলা হয়। প্রোটিন আবার ভেঙে যেতে পারে এর উল্টো প্রক্রিয়াতে এবং ফের এ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরী হয় অনুঘটক জারিত হয়ে। এ্যামাইনো এ্যাসিড অক্সিডাইজ ও ডিএ্যামিনেটেড হয়ে প্রাণীদের জীবনের কাজে লাগে। রাসায়নিক অনেক ক্রিয়াও করে প্রতিটি এ্যামাইনো এ্যাসিড সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে এবং সবশেষে যে নাইট্রোজেন শরীরের দরকারের চেয়ে বেশী তা ইউরিয়া হিসাবে প্রস্রাব দিয়ে বেরিয়ে যায়।

শরীরের বৃদ্ধিতে প্রোটিন ত কাজে লাগেই, তাছাড়া প্রোটিন (হয়ত হাজারেরও অনেক বেশী) নানা কাজ করে। যেমন—জৈব অনুঘটক বা এনজাইম, এ্যান্টিবডি, অনেক ছোট জীব রসায়নের বাহক (ক্যারিয়ার) ও রিসেপ্টার এবং নানা রকমের পেপটাইড।

এ্যামাইনো এ্যাসিড (ও প্রোটিনে) অম্ল ও ক্ষার দুরকমেরই চার্জ (বিদ্যুত) থাকে। সেইজন্য এরা অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়াতে ভাগ নিতে পারে, জলে দ্রবণীয়তা সাধারণভাবে বেশী কিন্তু যে পি-এইচ এ চার্জ দুটি সমান সমান হয় সেই পি-এইচ (আইসো-ইলেক্‌ট্রিক পয়েন্ট) এতে দ্রবণীয়তা সব চেয়ে কম। কড়া কোন প্রক্রিয়া করলে বা উঁচু তাপে গরম করলে প্রোটিন ডি-ন্যাচার্ড হয় অর্থাৎ এদের সেকেন্ডারী ও টারশিয়ারী বন্ধন বদলে যায়; তবে এতে অনেক সময় পুষ্টির কোন ক্ষতি হয় না।

জিন হল যে-কোন প্রাণীর মূলগত পরিচয় এবং এর জন্যই প্রাণীর আকার-প্রকার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিকাশ হয়। লক্ষ লক্ষ জিন দরকারমত নিজস্ব প্রোটিন তৈরী করেই নিজের প্রকাশ করে, আর প্রোটিনগুলো এমনিতে এবং বিশেষ করে জৈব অনুঘটক হিসাবে কাজ করে প্রাণীকে বাঁচিয়ে চালিয়ে রাখে। সব জৈব অনুঘটকই প্রোটিন। কারণ প্রোটিনের নানা রকমের বিচিত্র গঠন অনুঘটকের কাজের জন্য দরকারী; প্রকৃতি এই সমস্ত জীবনদায়ী কাজের প্রয়োজনে প্রোটিনকেই বেছে নিয়েছে অনুঘটকের কাজের জন্য। এক কথায় জৈব অনুঘটকের উপস্থিতিকে প্রাণের উপস্থিতি বলা যেতে পারে; প্রাণের উৎস নিয়ে যারা ভেবেছেন ওরা বলেন যে নাইট্রোজেনের যৌগ এ্যামোনিয়া হয়ে ক্রমে এ্যামাইনো এ্যাসিড থেকে প্রোটিন হলে এনজাইম এর পর পাওয়া গেছে।

প্রোটিন (এবং বড় যৌগের শর্করাজাতীয়, যেমন ষ্টার্চ ইত্যাদি) দূষণহীন প্লাষ্টিক তৈরী করার জন্য সম্প্রতি ভাবা হচ্ছে। এদের দ্বারা, এমনকি প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া ছাড়া জীবাণুঘটিত গাঁজানো প্রক্রিয়া দ্বারাও, প্লাষ্টিকের ফিল্ম বা পাত তৈরী করে প্যাক করার ঠোঙ্গা বা কৌটো করা হচ্ছে। এরা পরিবেশের মধ্যে আপনা থেকে জৈবভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে (বায়োডিগ্রেডেবল), অধিকন্তু প্রোটিন বা ষ্টার্চজাতীয় হওয়ার জন্য এবং খাদ্যের উপযুক্ত বলে জীবাণুমুক্ত করে পশু বা পাখীর খাদ্য হিসাবে চালানো যেতে পারে। সুতরাং এরা প্রচলিত প্লাষ্টিকের মত পরিবেশ দূষণ ত করেই না, নিজেরাও খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সুযোগ দেয়।

প্রক্রিয়াকরণে দেখতে হবে খাদ্যের প্রোটিন যেন নষ্ট না হয় কারণ প্রোটিন পুষ্টির বিশেষ অঙ্গ। শর্করাজাতীয় ষ্টার্চ সম্বন্ধে তেমন কোন আশংকা নেই বরং ষ্টার্চ সেদ্ধ (জিলেটিনাইজ) হলেই ভাল, যাতে জারণযোগ্য হতে পারে।

প্রোটিনের বিশেষ অংশ হল নাইট্রোজেন। প্রত্যেক রকমের প্রোটিনের মধ্যে নাইট্রোজেন একই অনুপাতে থাকে। নাইট্রোজেন সহজেই ফিয়েলডাল উপায়ে মাপা যায়, সুতরাং একে কোন গুণিতক দিয়ে গুণ করলে প্রোটিন পাওয়া যায় দুধের প্রোটিনের গুণিতক, ৬.২৫, গমের প্রোটিনের ৫.৩ বা ৫.৭, ইত্যাদি।

উদ্ভিজ্জ প্রোটিন কিছুটা নিরেস, কারণ কোন কোন অবশ্য গ্রহণীয় এ্যামাইনো অম্ল শরীরের দরকারে

কম থাকে। এ্যামাইনো অম্ল বিশ্লেষণ করে রাসায়নিক স্কোর দ্বারা অথবা জৈব উপায়ে বাচ্চা ইদুঁরকে খাইয়ে ওজন বৃদ্ধি ও খাদ্যের অনুপাত (পি. ই. আর-প্রোটিন এফিসিয়েন্সী বেশিও) দ্বারা প্রোটিনের জৈব মূল্য বের করা যেতে পারে।

১.২.৪ তেল ও চর্বিজাতীয় যৌগ

সব প্রাণীরই কম-বেশী তৈলজাতীয় পদার্থের দরকার, মানুষের খুবই দরকার। কারণ তেলে শক্তি বেশী (৯ ক্যালরী প্রতি গ্রামে) এবং তেলে থাকা কয়েক রকম ফ্যাটি অম্ল অবশ্য গ্রহণীয়, না হলে শরীরের কিছু প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই অবশ্য গ্রহণীয় অম্লে কার্বন শৃংখল বিভিন্ন রকম লম্বা এবং কার্বন নানা রকমভাবে অসম্পৃক্ত।

রাসায়নিকভাবে তেল গ্লিসারল ও ফ্যাটি অম্ল এর এষ্টার। এর জন্য তেলের এক এক মলিকিউলকে গ্লিসারাইড বলা হয়, ঠিক ঠিক বলতে গেলে ট্রাইগ্লিসারাইড; কারণ এক মলিকিউল গ্লিসারল তিনটা গ্লিসারাইড করতে পারে। জৈব অনুঘটক লাইপেজ তেল বা চর্বিকে ভেঙে আবার গ্লিসারল এবং ফ্যাটি অম্ল তৈরী করে অন্ত্রের মধ্যে এবং শরীরের বিভিন্ন কোষে। তারপর গ্লিসারল ও ফ্যাটি অম্ল আলাদা আলাদা ভাবে জারিত হয়ে ক্যালরী এবং দরকারী জৈব রাসায়নিক শরীরকে দেয়। এদের সুরক্ষার জন্যই প্রকৃতি চর্বির মত মজবুত যৌগ তৈরী করে রাখে, যা শরীরে ঠিক উল্টো রাস্তায় ভেঙে যায় এবং জারিত হয়।

তেল বা চর্বি অনেক রকমের হয় শুধুমাত্র ফ্যাটি এ্যাসিড নানা রকম হওয়ার জন্য এবং বিভিন্ন কার্বন অসম্পৃক্ত থাকার জন্য। কার্বন শৃংখল ৪ থেকে ২২-ও ছাড়িয়ে যেতে পারে, আর অসম্পৃক্ততা সাধারণতঃ শূন্য থেকে এক দুই তিন চার হয়, ছয়ও হতে পারে। এই বিভিন্ন অম্লের নামও বিভিন্ন, যেমন—সি ১৮:০ ষ্টিয়ারিক, সি ১৮:১ ওলেইক, সি ১৮:২ লিনোলেইক এবং সি ১৮:৩ লিনোলেনিক (সি মানে কার্বন)। কার্বন শৃংখল ১৮ সিরিজের কথা বলা হল, অন্য সিরিজ ও প্রায় অনুরূপ।

কার্বন শৃংখলের জন্য স্যাপোনিফিকেশন (বা স্যাপ) ভ্যালু এবং অসম্পৃক্ততার জন্য আইয়োডিন এবং বি. আর. ভ্যালু আলাদা হওয়ায় তেলকে ধরা যায় যেমন—সরষে, বাদাম, তিল, তিসি তেল ও ঘি। তেল ও চর্বির আরও ভ্যালু বা গুণ আছে যাদের দ্বারা তেলের মান জানা যেতে পারে। মান বা ষ্ট্যান্ডার্ড ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করা হয় খাদ্য সম্পর্কিত আইন কানুন বিচার ব্যাপারে।

কার্বন শৃংখলে কার্বন অসম্পৃক্ত থাকার কারণে এরা খুব ক্রিয়াশীল। অক্সিজেন সম্পৃক্ত হয়ে অনেক যৌগ এবং অনেক পরিবর্ত্তনের পর ছোট কিছু কিছু অক্সিজেন সমৃদ্ধ যৌগের সৃষ্টি হয়, ফ্রি র‍্যাডিক্যাল তৈরী হয়—এরা খুব সহজে রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি করে, অক্সিডাইজ করে। এরা কয়েকটি ভিটামিনকে নষ্ট করে, বিষক্রিয়া করে এবং এক রকম চেনা গন্ধের সৃষ্টি করে যাকে র‍্যানসিডিটি বলে। অনিষ্টকারী বলে এর থেকে বাঁচতে হবে। ফ্যাটি অম্লে যত বেশঈ অসম্পৃক্ততা ততই বেশী র‍্যানসিডিটি। অক্সিজেন থেকে যতটা সম্ভব বাঁচিয়ে রাখতে পারলে যেমন নাইট্রোজেন বা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস এর আবরণ দিয়ে

অথবা এ্যান্টিঅক্সিডেন্টজাতীয় রাসায়নিক মেশালে যেমন বি. এইচ. এ. (বিউটিলেটেড হাইড্রক্সি এ্যানিসোল), টি. বি. এইচ. কিউ. (টারশিয়ারী বুটাইল হাইড্রো-কুইনোন), গ্যালেট ইত্যাদি।

খাদ্য তেল সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জ বীজ থেকে বের করে আনা হয়, চাপ দিয়ে বের করে (এক্সপেলার দিয়ে) অথবা দ্রাবক (খাদ্য গ্রেড পেট্রলিয়ামজাত হেক্সেন বা হেপ্টেন) দ্বারা। এই কাঁচা তেলকে অনেক ক্ষেত্রে পরিশোধন করা হয়। হাইড্রোজেন অনুঘটক (নিকেল অক্সাইড) দ্বারা ঢুকিয়ে তেল থেকে চর্বি তৈরী করা হয় (তেল থেকে গলনাঙ্কের তাপ বেশী বলে ঘরের তাপেই জমে যায় একে চর্বি বা ফ্যাট বলা হয়) যার ভারতীয় নাম বনস্পতি। এছাড়া চর্বির মধ্যে মাখনও আছে, আছে ঘি (মাখন থেকে জল সরিয়ে, হয় গলিয়ে জল আলাদা করে নতুবা গরম করে)।

ট্রাই-গ্লিসারাইড তেল ও চর্বি (অসম্পৃক্ত অম্ল যেমন সি ১৮:০ এবং অন্যান্য বেশী থাকে বলে গলনাংক বেশী) ছাড়াও অন্য তেলজাতীয় পদার্থ (লিপিড) আছে।

১.২.৫ ভিটামিন

এদের মধ্যে অনেক রাসায়নিক (জৈব) আছে, বড় বড় যৌগ। খাদ্যে অল্প পরিমাণ দরকার হয়। নিজ নিজ ধর্ম আছে যা দরকার মত জানতে হয় পুষ্টিদ্রব্য হিসাবে জীবন রসায়নকালে এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্যও বটে। ভিটামিন শরীর তৈরী করতে পারে না, খাবার বা ঔষধের মাধ্যমেই পেতে হয়।

ভিটামিন 'এ' খুব বড় ফরমুলার কাঠামো। ক্যারোটিন ভিটামিন 'এ'-র মত কাজ করে। এরা অক্সিজেন কাতুরে। অক্সিজেনের সঙ্গে সহজেই মেশে বলে এ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মত কাজও করে অন্যান্য জীবনদায়ী শারীরিক কাজ ছাড়াও। এরা জলে দ্রব নয়, তেলেই মেশে।

ভিটামিন 'বি' অনেক অনেক যৌগ, জলে দ্রবণীয়, বড় বড় যৌগ, জৈব অনুঘটকের অংশ হিসাবে কাজ করে বলে খুব দরকারী। ১, ২ থেকে আরম্ভ করে ১২ পর্যন্ত আছে। বি ১ হল থায়ামিন নামক জৈব রসায়ন, বি ২ রাইবোফ্লেভিন দুধে বেশ থাকে, নিকোটিনিক অম্ল বা নিয়াসিন বি ৩ কেউ কেউ বলে, ক্যান্টথেনিক অম্ল বি ৫, পিরিডক্সিন বা পিরিডক্সামাইন হল বি ৬, ফোলিক অম্ল ও বায়টিন হয়ে শেষে সাইনোকবালোমিন বি ১২।

এ্যাস্করবিক অম্ল হল ভিটামিন 'সি'। জীবনবিজ্ঞান ঘটিত অনেক কাজ করে। এই কাজগুলো হয় না যদি ভিটামিন 'সি'র অভাব হয়। শেষে হয় স্কার্ভী নামক রোগ।

এরপর ভিটামিন 'ডি', 'ই' এবং 'কে' বেশ নাম করা দরকারী বলে। অনেক কাজের মধ্যে 'ডি' হাড় গঠনে এবং ক্যালশিয়াম ও ফসফরাস চালনায় কাজ করে, 'ই' এন্টিঅক্সিডেন্ট ও 'কে' রক্ত জমাট বাঁধানোর কাজ করে।

সব ভিটামিন বহু কাজ শরীরেরত করেই, অনেকগুলো বিশেষ করে ভিটামিন 'বি' এনজাইমের সহযোগী হয়ে কাজ করে কো-এনজাইম হিসাবে।

১.২.৬ খনিজ বা মিনারেল

এরা ভিটামিনের মতই খাদ্য অথবা ঔষধের মাধ্যমে নেওয়া হয়, খুব অল্প পরিমাণেই দরকার হয়। তবে ভিটামিন যেমন জৈব রাসায়নিক কিন্তু এরা অজৈব। ভিটামিন এবং মিনারেলগুলোর কি কি পরিমাণ দৈনিক দরকার হয় বয়ঃক্রম, বিশেষ শারীরিক অবস্থা ও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে সেটা জানা আছে আর. ডি. এ. (সুপারিশকৃত দৈনিক পরিমাণ) হিসাবে।

সোডিয়াম, পটাশিয়াম, লৌহ, ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি একটু বেশী পরিমাণে; কোবাল্ট, নিকেল, সিলেনিয়াম, ক্রোমিয়াম, তামা, দস্তা ইত্যাদি অল্প পরিমাণে শরীরের দরকার হয়। তাছাড়া নন-মেটাল সালফার, ফসফরাস, ক্লোরিণ, আইওডিন এদেরও দরকার হয় পুষ্টির কাজে। শরীরের অনেক প্রক্রিয়াতে এবং জৈব অনুঘটকের অংশ (কো-ফ্যাক্টর) হিসাবে দরকারী। পুরোপুরি পরিমাণ না হলে অসুখ বা শরীরের বিকৃতি হতে পারে, তখন ঔষধ হিসেবে খেতে হয় যেমন রক্তাল্পতায় লৌহ ও হাড়ের দরকারে ক্যালশিয়াম (ভিটামিন 'ডি' সহযোগে)।

এই সব এলিমেন্ট অজৈব রাসায়নিক হিসাবে খেতে হয়। কম হলে অসুখ হবে। দরকারের থেকে প্রচুর পরিমাণে যদি বেশী হয় তবে বিষক্রিয়া হতে পারে। কিছু কিছু ধাতু প্রায় দরকারী নয়, হলেও খুবই সামান্য দরকার, এদের জন্য বিষক্রিয়া হয় (বিষকারী ধাতু), যেমন—আর্সেনিক, সীসা, পারদ ও ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম ও ম্যাংগানিজ একটু বেশী হলেই বিশেষতঃ বেশী ভ্যালেন্সীর হলে বিষকারী হয়। খাবারে এই বিষকারী ধাতুগুলো মেনে নেওয়া পরিমাণের বেশী হবে না। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের সময়ও যেন এরা খাদ্যে অসাবধানতাবশতঃ চলে আসতে না পারে দেখতে হবে।

১.২.৭ খাদ্যদ্রব্যে রং

কয়েক রকমের পিগমেন্ট খাদ্য রসায়ন হিসেবে দেখা যায়। রংকে প্রকৃতি কিছু রক্ষাকারী রাসায়নিকের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছে যাতে এরা স্থায়ী হয়, এদেরই পিগমেন্ট বলা যায়। যেমন—

১.২.৭.১ ক্যারোটিনয়েড

আলফা, বিটা ও গামা ক্যারোটিনয়েড, লাইকোজিন, জ্যান্থফিল, ক্রিপটোজ্যান্থিন এবং ক্রসোটিন ইত্যাদি। বিটা ক্যারোটিনের প্রায় ৫০ক্ষ এবং আলফা ও গামার অল্প কিছু ভিটামিন 'এ'-র কাজ হয়।

১.২.৭.২ ক্লোরোফিল

উদ্ভিদের মধ্যে থাকে যা দিনে সালোক সংশ্লেষণ (ফটোসিনথেসিস) করে এদের বাঁচিয়ে রাখে। খাবারে তাজা সবুজ চেহারা দেওয়া ছাড়া এর কোন পুষ্টিগুণ আছে কি না জানা যায়নি। এদের মধ্যে ম্যাগনেশিয়াম আছে, যা নিজস্ব প্রয়োজন ছাড়াও প্রাণীর প্রয়োজন মেটায়।

১.২.৭.৩ হিমোগ্লোবিন

এই লৌহঘটিত লাল পিগমেন্ট কেবল প্রাণীজ খাবারেই থাকে।

১.২.৭.৪ সাইটোক্রোম

এই লৌহঘটিত পিগমেন্ট প্রাণীর মাইটোকনড্রিয়া ও মাইক্রোজমে রেড-অক্স কাজ করে।

১.২.৭.৫ ফ্লেভোন ও ফ্লেভোনয়েড

হলদে রং-এর পিগমেন্ট এরা।

১.২.৭.৬ এন্থ্সায়ানিন

লাল, বেগুণী ও নীল রং-এর পিগমেন্ট।

এই রঙ্গীন রসায়নগুলি অন্যান্য কাজ ছাড়াও একটা খুব দরকারী কাজ করে—শরীরের ভেতরে এ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে শরীরকে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের বিপদ থেকে বাঁচায়।

১.২.৭.৭ কৃত্রিম রং

মাত্র কয়েকটা কৃত্রিম রং আইনের বিধান অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে। এদের বিষক্রিয়া ওরা যে পরিমাণে ব্যবহৃত হবে তাতে প্রায় হবে না মনে করেই এদের ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অনুমতি মাঝে মাঝে পুনর্বীক্ষণ করা হয়। মাত্র কয়েকটি রঙেরই অনুমতি আছে, কয়েকটি অনুমোদিত খাবারে; এবং নির্দ্ধারিত অল্প পরিমাণে (প্রচলিত আইন অনুসারে)। এই কৃত্রিম রং ছাড়াও স্বাভাবিক (প্রকৃতিতে পাওয়া যায়) রং কিছু কিছু ব্যবহার করা যায় প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত রং হিসাবে অথবা একই জিনিষ ল্যাবরেটরী বা কারখানায় সংশ্লেষিত হিসেবে।

১.২.৮ খাদ্যের স্বাদ ও গন্ধ (ফ্লেভার)

অল্প পরিমাণ বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য খাদ্যে থাকে। এরা একদিকে জিভের টেষ্টবাডে লেগে স্বাদের অনুভূতি জাগায়। প্রাধানতঃ মিষ্টি, টক, নোন্‌তা ও তেতো ছাড়াও কয়েকটি অন্য স্বাদও অনুভূত হয় সুনির্দিষ্টভাবে প্রত্যেক স্বাদের একান্ত টেস্টবাডের সাহায্যে।

গন্ধের জন্য রাসায়নিককে উদ্বায়ী হতে হবে। বাষ্পের মত হয়ে নাকের ভেতরে অবস্থিত ওলফ্যাক্টরী গ্ল্যান্ডে ক্রিয়া করে, মস্তিষ্ক গন্ধকে চিহ্নিত করে। নানা রকমের জানা-অজানা রাসায়নিক খাবারে থেকে সেই সেই রকমের সুবাসের অনুভূতি জাগায়।

সিন্থেটিক ফ্ল্যাভারও অনেক আছে। খাবারে ব্যবহারের জন্য আইনানুগ বিধান আছে ফ্ল্যাভার ও এদের ক্যারিয়ার সলভেন্ট-এর জন্য।

১.২.৯ জিন পরিবর্তিত (মডিফাইড) খাদ্য

বৃক্ষজাত বা প্রাণীজাত বলে প্রত্যেক কাঁচা খাবারের জিন আছে, যা ঐ ঐ খাবারের বৈশিষ্ট্য বিচিত্রতার জন্য দায়ী। খাদ্যের রাসায়নিক গঠনে সব বৈচিত্র্য, যেমন—সাইজ, আকার, কোষ, রং ও গন্ধ; এই সব বাইরের ব্যাপারে এবং ভেতরের জীবনবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান ও মেটাবলিজম ইত্যাদি জিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মৌলিক জিনগুলোর জন্য দ্রব্যকে কোন বিশেষ শ্রেণীর বলে চেনা যায়, জিনে অল্পস্বল্প বিভিন্নতা থাকায় মূল শ্রেণীতে বিভিন্নতা আমদানী করে। যেমন—ছোট-বড়, লাল হলদে সাদা, বিভিন্ন অম্লতা ও স্বাদ ইত্যাদির জন্য হয়ত শতকরা ৫ ভাগ বিভিন্নতা আছে, বাকী সব একই জিন বলে আমরা নানা রকমের টমেটোয় পাই। এই রকম বিভিন্নতা বা মিউটেশন প্রকৃতিতে এমনিতে আপনা-আপনি ঘটতে পারে, উৎপাদনের সময় পরিবেশগত হতে পারে, এবং কোন রাসায়নিক বা তেজস্ক্রিয় রশ্মিও ঘটাতে পারে। আজকাল জিন ইঞ্জিনিয়ারিং করেও সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটানো যায় কোন কোন জিনকে বাতিল করে, পরিবর্ত্তন করে বা যোগ করে। নতুন জিনোটাইপ হয়, পরিবর্ত্তিত ফিনোটাইপও হয়। পরিবর্ত্তিত রং, বর্ণ, গন্ধ, সাইজ, প্রোটিন ও চর্বিতে উন্নতি ও ফলনে প্রাচুর্য্য ইত্যাদি প্রার্থিত গুণাবলী পাওয়া যায়। আবার পোকা ও আগাচার বিনাশকারী রাসায়নিক দ্রব্য গাছে সুরক্ষার জন্য ঢুকিয়েও দেওয়া যায়।

বেশ কিছু ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্যে জিন পরিবর্ত্তন করা হয়েছে (জিন মডিফাইড অরগানিজম বা জি. এম. ও.)। কিন্তু কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ক্ষতিকারক হয়েছে—কিছু উল্টোপাল্টা হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রস-ওভার হয়ে একটার পরিবর্ত্তন অন্য জিনিষে অবাঞ্ছিতভাবে চলে এসেছে। এ ব্যাপারে কিছু কিছু সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে পৃথিবীর অনেক দেশই জিন পরিবর্ত্তিত খাদ্য নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেনি। ভারতবর্ষও নয়। আরও বুঝতে হবে, যা সম্ভব সময়ে। প্রার্থিত গুণ জিন পরিবর্ত্তনে পাওয়া গেলেও অবাঞ্ছিত কিছু বৈশিষ্ট্য এসে গেছে।

১.২.১০ বিষকারী দ্রব্য

বিষকারী ধাতুর কথা বলা হয়েছে। অধাতু বা জৈব যৌগ অনেক আছে খাদ্যে যারা বিষকারী।

১.২.১০.১ বিষকারক প্রাকৃতিকভাবেই খাবারে থাকা

এই রকম জৈব যৌগ অনেক আছে, যেমন—গলগন্ডক কারক, এ্যালার্জী কারক, ল্যাথিরজেন, এ্যান্টি-ভিটামিন, এ্যান্টি-এনজাইম, ক্যান্সার কারক, মিউটাজেন, টেরাটোজেন, সায়নোজেন (সায়নাইড প্রস্তুককারী), সমুদ্রজাত বিষকারক ইত্যাদি।

১.২.১০.২ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণজাত

ক্যানসিডিট, এ্যাসেডিটি, এ্যামাইনো অম্লে নানারকমের ক্রিয়া হওয়া, ব্রাউনিং, মেইলার রিএ্যাকশন ইত্যাদি।

১.২.১০.৩ খাবারের নানা রাসায়নিক

রং, অপ্রাকৃতিক মিষ্টদ্রব্য, প্রিজারভেটিভ, এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ইমালশনের গাম, ফ্লেভার ইত্যাদি। এদের সবচেয়ে বেশী যা ব্যবহার করা যেতে পারে এর পরিমাণ দেওয়া আছে; এর বেশী হলেই বিষকারী হবে।

১.২.১০.৪ ব্যবহার থেকে আসা রাসায়নিক

খাদ্য উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে চলে আসা কিছু কিছু যৌগ (রেসিডিউ) বিষকারী হতে পারে। যেমন—পেষ্টিসাইড রেসিডিউ, এ্যান্টিবায়টিক রেসিডিউ, দুধে বা মাংসে ঔষধের রেসিডিউ ইত্যাদি।

১.২.১০.৫ দূষণকারী রাসায়নিক পরিবেশ থেকে খাদ্যে আসা

খনিজ, কৃষি, শিল্প, গৃহস্থালী, প্যাকিং দ্রব্য, রেডিও-এ্যাক্টিভ দ্রব্য, গামা রশ্মি ব্যবহার ইত্যাদি থেকে বিষকারী দ্রব্য খাবারে আসতে পারে।

১.২.১১ হোমো-সেলুলোজ, লিগনিন ও অন্যান্য রাসায়নিক

নানা রকমের রাসায়নিক খাদ্যে আছে। এর মধ্যে সেলুলোজ (শর্করাজাতীয়) ছাড়া খাবারের ফাইবার হিসাবে থাকা কিছু জিনিষ যারা হজম হয় না। সেলুলোজ এবং অলিগোসেকারাইডজাতীয় যৌগ একই সঙ্গে থেকে ফাইবারের সৃষ্টি করে। ফাইবার নেহাৎ খুব প্রয়োজনীয় একটি শ্রেণী যা পুষ্টির জন্য দরকার; অনেক অপ্রয়োজনীয় পরিমাণের জিনিষ, যেমন—বাইল, কলেক্টারল ও খজিন দ্রব্য গ্রহণ করে শরীর থেকে মল দ্বারা বের করে দেয় যদিও এই তিনটি জিনিষ এমনিতে শরীরের পক্ষে দরকার। সেলুলোজ ও অলিগোসেকারাইড মানুষ হজম করতে পারে না কারণ এদের ভাঙবার এনজাইম মানুষের থাকে না। গরুর কয়েকটি পাকস্থলী থাকে, যাতে কি জীবাণু এদের ভাঙ্গতে পারে এবং এভাবে তৈরী শর্করা পুষ্টির কাজও করে। মানুষের বৃহদন্ত্রের জীবাণু সেলুলোজ ভাঙতে পারে না, পুরোটাই বেরিয়ে যায়। তবে অলিগোসেকারাইডকে ভাঙতে পারে, যাতে ওরা নিজেরা শর্করাজনিত পুষ্টি পায় বেঁচে থাকার জন্য এবং মানুষকে পেট ফাঁপা বিশেষতঃ ডাল খাওয়ার জন্য (ফ্লাটুলেন্স) থেকে আরাম দেয়। এই রকম কোন কোন অলিগোসেকারাইড 'প্রিবাওটিক'-এর কাজ করে, যথা দই এবং অন্য গালিত খাদ্যে থাকা উপকারী ল্যাক্টোব্যাসিলাস জীবাণুর বাঁচার ও কাজ করার ব্যবস্থা ও পুষ্টি প্রদান করে। এই উপকারী বীজাণুদের 'প্রবাওটিক' বলা হয়।

১.২.১২ এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট

খুব দরকারী বলে খাবারের মধ্যে এবং শরীরের ভেতরে তৈরী করে নানারকমের বন্দোবস্ত করে রেখেছে প্রকৃতি। শরীরে ত অক্সিজেশন খুব হয়, সব শক্তিপ্রদানকারী খাদ্য যেমন চর্বি, প্রোটিন ও শর্করা এনজাইম জারিত হয়ে শেষ সময়ে অক্সিজেনে ইলেক্ট্রন দেয় যাতে অক্সিডেশন হয় এবং ক্যালরী তৈরী

হয়। প্রত্যেক অক্সিজেন মলিকুলে চারটে ইলেক্ট্রন লাগে। যদি আংশিক হয় তবে ফ্রি র‍্যাডিকাল তৈরী হয়, যারা ইলেক্ট্রনের জন্য ক্ষুধার্ত এবং বহু যৌগকে আক্রমণ করে। এদের জন্য অনেক অনেক অসুখ যার মধ্যে অকাল বার্দ্ধক্য ও ক্যান্সারও আছে। এন্টিঅক্সিডেন্ট এদের থেকে আমাদের বাঁচায়। ভিটামি এ, ই ও সি, ক্যারটিন, সাইকোনিন (যা টমেটোতে খুব আছে) ও অন্যান্য প্রাকৃতিক রং ইত্যাদি এন্টিঅক্সিডেন্ট খাবারে আছে। তাছাড়া শরীর ভেতরে তৈরী করে ইউবিকুইনোন, ইউরেট ও গ্লুটাথায়োন এবং কিছু কিছু এনজাইম, যেমন—সুপারঅক্সাইড ডিসামিউটেজ, গ্লুটাথায়োন, গ্লুটাথায়োন পারঅক্সিডেজ, ক্যাটালেজ, পারঅক্সিডেজ। এনজাইমগুলো এই অক্সি বা হাইড্রক্সি ফ্রি র‍্যাডিক্যালগুলোকে ভেঙ্গে দেয়। আর রাসায়নিকগুলো ইলেক্ট্রন দিয়ে ওদেরকে রিডিউস করে সন্তুষ্ট করে এবং নিজেরা অক্সিডাইজড হয়ে যায়।

১.৩ সারাংশ

খাদ্যবিজ্ঞানের রাসায়নিক দিকটা আলোচনা করা হয়েছে। ছোট ছোট যৌগিক (জলে দ্রাব্য) রাসায়নিক বন্ধনে খুব বড় হয়ে খাবারে এসেছে, তখন এরা জলে গলে অথবা ধুয়ে বেরিয়ে যাবে না। এটা হয়ত প্রকৃতিরই ডিজাইন। খাওয়ার পরে কিন্তু এরা হজম হয়ে ঐ ছোট ছোট যৌগিকে ভেঙ্গে যায়, এরা ক্রমান্বয়ে শরীরে ব্যবহৃত হয়। যেমন—গ্লুকোজ পলিমার ষ্টার্চ বা গ্লাইকোজেন, এ্যামাইনো এ্যাসিড থেকে প্রোটিনগুলো এবং গ্লিসারল ও ফ্যাটি এ্যাসিড থেকে চর্বি। পুষ্টিদ্রব্যগুলি কি কি, কিভাবে ওদের গঠন হয়েছে এবং ওদের গুণাগুণ কি রকম। শর্করাজাতীয়, চর্বি ও তেল, প্রোটিন, জল, অনেক রকমের ভিটামিন ও খনিজ লবণ, ফাইবার, এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম রং, স্বাদ ও গন্ধ প্রদানকারী রাসায়নিক পদার্থ—বিষকারী দ্রব্য সেলের বাইরের ও ভিতরের রাসায়নিকগুলো ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে।

১.৪ অনুশীলনী

(১) শর্করাজাতীয় খাদ্যাংশে কি কি রাসায়নিক যৌগ থাকে?

(২) আলফা এ্যামাইনো এ্যাসিড কি রকমের যৌগ? এরা কিভাবে প্রোটিনে রূপান্তরিত হয়?

(৩) খাবারের তেল নাকি গ্লিসারাইড অব্ ফ্যাটি এ্যাসিড। এর ব্যাখ্যা করুন। এতে তেল এত রকমের হয় কি করে?

(৪) জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি সরল যৌগ। এর বাষ্প হওয়ার কথা। তরল হল কেন?

(৫) এনজাইম কি? খাবারের জন্য ও শরীরের জন্য এর কি দরকার? এনজাইমের কিছু বৈশিষ্ট্য বলুন।

(৬) নাইট্রোজেন ল্যাবরেটরীতে কি উপায়ে মাপা যায়? এর দ্বারা প্রোটিনের পরিমাপ কি করে হতে পারে?

(৭) ভিটামিন এ, সি ও ই সম্বন্ধে পাঁচটি লাইন লিখুন।

(৮) লৌহ ও ক্যালসিয়াম—এদের কি কি প্রয়োজন শরীরের পক্ষে?

একক ২ ❑ পুষ্টিবিজ্ঞান

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য
২.১ প্রস্তাবনা
২.২ পুষ্টিবিজ্ঞানের পরিধি
২.৩ পুষ্টিদ্রব্য
২.৩.১ শর্করাজাতীয়
২.৩.২ প্রোটিন
২.৩.৩ চর্বি
২.৩.৪ জল
২.৩.৫ ভিটামিন ও এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট
২.৩.৬ খনিজ যৌগ
২.৩.৭ ফাইবার
২.৩.৮ নিউট্রাসেটিক্যাল ও ফাংসনাল খাদ্য
২.৪ খাদ্যের প্রকারভেদ
২.৪.১ শর্করাবহুল খাদ্য
২.৪.২ ডাল বা লেগিউম
২.৪.৩ মাছ-মাংস-ডিম
২.৪.৪ ফল ও সব্জী
২.৪.৫ দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য
২.৪.৬ ফাইবার
২.৪.৭ জল
২.৫ খাবার (পথ্য) কেমন হবে
২.৫.১ সুষম খাদ্য
২.৬ পুষ্টিদ্রব্য বিশ্লেষণ
২.৬.১ পুষ্টিগুণ জানা
২.৬.২ খাদ্য বিশ্লেষণ
২.৬.২.১ রাসায়নিক বিশ্লেষণ
২.৬.২.২ ফিজিক্যাল বিশ্লেষণ
২.৬.২.৩ বায়োলজিক্যাল বিশ্লেষণ

২.৬.৩ বিশ্লেষণের কিছু প্রয়োজনীয়তা
২.৬.৪ দ্রব্যমূল্য ও পুষ্টিগুণ
২.৬.৫ দ্রব্যমূল্য ও পুষ্টিগুণের উপর কিছু কিছু প্রক্রিয়ার প্রভাব
২.৬.৬ খাদ্যের মান (স্পেসিফিকেশন)
২.৬.৭ খাদ্যের পুষ্টিমূল্য
২.৬.৮ প্রস্তাবিত দৈনিক খাওয়ার পরিমাণ (আর.ডি.এ.)
২.৬.৯ দৈনিক খাবার কেমন হবে
২.৬১০ খাবার বিচার ও ডায়েটেটিক্স
২.৬.১১ পুষ্টি লেবেল
২.৭ খাদ্যের জীবন রসায়ন
২.৭.১ খাদ্যের জারণ
২.৭.২ জৈব অনুঘটক
২.৮ খাদ্যের অপুষ্টি
২.৮.১ অপর্যাপ্ত পুষ্টি
২.৮.২ খাদ্যে বিষক্রিয়া
২.৮.৩ খাদ্যের বিষের নিষ্ক্রিয়করণ
২.৯ অপুষ্টির অনিষ্ট
২.১০ পুষ্টি পরিদর্শন বা সার্ভে
২.১০.১ সার্ভে পদ্ধতি
২.১১ সারাংশ
২.১২ অনুশীলনী

২.০ উদ্দেশ্য

প্রাণীদেশ বৃদ্ধি, ভাল স্বাস্থ্য এবং আয়ুর জন্য পুষ্টি দরকার। কোন কোন দ্রব্য বা রাসায়নিক পুষ্টি যোগায়, পুষ্টিদ্রব্যগুলো কোন্ কোন্ খাবারে কি কি পরিমাণ আছে, এদের কি কি গুণ, রান্না ও অন্যান্য প্রক্রিয়াতে কি কি পরিবর্ত্তন হয়, কি কি ভাবে শরীরের ভিতরে কাজ করে, পুষ্টিদ্রব্যের অভাবে কি কি রোগ হয়, কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য স্বাস্থ্যের পরিবর্দ্ধন করে, সরকারের পুষ্টিসম্বন্ধীয় কি কি পলিসি ইত্যাদি বিচার করা দরকার পুষ্টি-বিজ্ঞানে। বিজ্ঞানের রীতিনীতি সম্বন্ধীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তজ্জনিত জ্ঞাত বিষয়ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিচার করা হয়। শরীরের কার্য্যক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, শরীরের দৈর্ঘ্য, ওজন ও সৌন্দর্য, পরিশ্রম ও কাজ করবার ক্ষমতা, অকালমৃত্যু বা অকাল-বার্দ্ধক্য রোধ করা ইত্যাদি সবই পুষ্টি সাপেক্ষ। দেশ ও জাতির শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ পুষ্টিই সুচিত করে; দেশের

উৎপাদিকা শক্তি ও জাতীয় আয় সম্মিলিতভাবে বেশী হয় বা উৎকর্ষ লাভ করতে পারে মিলিতভাবে দেশের পুষ্টি যদি ভাল ও নিয়মমত হয়।

২.১ প্রস্তাবনা

গর্ভাবস্থা থেকে সারাজীবন এবং মৃত্যু পর্যন্ত পুষ্টির দরকার। কি কি দ্রব্য কি কি পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে তার বিধান আছে। শরীরের বৃদ্ধির দরকার; তার জন্য যে যে দ্রব্য দরকার সেগুলি এবং নির্মাণের চাই (বিল্ডিং ব্লক) এবং শক্তি (এনার্জ্জী) পুষ্টিদ্রব্য থেকেই পাওয়া যায়। শরীরের বৃদ্ধিকে একটা গৃহনির্মাণের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, ইট, সিমেন্টের মশলা বা মর্টার এগুলো রক্ত-মাংসের মত—হাড়গুলো বিল্ডিং ব্লক, নাড়ী ধমনী নার্ভ তুলনা করা যায় পাইপ ও ইলেক্ট্রিক লাইনের সঙ্গে; ঘর তৈরীর মজুরী বা পরিশ্রম খাদ্যজাত ক্যালরীর মত; ঘরের সংরক্ষণ বা মেইন্টিনেন্স স্বাস্থ্য রক্ষার মত; ঘরের আয়ু ও মানুষের আয়ু যথাক্রমে তৈরীর খরচ ও পুষ্টি; দৈনিক ঘর ঝাড়ু দৈনিক শরীর পরিচর্যা ও হাইজিন এদের মত। পুষ্টির উপর শরীর ও মস্তিষ্কের উৎকর্ষ নির্ভর করে; কর্মক্ষমতা ও শারীরিক সৌন্দর্যও।

কি কি পুষ্টিদ্রব্য কোন্ কোন্ শ্রেণীর তা জানা আছে। ঐ পদার্থগুলির গুণ কি কি; যদিও বিশেষ করে রাসায়নিক গুণ জানা দরকার, পদার্থগত গুণ এবং পালন (ফারমেন্টেশন) উপযোগী গুণও দরকার। পুষ্টিদ্রব্য কি করে শরীরে পুষ্টির কাজ করে ও জীব রসায়নঘটিত কাজ করে জানতে হয়। এর সঙ্গে মিলিয়ে ঐ ঐ রাসায়নিক দ্রব্যের শারীরিক প্রক্রিয়া ও ক্যালরী তৈরী বুঝতে হয়; খাদ্যের প্রযুক্তিতে পুষ্টিদ্রব্যের রাসায়নিক প্রক্রিয়া কি কি হয়, এবং অনুঘটক ও জীবাণু থাকার জন্য কি কি প্রকারের পালন প্রক্রিয়া হতে পারে এর তথ্যনিষ্ঠ ধারণা করতে হবে।

প্রাণীদের (গাছপালা সমেত) খাদ্য গ্রহণ করতে হয়ই বেঁচে থাকার জন্য ও উৎপাদিকা (কাজ করবার) শক্তির জন্য। এই খাবার সম্বন্ধীয় সবরকম বৈজ্ঞানিক খবর এবং পুষ্টির জন্য করণীয় বিষয় সব জানা ও করা পুষ্টিবিজ্ঞানের মধ্যে আসে। সব বিজ্ঞান শাখা দ্বারা বিচার করা হয়। এ সম্বন্ধে অনেক অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণালব্ধ জ্ঞান জমা হয়েছে এবং সে জন্য পুষ্টিবিজ্ঞান আজকাল একটা বেশ বড় বিজ্ঞান শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এস.সি. ও পি.এইচ.ডি ডিগ্রী এবং উচ্চতর গবেষণার বিধান আছে, বড় বড় গবেষণা সংস্থাও পুষ্টিবিজ্ঞানে কাজ করে যাচ্ছে। মানুষের পুষ্টি জানার বড় প্রয়োজন হলেও পশু-পাখি বীজাণু ও গাছেরও পুষ্টি বিচার করা হয় প্রয়োজন ভেদে। এখানে মানুষের পুষ্টিই বিশেষতঃ বিচার্য।

২.২ পুষ্টিবিজ্ঞানের পরিধি

খাদ্যবিজ্ঞান যেমন খাদ্য সম্পর্কে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা বিচার করা হয়, বিশেষ করে খাদ্যের ধর্ম বা গুণাগুণ জানা ত দরকার। কাঁচা খাবারে যে যে পদার্থ প্রকৃতি তৈরী করে দিয়েছে সেই সেই রাসায়নিক কি কি ধরনের তাহা খাদ্য রসায়ন বিচার করে। পদার্থবিদ্যা খাদ্যদ্রব্যের বস্তু হিসেবে কি কি গুণ আছে যেগুলো জানা নানাভাবে দরকারী। জীববিদ্যা এবং শরীরবিদ্যা খাওয়ার আগে ও পরে

জৈবিক কারণে কি কি ঘটনা ও সমস্যা হয় তাহা বিচার করে। খাওয়ার পরে খাদ্যের জারণ বিক্রিয়া ও প্রয়োজন মেটানো কি কি ভাবে শরীরে করে তাহা শরীরবিজ্ঞান এবং জীবনবিজ্ঞানে (বিশেষ করে জীবন রসায়ন) অধ্যয়ন করা হয়। বীজাণু বিজ্ঞান খাদ্যে বীজাণুর প্রভাব যেমন বীজাণুঘটিত কারণে খাদ্য থেকে পাওয়া নান দরকারী রসায়ন, খাদ্য নষ্ট হওয়া বিষক্রিয়া করা এবং খাদ্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বীজাণু বিজ্ঞান বিচার করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নানা রকমের বিজ্ঞান খাদ্যদ্রব্যে প্রয়োগ করা হয় এবং লব্ধ জ্ঞান (খাদ্যবিজ্ঞান) পুষ্টিবিজ্ঞানের মধ্যেও আনা হয়ে থাকে। এছাড়া খাদ্যপ্রযুক্তি বলেও একটা কথা আছে। খাদ্যবিজ্ঞান লব্ধ জ্ঞানাবলী থেকে জানা দরকারগুলো যদি খাদ্যে প্রয়োগ করতে হয় তাহলে নানা রকম প্রক্রিয়া করতে হয়, যেমন—কৃষিঘটিত গম থেকে আটা, ময়দা, সুজী, কেক, বিস্কুট ইত্যাদি তৈরী করার খাদ্য প্রযুক্তি। খাদ্য প্রযুক্তি আলাদা ও বিষদভাবে পঠন-পাঠন হয়, তবু পুষ্টিবিজ্ঞানেও জানা হয়ে থাকে, বিশেষ করে পুষ্টি ও প্রক্রিয়া প্রযুক্তির মধ্যে নিকট সম্বন্ধ বর্তমান।

তাছাড়া দেশের খাদ্যসম্বন্ধীয় রেগুলেশনগুলোও পুষ্টিবিজ্ঞানীদের জানতে হয়। খাদ্যে দরকার মত পুষ্টি থাকার জন্য, খাদ্য যাতে বিপদের কারণ না হয়, সর্বোপরি খাদ্যে যাতে ভেজাল না থাকে এবং খাবারের মোড়কের লেবেলে যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য এই সমস্ত পুষ্টি সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য ও নির্দেশ আইনে থাকে যার নাম খাদ্যে ভেজাল নিরোধ আইন। উপভোক্তা সংরক্ষণ আইনও আরেকটি আইন যার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ত আছেই, তাছাড়া পুষ্টিসংক্রান্ত ব্যাপারও আছে যেমন, ভোক্তাদের অধিকার আছে ভাল জীবনের যাহা ভাল খাবারও পুষ্টির দাবী রাখে।

২.৩ পুষ্টিদ্রব্য

নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের দরকার পুষ্টির জন্য। এই সব দ্রব্য (যাদের পুষ্টিদ্রব্য বলা যেতে পারে) সৌভাগ্যবশতঃ খাবারে পাওয়া যায়—প্রকৃতি করে দিয়েছে খাবারের মধ্যে—সেই জন্যই ত খাদ্যদ্রব্যের দরকার। কি কি পুষ্টিদ্রব্য বা পুষ্টি রাসায়নিক দরকার হয় শরীর ধারণ করার জন্য, যেমন—শরীরের বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন করে কাজ করার ক্ষমতা দান, শরীরের ভাইটাল (প্রাণসম্বন্ধীয়) কাজের জন্য।

২.৩.১ শর্করাজাতীয়

কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের রাসায়নিক যৌগ এই খাবার নানা রকমের। কয়েক রকমের শর্করা ত আছেই, ওদের নানা রকমের যৌগ, নানা রকমের পলিমার শৃঙ্খল, তার উপর বেশ কয়েক রকমের বড় মলিকিউলের সংঘবদ্ধ হওয়া এই সমস্ত কারণে কার্বহাইড্রেটের অসংখ্য রসায়ন আছে। এরা খাওয়ার পর জারিত হয়ে ছোট শর্করার সৃষ্টি করে, যেমন—গ্লুকোজ, ফ্রুক্টোজ প্রভৃতি। এদের উপর এঞ্জাইম (জৈবিক অনুঘটক) কাজ করে পর পর জীবন বৈজ্ঞানিক বা শরীর বৈজ্ঞানিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করে। শর্করাগুলো ছোট ছোট যৌগ জলে দ্রবনীয়, রক্ষা করার জন্য প্রকৃতি ওদের দিয়ে বড় বড় যৌগের সৃষ্টি

করেছে যাতে এরা জলে ধুয়ে না যায় বা অন্যভাবে নষ্ট বা পরিবর্ত্তিত না হয়ে যায়। অক্সিজেন জারিত হয়ে এরা শক্তি (কাজ করার) দেয় প্রায় ৪ ক্যালরী প্রতি গ্রামে এবং শরীরের দরকারী বড় বড় যৌগের জন্য ছোট ছোট যৌগ (ইংরাজীতে যাকে বলে বিল্ডিং ব্লকস্) সরবরাহ করে। প্রোটিন ও চর্বি জাতীয় খাবারও একই রকমে বিজারিত হয়। গ্লুকোজ বিজারণের একটি সর্ববিদিত পন্থা হল গ্লাইকোলিসিস। এর পর কয়েকটি সাধারণ পথক্রম যেমন ক্রেব চক্র এবং ইলেক্ট্রন পরিচালন শৃংখল পুষ্টিদ্রব্য জারণের রাস্তা।

২.৩.২ প্রোটিন

আলফা এ্যামাইনো এ্যাসিড-এর কথা ভাবা যেতে পারে। এ্যাসিডের —COOH গ্রুপের লাগোয়া কার্বন শৃংখলের প্রথম কার্বন এ্যাটমকে সালফা কার্বন বলা হয়। সেই কার্বনে একটা এ্যামাইনো —NH_2 গ্রুপ থাকবে, তখন এ্যামাইনো এ্যাসিড হল। কিন্তু কার্বন শৃংখলে লম্বার তারতম্য হবে এবং অন্যান্য রাসায়নিক গ্রুপ থাকতে পারে তাতে করে নানা রকমের এ্যামাইনো এ্যাসিড হয়। এর মধ্যে প্রায় কুড়িটি এ্যামাইনো এ্যাসিড পর পর নানাভাবে যুক্ত হয়। অনেক বড় যৌগ হয়ে প্রোটিন তৈরী হয়। খাবারে প্রোটিন থাকে। প্রোটিন এনজাইমে জারিত হয়ে এ্যামাইনো এ্যাসিড হয়। এ্যামাইনো এ্যাসিড অক্সিজেন জারিত হয়ে শরীরের কাজ করে নানা রকম, তার মধ্যে প্রথমেই প্রায় ৪ ক্যালরী প্রতি গ্রামে শক্তি পাওয়া যায়। এ্যামাইনো এ্যাসিডও ছোট যৌগ, জলে গুলে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই এরা নিজেদের একত্র যোগ করে বড় যৌগ প্রোটিন তৈরী করে। প্রোটিন যেন এ্যামাইনো এ্যাসিডের নিরাপদ জমা স্টোর, দরকার মত জারণ করে বের করে আনা যায়।

এ্যামাইনো এ্যাসিডের মধ্যে কয়েকটি অবশ্য প্রয়োজনীয় (এ্যাসেন্সিয়াল), খাবারের প্রোটিনে অবশ্যই থাকবে ভিটামিনের মত। এগুলোকে শরীর তৈরী করতে পারে না—অন্যগুলোকে পারে।

২.৩.৩ চর্বি

নানা রকমের চর্বিজাতীয় অম্ল (ফ্যাটি অ্যাসিড) শরীরের দরকার ঃ ছোটবড় কার্বন শৃংখলও এক দুই তিন বা বেশী অসম্পৃক্ত কার্বন অণু। কিন্তু সেগুলো জলে বিশেষ করে ক্ষার জলে গুলে যেতে পারে বলে চর্বিজাতীয় অম্লগুলোকে প্রকৃতি এষ্টার করে রাখে গ্লিসারলের সঙ্গে। অনেক সময় শর্করা ও প্রোটিনের সঙ্গে রাসায়নিক বন্ডে (বাঁধনে) বেঁধেও রাখে। শর্করা এবং এ্যামাইনো এ্যাসিড যেমন করে গুলে হারিয়ে যেতে না পারে সেইরকম। এই বড় যৌগগুলোকে জৈব অনুঘটকে জারণ করে ফ্যাটি অম্ল ও গ্লিসারল বের করে এনে শরীরের কাজে লাগায় সাধারণ নিয়মে।

প্রকৃতি আরেকটি সুন্দর কাজ করেছে গ্রাম প্রতি প্রচুর ক্যালরী শর্করা ও প্রোটিনের দ্বিগুণেরও বেশী (৯ ক্যালরী) বিধান করে রেখেছে। এতে খাবার থেকে শক্তি পাওয়ার বেশ ভাল ব্যবস্থা, অল্প খাবারেও বেশী শক্তি পাওয়া যায় বা বেশী কাজ যাদের করতে হয় এদের সুবিধা হয়।

বলাবাহুল্য নানা রকমের ফ্যাটি অম্ল ও নানা রকমের চর্বি শরীরের বিশেষ বিশেষ কাজ করে থাকে।

২.৩.৪ জল

জল কোন ক্যালরী দেয় না তবে বিশেষ প্রয়োজনীয় পুষ্টি সহায়ক পুষ্টিদ্রব্য। এর জন্যেই সব রকমের জীবন বৈজ্ঞানিক ও শরীর বৈজ্ঞানিক কাজ হতে পারে।

২.৩.৫ ভিটামিন ও এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট

নানা রকমের জৈব রাসায়নিক যৌগ ভিটামিনের দরকার হয়। এ, বি, সি, ডি, ই, কে, পি ইত্যাদি নানাশ্রেণী আছে ভিটামিনের, প্রত্যেক শ্রেণীতে একাধিক বেশ কিছু রসায়নদ্রব্য আছে যারা ভিটামিনের কাজ করে। ভিটামিন বাইরে থেকে খেতে হয়, সাধারণতঃ খাবার থেকে, ভিটামিনহীনতার অসুখ প্রগাঢ় হলে ঔষধের মত ভিটামিন খেতে হয়। শরীর ভিটামিন তৈরী করতে পারে না অথচ কম পড়লে অসুখ হয়, সেই জন্য খাবার থেকে উপযুক্ত পরিমাণে পেতেই হয়।

ভিটামিন ক্যালরী দেয় না বটে, তবে শর্করা প্রোটিন ও চর্বি থেকে ক্যালরী পেতে দরকার হয়। অন্যান্য জীবনবিজ্ঞানের কাজও করে শরীরের ও স্বাস্থ্যের জন্য।

কিছু কিছু এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ভিটামিনের মত খাবার থেকে পেতে হয় যদিও কয়েকটা ভিটামিন (যেমন—এ, ই) এবং অন্যান্য শারীরিক রসায়ন যৌগ ও অনুঘটক এ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে। খাদ্যের কিছু প্রাকৃতিক রং, যেমন—ক্যারোটিন, লাইকোপিন, এন্থসায়নিন, ফ্ল্যাভোন ও কিছু লৌহ যৌগ এরাও এ কাজ করে থাকে।

২.৩.৬ খনিজ যৌগ

লৌহ, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতি বেশ পরিমাণে এবং কোবাল্ট, নিকেল, সিলেনিয়াম, ক্রোমিয়াম, তামা, দস্তা ইত্যাদি অল্প পরিমাণে শরীরের কাজে দরকার হয়। তাছাড়া ফসফরাস, সালফার ক্লোরাইড এদেরও দরকার হয়। এইসব খনিজ লবণ হিসেবে খাবার থেকেই নেওয়া হয় অনেকটা ভিটামিনের মতই। শরীরের অনেক অনেক প্রক্রিয়াতে এবং অনুঘটকের অংশ হিসাবে এরা দরকারী। পুরোপুরি পরিমাণ না হলে অসুখ হতে পারে, তখন ঔষধু হিসেবে খেতে হয়, যেমন ক্যালশিয়াম ও লৌহ।

২.৩.৭ ফাইবার

এও শর্করাজাতীয়, কিন্তু পলিমারের মত খুব বড় যৌগ। খাবারের সঙ্গে থাকে কিন্তু জারিত হয় না। মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায় এবং এতে খাদ্যনালী পরিষ্কার রাখে ও কোষ্ঠ-কাঠিন্য হতে দেয় না। এরা জলে ত গুলেই না, এমনকি অম্ল বা ক্ষারেও প্রভাবিত হয় না।

২.৩.৮ নিউট্রাসেটিক্যাল ও ফাংসনাল খাদ্য

খাদ্যে কিছু কিছু রাসায়নিক দ্রব্য থাকতেও পারে বিশেষ করে ঔষধি বলে পরিচিত উদ্ভিদ যা খাদ্য হিসাবে ব্যবহারও করা যেতে পারে। যেমন টমেটোর লাইকোপিন পুষ্টিদ্রব্য নয় কিন্তু এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসাবে বহুমূল্য। ঐ টমেটোতেই 'পিত' নামে রাসায়নিক আছে যা রক্তে প্লেটলেট জড়ো (যাতে থ্রম্বসিস হয়) করার বিরুদ্ধে কাজ করে। সাধারণভাবে যে যে খাবারে এগুলো থাকে তাদের ফাংসনাল খাদ্য বলা হয়।

২.৪ খাদ্যের প্রকারভেদ

উপরে উল্লেখিত পুষ্টিদ্রব্যগুলো খাবারে থাকবেই। কোন কোন খাবারে কোন কোনটি কম বেশী থাকে। সেই অনুযায়ী খাবারগুলোর শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে। শ্রেণীগতভাবে খাদ্যকেও মোটামুটি চিহ্নিত করা হয়।

২.৪.১ শর্করাবহুল খাদ্য

বলাবাহুল্য এই শ্রেণীর খাদ্যে সব পুষ্টিদ্রব্যই সাধারণভাবে থাকে। তবে শর্করাই বেশী পরিমাণে থাকে, সেই জন্য এদের শর্করা খাদ্যও বলা হয়। আমাদের খাবার শর্করা প্রধান হওয়ায় এই শ্রেণীর খাদ্যই খুব প্রয়োজনীয় এবং মানুষ এতেই বেশী বদ্ধ। চাল, গম, বার্লি, ভুট্টা এবং কয়েক রকমের মিলেট, যেমন—বাজরা, সরঘুম এই শ্রেণীর খাদ্য। এদের দানা শস্যও বলা হয়। সেদ্ধ বা ভেজে খাওয়া হয়, এদের থেকে গুড়ো বা অন্যান্য রকমভেদ জিনিসও করা হয়। এদের মধ্যে প্রায় ৭০ শতাংশ শর্করাজাতীয় খাদ্যাংশ, ৮ থেকে ১০ শতাংশ প্রোটিন, ১-৪ শতাংশ চর্বি, ১৪-২০ শতাংশ জল এবং ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। প্রায় ১০ শতাংশ থাকে।

২.৪.২ ডাল বা লেগিউম

এও দানাশস্য, তবে এতে প্রোটিন বেশ বেশী থাকে, ২০-৬০ শতাংশ। কিন্তু বৃক্ষজ প্রোটিন বলে এর জৈবিক মূল্য কম থাকে মাছ-মাংস-ডিম থেকে। নিরামিষাশীদের জন্য এরাই প্রোটিনের ভরসা। শর্করা খাদ্য ২৫ থেকে ৫০ শতাংশ, চর্বি ২০ থেকে ৬০ শতাংশ, জল ১৪-২০ শতাংশ, ফাইবার ১-৫ শতাংশ, ভিটামিন ও খনিজ দ্রব্য (প্রায় ১০ শতাংশ) থাকে।

এদের প্রোটিনের জৈবিক মূল্য কম কারণ কোন এসেন্সিয়াল এ্যামাইনো অম্লের কম পরিমাণ থাকা। তবে এদের নিজেদের মধ্যেই যদি মিশ্রণ তৈরী করা যায়, জৈবিক মূল্য বাড়ানো যেতে পারে। কোন ডালের এ্যামাইনো এ্যাসিডের কমতি জন্য ডাল পুষিয়ে দিতে পারে। যদি জৈবিক মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া যায় তবে এগুলো গরীবের প্রোটিন হয়ে উঠতে পারে, যেহেতু এদের দাম মাছ, মাংস, ডিম থেকে অনেক কম। একটু দুধ মিশিয়ে দিলে নিরামিষ প্রোটিনগুলোর জৈবিক মূল্য অনেক বেড়ে যাবে—খাবারে দুধ-ভাত ও মাছ-ভাতের প্রচলন খুবই যুক্তিযুক্ত হয়েছিল।

২.৪.৩ মাছ-মাংস-ডিম

এদের প্রোটিনযুক্ত খাবার বলেই ধরা হয়ে থাকে। আর প্রোটিনও উৎকৃষ্ট ধরনের। প্রোটিন ৭০-৮০ শতাংশ (শুকনো খাবারের হিসাবে) থাকে আর চর্বি ১০-৪০ শতাংশ, শর্করা ১০-৩০ শতাংশ এবং জল ৭০-৯০ শতাংশ। একটু দামী হলেও এদের বিকল্প প্রায় নেই। এই শ্রেণীর কোন না কোন খাদ্য খাবারে অন্ততঃ ১০ শতাংশ থাকা বাঞ্ছনীয়।

২.৪.৪ ফল ও সজ্জী

ক্যালরী দেয় এমন পুষ্টিদ্রব্য শর্করা-প্রোটিন-চর্বি প্রায় থাকে না যদিও এরা ভিটামিন ও খনিজ দরকারের বেশীর ভাগটাই সরবরাহ করে থাকে। আর বিশেষতঃ ফল খাবারের আনন্দ ও সতেজতা, স্বাদ ও গন্ধ, ঠাণ্ডার ভাব এগুলো দেয়। সজ্জী স্যালাড করে কিছুটা অন্ততঃ খেলে বাল ফলের মত, বেশীর ভাগ রান্না করে (সেদ্ধ, ভাজা ও ওভেনে বেক করে) খাওয়া হয়—কিছু কিছু সজ্জীতে ক্যালরী ত পাওয়া যায়ই, ফলের মত আনন্দ, সতেজতা, স্বাদ ও গন্ধও পাওয়া যায়। এই খাদ্যের কোন কোন দ্রব্যে ফাইবার বেশি থাকে, বস্তুতঃ ফাইবারের জন্যই বৃহদন্ত্র নিয়মিত পরিষ্কার রাখার জন্য বা কোষ্ঠকাঠিন্যে প্রচুর পরিমাণ সজ্জী এবং ফলের বিধান দেওয়া হয়ে থাকে। পশুরা কাঁচা খাবারই ত খায়—মানুষের সঙ্গে পুষ্টি ব্যাপারে ওদের অনেক মিল আছে, মানুষও হয়ত কেবল কাঁচা সজ্জী খেয়েই বেঁচে থাকতে পারবে। সুতরাং খাবারের ৫০ শতাংশই যদি সজ্জী (রান্না করা বা স্যালাড) হয়, খারাপ কিছু নয়। ফল ও সজ্জী একই শ্রেণীতে খাদ্য হিসাবে রাখা হয়েছে কারণ দামী ফলের পুষ্টিগত কাজ প্রায় সবটাই সজ্জী করতে পারে।

২.৪.৫ দুধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য

যেমন সবারই জানা আছে, খাদ্য হিসাবে দুধ সত্যিই চমৎকার। এর চর্বি (মাখন) ও প্রোটিন (কোজন) এদের নিজেদের শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ ভাবা যেতে পারে। অনেক ভিটামিনও খনিজ দুধে আছে। প্রাণদায়ী হিসেবেই প্রকৃতি দুধের সৃষ্টি করেছে সব প্রাণীর বাচ্চাদের বাঁচার দরকারে। অন্যান্য পুষ্টিদ্রব্য ছাড়াও দুধের ভিটামিন 'এ' ও রিবোফ্লেভিন এবং উৎকৃষ্ট রূপের ক্যালসিয়াম থাকায় সব বয়সে আদর্শ স্বাস্থ্য রক্ষা, হাড়ের বৃদ্ধি, মজবুতি ও বার্দ্ধক্যের ভঙ্গুরতা নিবারণ এবং দীর্ঘজীবন দুধ দিতে পারে।

কদাচিৎ 'ল্যাকটোজেন অসহনীয়তা' দেখতে পাওয়া যায় কোন কোন দুধখাইদের মধ্যে। এটা একটা জন্মগত (বা জিনগত) অপূর্ণতা। ল্যাকটোজ অনুঘটকের অভাবে হয়। তখন দুধের শর্করা ল্যাকটোজকে পরিবর্তিত করে বা কমিয়ে দিয়ে দুধ ব্যবহার করতে হয়। কারণ কোন অবস্থাতেই দুই বাদ দেওয়া যায় না—বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ ও কোন কোন রোগীর বেলায়। দই, সন্দেশ, ছানা খাওয়া যায় দুধের বিকল্প বা নতুন খাবার হিসাবেও।

২.৪.৬ ফাইবার

সমস্ত পুষ্টিদ্রব্য জড় করা খাবার বা সিন্থেটিক খাবার আমরা খাই না। আমরা খাই প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্য

যাতে পুষ্টির সঙ্গে ফাইবারও থাকে। ফাইবার খাদ্যনালী পরিষ্কার রাখে, মলত্যাগ সুষ্ঠভাবে রাখে। ফাইবার সেলুলোজজাতীয় জলে অদ্রবনীয় হয় সাধারণতঃ, জলে গলে অথবা তরল তেমনও কিছু অল্প পরিমাণ থাকে। তবে ফাইবার জারিত হয় না, মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

২.৪.৭ জল

নিজে যদিও কোন পুষ্টি দেয় না, শরীরের সব কাজেই জলের দরকার। জল পুষ্টিদ্রব্য ত বটেই সেইজন্য। বলাবাহুল্য জলের মান পানীয় জলের হবে, তাতেই নিরাপদ হবে। একেবারে বিশুদ্ধ জল হবে না, খনিজ লবণ থাকতে হবে, কোন বীজাণু বা ভাইরাস একদম থাকবে না। জীবাণুবাহিত রোগ জল দ্বারা বিশেষভাবে হয়ে থাকে। জলবাহিত খনিজ আমাদের পুষ্টির প্রয়োজন মেটায়, তাই ডিসটিল্ড জল আমরা খেতে পারি না।

২.৫ খাবার (পথ্য) কেমন হবে

প্রোটিন ইত্যাদি পুষ্টিদ্রব্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এরা খাবারে থাকবেই এবং উপযুক্ত পরিমাণে। শরীরের ক্যালরী এবং জীবনবৈজ্ঞানিক দরকারে প্রত্যেক পুষ্টিদ্রব্যের দরকারী পরিমাণ জানা আছে বিশেষ করে যেগুলোর সরবরাহ কম হতে পারে, যেমন—প্রোটিন ও আবশ্যিক এ্যামাইনো এ্যাসিড, চর্বির আবশ্যিক ফ্যাটি অম্ল, ভিটামিন, খনিজ ও এ্যন্টিঅক্সিডেন্ট। এদের কত কম হলেও চলতে পারে তার হিসাব জনপ্রতি দিনে কত খেতে হবে দেওয়া আছে প্রতিষ্ঠিত অথরিটির তরফ থেকে। এই হিসাব ছোট-বড়, স্ত্রীলোক, বিশেষ শারীরিক অবস্থার লোকেদের জন্যও আলাদা করে ভাবা আছে। পরে টেবিলে সুপারিশ করা দৈনিক খাবার—আর. ডি. এ. দেওয়া আছে।

কোন কোন পুষ্টিদ্রব্যের অধিকতম পরিমাণের কথা বলেও সাবধান করা আছে, যেমন চর্বিদ্রব্য ভিটামিন এবং খনিজ দ্রব্য। এরও বেশী খাওয়া হলে বিষক্রিয়া হতে পারে।

সুতরাং খাবারে সব পুষ্টিদ্রব্য থাকবে সুপারিশ করা পরিমাণ অনুযায়ী। স্কুলের ছাত্র, গর্ভবতী ও স্তনদায়ী স্ত্রীলোক, কায়িক পরিশ্রমী—এদের জন্য বিশেষ ভাবনা করা হয়েছে পুষ্টিদ্রব্য খাওয়ার ব্যাপারে।

২.৫.১ সুষম খাদ্য

সব পুষ্টিদ্রব্য সুপারিশের নিম্ন সীমার মধ্যে থাকলে সেই খাবারকে সুষম খাদ্য বলা হয়। খাদ্য সুষম হওয়া বাঞ্ছনীয়, নতুবা খাবারের পরিপূর্ণ কাজ হয় না শরীরের ও স্বাস্থ্যের স্বার্থে। এ যেন টিমের কাজ—একজন মেম্বারও না থাকলে বা কমজোরী থাকলে টিমের কাজ বা সাফল্য হয় না।

সারাদিনের হিসাবে বলা হলেও প্রত্যেক খাবারই নিজস্বভাবে সুষম হবে। মধ্যাহ্ন ভোজন বা নৈশভোজন প্রধান খাবার হিসাবে ত সুষম হবেই, প্রাতঃরাশ ও টিফিন এদেরও সুষম হলে ভাল। অসম

খাদ্য খাওয়া যেতে পারে তবে এক বা দুই ঘন্টার মধ্যে অন্য খাবার যেন অভাবটা পূরণ করে দেয় যাতে সাকুল্যে সুষম হয়।

২.৬ পুষ্টিদ্রব্য বিশ্লেষণ

কাঁচা খাদ্য বা খাবার কি রকম হল জানার জন্য পুষ্টিদ্রব্য বিশ্লেষণ করে জানতে হবে। খাদ্যে সব পুষ্টিদ্রব্যই এমনিতে থাকে, তবে পরিমাণ কম-বেশি হতে পারে। সেটা জানতে হয়, কখন কখন পুরো খাবারকেও বিশ্লেষণ করে জানতে হয় কোন পুষ্টিদ্রব্য কত পরিমাণে আছে পুষ্টিদ্রব্যের মান বা প্রকারভেদও জানতে হয়। যেমন, প্রোটিন কি পরিমাণে আছে এবং প্রোটিন-এর মান এবং জৈবিক মূল্য কতটুকু, আবশ্যিক এ্যামাইনো এ্যাসিডগুলো কি কি পরিমাণে আছে। চর্বিরও মান বিশেষ করে অসম্পৃক্ত অম্ল কত কত আছে জানা দরকার —ওমেগা ৩ এবং ওমেগা ৬ অম্ল কি পরিমাণে আছে। শর্করা জাতিতে সুগার কত এবং কি কি, মনো, ডাই, ওলিগো ও পলিস্যাকারাইড কত জানা দরকার। ১৫-১৬টা ভিটামিন ও খনিজ লবণ কত কত আছে জানাও দরকার। জল ও ফাইবারও বিশ্লেষণ করে জানতে হবে কত কত আছে।

খাদ্য বিশ্লেষণ একটা বড় রকমের বৈজ্ঞানিক কাজ। এর জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ সরকারের এবং মিউনিসিপ্যালিটির বড় বড় লেবরেটরী আছে। কর্মিদের মধ্যে অনেকে পুষ্টি বিশেষজ্ঞ থাকেন।

২.৬.১ পুষ্টিগুণ জানা

খাদ্য বিশ্লেষণ খুব দরকারী কাজ। খাদ্য যাতে সপুষ্টি থাকে এবং নিরাপদ হয়, ভেজাল না হয় তার জন্য সরকারের আইন আছে। সেই আইনে বিশ্লেষণ খাদ্য পরিদর্শকের আনা নমুনা পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেন আইন অনুযায়ী। খাদ্য যদি মান অনুযায়ী না হয়, ভেজাল হয়, বা নিষিদ্ধ বস্তু খাবারে থাকে, তবে অপরাধ হয় এবং মামলার পর বিচার হয়।

২.৬.২ খাদ্য বিশ্লেষণ

২.৬.২.১ রাসায়নিক বিশ্লেষণ

খাদ্যে কি কি রকম রাসায়নিক, পুষ্টিদ্রব্য মেশানো উপকারী বা ভেজালকারী দ্রব্য এবং অন্যান্য সাধারণতঃ থাকা দ্রব্য, যেমন—জল বা ধুলোবালি ও ময়লা ইত্যাদি থাকে তার জ্ঞান থাকা রীতিমত দরকার। বিশ্লেষণ করেই কি কি বাঞ্ছিত বা অবাঞ্ছিত রাসায়নিক আছে তার জ্ঞান লাভ করতে হয়। এ হল রাসায়নিক বিশ্লেষণ।

২.৬.২.২ ফিজিক্যাল বিশ্লেষণ

পদার্থের গুণসম্বন্ধীয় (ফিজিক্যাল) বিশ্লেষণও করা হয়। এর দ্বারা খাদ্যের বাহ্যগুণ যেমন—

আপেক্ষিক গুরুত্ব, রিফ্লেক্টিভ ইনডেক্স, শক্ত বা নরম (টেক্সার), ঘ্রাণের বৈশিষ্ট্য, দেখতে কেমন, বৈদ্যুতিক গুণাগুণ, চৌম্বকত্ব ইত্যাদি দেখা বা মাপ করা যেতে পারে।

২.৬.২.৩ বায়োলজিক্যাল বিশ্লেষণ

জীববিদ্যা বিষয়ক বিশ্লেষণও আছে, বিশেষ করে জীবাণুবিদ্যায় (মাইক্রোবায়লজী) বিশ্লেষণ খুব দরকারী। কি কি অনুঘটক (এনজাইম) কত পরিমাণে আছে, কি কি পোকা এবং ওদের ডিম বা পিউপা; কি কি প্রাণ চঞ্চল (বায়োএ্যাকটিভ) জৈব রসায়নের অস্তিত্ব আছে; সর্বোপরি কি কি জীবাণু (ব্যাক্টেরিয়া, কক্কাস, ইষ্ট, ছত্রাক এবং নেহাৎ দরকার হলে ভাইরাস); এবং ছত্রাক থেকে জাত টক্সিন (মাইকোটক্সিন) বিশ্লেষণ ও পরিমাপ করতে হয়। ইমিউনিটি ঘটিত পরীক্ষা (ইমিউনো বিশ্লেষণ) অনেক সময় দরকার হয়।

২.৬.৩ বিশ্লেষণের কিছু প্রয়োজনীয়তা

এই সমস্ত বিশ্লেষণ সম্যক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। এর জন্য বিশেষ গুরুত্ব ও বিদ্যাসম্বন্ধীয় বই আছে। খাদ্য বিশ্লেষণ খাদ্যবিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে খুব দরকারী, পুষ্টিগুণের হিসাব পুষ্টিগুণ (নিউট্রিটিভ ভ্যালু) তে লাগে; সর্বোপরি গুণ বিচার (কোয়ালিটি কন্ট্রোল), আইনজনিত বিচার, খাবারের মান (স্পেসিফিকেশন) জানতে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার বোঝাপড়াতে দরকারী।

২.৬.৪ দ্রব্যমূল্য ও পুষ্টিগুণ

খাদ্যের দ্রব্যমূল্য (কম্পোজিশন) ও পুষ্টিগুণ (নিউট্রিটিভ ভ্যালু)-এর টেবিল দেওয়া আছে। চর্বি, প্রোটিন ও শর্করা (এদের পরিমাণ থেকে শক্তিমূল্য বা ক্যালরিও), জল, ভিটামিনগুলো, ছাই (কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা খনিজ পদার্থ এককভাবে), ফাইবার ইত্যাদি একে একে বিশ্লেষণ ও পরিমাপ করে দেওয়া আছে।

২.৬.৫ দ্রব্যমূল্য ও পুষ্টিগুণের উপর কিছু কিছু প্রক্রিয়ার প্রভাব

প্রক্রিয়াকরণে অনেক রকম কড়া প্রযুক্তির সাহায্য নিতে হয়, যেমন—তাপ প্রয়োগ, শুকোনো, প্রেশার কুকিং, কেলাসন, নিষ্কাশন, অম্ল ও ক্ষারের প্রয়োগ ইত্যাদি। খাদ্যের কোন কোন দ্রব্য বা অংশ এদের দ্বারা কি কি ভাবে প্রভাবিত হয় বিশেষ করে অচিন্ত্যনীয়ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় তা জানা যায় যদি দ্রব্যমূল্য ঠিক ঠিক জানা থাকে। যেমন—বেশি তাপে প্রোটিন ডিনেচার বা অন্যভাবে নষ্ট হতে পারে, তাপ এবং লৌহ বা তামার যৌগ থাকলে তেল র‍্যানসিড হবে, কোন কোন ভিটামিন ক্ষারে নষ্ট হতে পারে, চিনি অম্ল বা ক্ষারে হাইড্রোলাইজড হতে পারে, বরফ তাপে চর্বি জমে যাবে, মিশ না খেলে কোন দ্রব্য বেরিয়ে আসতে পারে, বেশী তাপে কোন অংশ পুড়ে যেতে পারে, র‍্যাডিয়েশন ব্যবহারে কোন রেডিওলাইটিক প্রক্রিয়া হতে পারে, ধাতু বা প্লাষ্টিক-এর সংস্পর্শে খাবারে বিষক্রিয়া হতে পারে ইত্যাদি।

২.৬.৬ খাদ্যের মান (স্পেসিফিকেশন)

খাবারের স্পেসিফিকেশন রাসায়নিক গঠন, পদার্থবিজ্ঞানীয় মান এবং জীবাণুঘটিত অবস্থার উপর তৈরী করা হয়। এ বিশ্লেষণ দ্বারা যাচাই করতে হয়। স্পেসিফিকেশন আইন মত বা কন্ট্রাক্ট অনুযায়ী হল কিনা বিশ্লেষণ দ্বারা দেখতে হয়। তৈরী বা প্রক্রিয়াকৃত খাবারে মান নির্ণয় ও খাদ্যের রাসায়নিক, পদার্থবিজ্ঞানীয় এবং জীবাণুঘটিত নির্ণয় ও বিশ্লেষণের দ্বারা করতে হয়। এই তিন রকম খাদ্য বিশ্লেষণে উপরই দাঁড়িয়ে আছে ভেজাল নিরোধ আইনসহ খাবারের গুণাগুণ, নিরাপত্ত ও পুষ্টিগুণ।

খাদ্যের মান ও প্রবিধান রচনার মধ্যে ভেজাল নিরোধের কথা বলা হয়েছে যেখানেও খাদ্য বিশ্লেষণের নেহাৎ দরকার। সেখানে এই বড় ব্যাপারে হাত দেওয়া হয়নি, তবে একেবারে সাধারণ কিছু ভেজাল ধরার টেষ্ট যা অতি সাধারণ লোক বা গৃহিনীরাও রান্নাঘরে করতে পারবেন মজা হিসাবে এদের কয়েকটা দেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, নিজের সাধারণ জ্ঞান হওয়া ছাড়াও খাদ্য পরিদর্শক বা অন্য কর্ত্তাব্যক্তিদের জানানো। তাতে উৎস মুখে বিধান নেবার সুবিধা হবে এবং পরিশ্রম সোজাসুজি নিয়োগে করা যাবে ও নিষ্ফলতার রেট কমে যাবে।

২.৬.৭. খাদ্যের পুষ্টিমূল্য

খাদ্যের অনেক অংশের মধ্যে বেশিরভাগই মানুষের (এবং অন্য প্রাণীদেরও) পুষ্টির জন্য দরকার হয়। কিছু কিছু অংশ আছে যারা পুষ্টিতে সোজাসুজি লাগে না। জল নিশ্চয়ই পুষ্টিতে লাগে তবে আমরা জলের জন্য কোন প্রধান খাবার খাই না, যদিও জল এবং পানীয় গ্রহণ করে থাকি। তেমনি ফাইবার-এর জন্য বিশেষ খাবারের দরকার পড়তে পারে কোষ্ঠকাঠিন্যজাতীয় অবস্থায় বা অসুখে। জল (ময়শ্চার) ও ফাইবার বিশ্লেষণ করা হয়। জলের কম-বেশিতে খাবারের স্থায়িত্ব বোঝা যায়, তাছাড়া সাধারণতঃ জল বাদ দিয়ে শুকনো ওজন দরকার হয় খাদ্যমূল্য ও খাদ্য ভোজনের পরিমাণ হিসেব করার জন্য।

বিশ্লেষণ করার পর কয়েকটি খাদ্যের দ্রব্যমূল্য (পুষ্টিমূল্যও আছে) ও ক্যালরী টেবিল—১-এ দেওয়া আছে।

সাধারণভাবে বেশী ব্যবহার করা হয় এমন কয়েকটি খাবারের দ্রব্যমূল্য ও পুষ্টিমূল্য টেবিলে দেওয়া আছে। আরও খাবারের এই মূল্যগুলি এবং নানা রকম ভিটামিনও খনিজের পরিমাণের বেশ কিছু বিবরণও **টেবিল গাইড টু এপ্লাইড নিউট্রিশন,** মুখার্জী ও লোধ প্রণীত—এই বই-এ দেওয়া আছে।

২.৬.৮ প্রস্তাবিত দৈনিক খাওয়ার পরিমাণ (আর. ডি. এ.)

এক এক করে পুষ্টি দ্রব্যের দৈনিক খাওয়ার পরিমাণ সুপারিশ করা হয়েছে রিকমেন্ডেড ডেইলী এলাওয়েন্স (আর. ডি. এ., টেবিল—২)। এগুলোও টেবিলে দেওয়া আছে। বয়স, ওজন, দৈর্ঘ্য এবং কাজের ও শরীরের অবস্থা হিসেবে বিভিন্নতা হয়। আর. ডি. এ. হিসেব করে খাবার পছন্দ করা যায়; কিছু অসুখে, যেমন—মেদবৃদ্ধি, ডাইবেটিস, পেটখারাপ, কোষ্ঠকাঠিন্য, অম্লতাজনিত রোগে এবং কোন

কোন বিশেষ অবস্থায় যেমন গর্ভ ও বুকের দুধের জন্য, শারীরিক পরিশ্রমে যেমন খেলাধূলায়, কম খাওয়া বা ডায়েটিং-এ খাবার হিসেব করা যেতে পারে।

আর. ডি. এ. কত হবে তার পরিমাণ টেবিল—২-এ দেওয়া আছে।

২.৬.৯ দৈনিক খাবার কেমন হবে

দৈনিক খাবার কি কি হবে এবং কত পরিমাণে তা নিয়ে অনেক অনেক ভাবনা-চিন্তা করা হয়েছে। যা যা বলা হয়েছে তা ঐ সমস্ত গবেষণারই ফলশ্রুতি। খুব সম্প্রতি সুস্থ মানুষ তবে রক্তে কিছুটা কলেস্টেরল বেশী আছে এদের জন্য দৈনিক খাবারের ভাবনা করা হয়েছে; সেটা দেখা যাচ্ছে সাধারণভাবে সবার জন্যই প্রযোজ্য।

(১) প্রোটিনজাতীয় ঃ মোট ক্যালরীর ১৫ শতাংশ ক্যালরী খাওয়া হয়েছে প্রোটিন থেকে পেলে ভাল

(২) শর্করাজাতীয় (বেশির ভাগই কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট হবে, চিনিজাতীয় হবে না) ঃ ৫০-৬০ শতাংশ মোট ক্যালরীর।

(৩) চর্বিজাতীয় ঃ (ক) সম্পৃক্ত (স্যাচুরেটেড)—৭ শতাংশ মোট ক্যালরীর।

(খ) এক অসম্পৃক্তি (মনো-আনসেচুরেটেড)—মোট ক্যালরীর ২০ শতাংশ পর্যন্ত্য।

(গ) একাধিক অসম্পৃক্তি (পি.ইউ.এফ.এ.) ঃ মোট ক্যালরীর ১০ শতাংশ পর্যন্ত, লিনোলেইক এ্যাসিড (১৮:২ এন-৬)—মোট ক্যালরীর ৩ শতাংশ, লিনোলেনিক এ্যাসিড (১৮:৩ এন-৩)—মোট ক্যালরীর ০·২৫-০·৫৪ শতাংশ, আইকোসাপেন্টানোইক এসিড (২০:৫ এন-৩) ও ডকোসাহেক্সানোইক এ্যাসিড—০·১৫ শতাংশ মোট ক্যালরীর। এন-৬ ও এন-৩ এর অনুপাত হবে ৪।

(ঘ) ফাইবার ঃ দৈনিক ২০-৩০ গ্রাম।

(ঙ) কলেস্টেরল ঃ ২০০ মিলিগ্রামের কম।

২.৬.১০ খাবার বিচার ও ডায়েটেটিক্স

খাদ্য বিশ্লেষণ করে পুষ্টিদ্রব্য প্রয়োজনমত আছে কিনা, আর. ডি. এ. লিমিটমত আছে কিনা এইগুলি দেখতে হয়। পুষ্টি ও ক্যালরী হিসাব করার পর এদের একসঙ্গে ধরে খাবারের পুষ্টিমূল্য বিচার হয়।

টেবিল—২ ঃ পুষ্টিদ্রব্যের দৈনিক খাওয়ার পরিমাণ (ভারতীয়দের জন্য) (আর. ডি. এ.)

শ্রেণী	বৈশিষ্ট্য	শরীরের ওজন kg	কুল শক্তি Kcal/d	প্রোটিন g/d	চর্বি g/d	ক্যালসিয়াম mg/d	লৌহ mg/d	Vit. A mg/d রেটিনল	Vit. A mg/d বিটা ক্যারোটিন	থায়ামিন mg/d	রাইবোফ্লেভিন mg/d	নিকোটিনিক এ্যাসিড mg/d	পিরিডক্সিন mg/d	এস্কোর্বিক এ্যাসিড mg/d	ফলিক এ্যাসিড μg/d	ভিটামিন বি-১২ μg/d
পুরুষ	পাতলা কাজ		2425							1·2	1·4	16				
	মাঝারি কাজ	60	2875	60	20	400	28	600	2400	1·4	1·6	18	2·0	40	100	1
	ভারী কাজ		3800							1·6	1·9	21				
স্ত্রী	পাতলা কাজ		1875							0·9	1·1	12				
	মাঝারি কাজ	50	2225	50	20	400	30	600	2400	1·1	1·3	14	2·0	40	100	1
	ভারী কাজ		2925							1·2	1·5	16				
	গর্ভবতী স্ত্রী	50	+300	+15	30	100	38	600	2400	+0·2	+0·2	+2	2·5	40	400	1
	বুকের দুধ 0-6 মাস	50	+550	+25	45	1000	30	950	3800	+0·3	+0·3	+4	2·5	80	150	1·5
	6-12 মাস		+400	+18						+0·2	+0·2	+3				
শিশু	0-6 মাস	5·4	208/kg	2.05/kg		500				55μg/kg	65μg/kg	710μg/kg	0·1	25	25	0·2
	6-12 মাস	8·6	98/kg	1·65/kg				350	1200	50μg/kg	60μg/kg	650μg/kg	0·4			
বাচ্চা	1-3 বছর	12·2	1240	22			12	400		0·6	0·7	8	0·9		30	
	4-6 বছর	19·0	1690	30	25	400	18	400	1600	0·9	1·0	11		40	40	0·2-1·0
	7-9 বছর	26·9	1950	41			26	600	2400	1·0	1·2	13	1·6		60	
ছেলে	10-12 বছর	35·4	2190	54	22	600	34	600	2400	1·1	1·3	15	1·6	40	70	0·2-1·0
মেয়ে	10-12 বছর	31·5	1970	57			19			1·0	1·2	13				
ছেলে	13-15 বছর	47·8	2450	70	22	600	41	600	2400	1·2	1·5	16	2·0	40	100	0·2-1·0
মেয়ে	13-15 বছর	46.7	2060	65			28			1·0	1·2	14				
ছেলে	16-18 বছর	57·1	2460	78	22	500	50	600	2400	1·3	1·6	17	2·0	40	100	1·2-1·0
মেয়ে	16-18 বছর	49·9	2060	63			30			1·0	1·2	14				

ডায়েটেটিক্সকে ভোজন বিজ্ঞান বলা যেতে পারে। কে কি পুষ্টিমূল্যের খাবার খাবে তার হিসাব। বিশেষ করে রোগীদের খাবার কি কি হবে—যেমন করে তাপের কারণে ক্যালরী খরচ খুব হয় সুতরাং বেশী ক্যালরীর খাবার, কোষ্ঠকাঠিন্যে ফাইবার ও প্রচুর জল, যক্ষারোগে খুব পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাবার, গর্ভবতী ও স্তনদায়ী মায়েদের বেশি পুষ্টি ও ক্যালরী দরকার, খেলোয়াড় বা কায়িক পরিশ্রমীর ৩০০০-৩৫০০ ক্যালরী খাবার দরকার, পেট খারাপে সরবৎ ও কম অপাচ্য অংশযুক্ত খাবার ইত্যাদি। তাছাড়া, ক্যান্টিন ও হাসপাতালে কি কি রকম খাবার হবে তার বিচার।

২.৬.১১ পুষ্টি লেবেল

আজকাল অনেক খাবারই প্যাক করা হয় উন্নত প্রথায়। প্যাক করলে লেবেলও থাকবে। লেবেলে আইনতঃ কিছু কিছু দরকারী তথ্য থাকবে, যেমন—নির্মাতার নাম ও ঠিকানা, ব্যাচ নম্বর ও তারিখ, খাবারের পরিমাণ, আইনগ্রাহ্য নাম ইত্যাদি। তার উপরে, যদিও অবশ্য পালনীয় নয়, পুষ্টির উল্লেখ কিছু কিছু ব্যাপারে করতে হবে যাতে ভোক্তার প্রয়োজন হতে পারে, যেমন—ক্যালরী কত, সুগার কত, সোডিয়াম কত ইত্যাদি। তাছাড়া আইনে কিছু কিছু নিষেধ আছে তাহা দেখতে হবে, যেমন রং মেশানো হয়েছে কিনা বা অন্য কোন ক্যামিকেল ইত্যাদি। এসবই লেবেলে জ্ঞাতব্য হিসাবে দিতে হবে।

২.৭ খাদ্যের জীবন রসায়ন

খাদ্য খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া আরম্ভ হবে। এর শেষে পুষ্টি পাওয়া যায় খাদ্য থেকে। সুতরাং খাদ্য ও পুষ্টি যদিও প্রায় সমার্থক, মাঝখানে রাসায়নিক প্রক্রিয়া হয়। রাসায়নিক কাজ যদি আশানুরূপ বা দরকার মত না হয় তবে পুষ্টিও পাওয়া যাবে না।

২.৭.১ খাদের জারণ

খাদ্যের প্রধান কাজ হল সব পুষ্টিদ্রব্য বা খাদ্যাংশের যোগান দেওয়া যাতে এরা মেটাবলিজমের দ্বারা শক্তি (ক্যালরী) এবং সংশ্লেষণের জন্য কিছু কিছু মলিকিউলের অংশ যোগান দেয়। শর্করা, চর্বি এবং প্রোটিনই এই কাজ করে ভিটামিন, খনিজ এবং জলের সাহায্যে। ওদের থেকে যথাক্রমে গ্লুকোজ, ফ্যাটি অম্ল ও এ্যামাইনো অম্ল তৈরী হয় বিশেষক অনুঘটক জারিত হয়ে। এই ছোট ছোট রাসায়নিকগুলো খাদ্যনালী থেকে রক্তে আসে। সেখান থেকে শরীরের নানারকমের অংশ বা টিসুতে যায় খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ শরীরবিজ্ঞান প্রণালী দ্বারা। অক্সিডাইজ হয় ও অন্য কোন জীবন রসায়ন বা জীব রসায়ন প্রক্রিয়াবদ্ধ হয়। এই প্রক্রিয়াগুলো সাধারণতঃ জৈবিক অনুঘটক (এনজাইম) দ্বারাই হয়, অল্প কিছু ক্ষেত্রে সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়াও হয়। স্বাভাবিকভাবেই যেমন অম্ল-ক্ষার, অক্সিডেশন-রিডাকশন ইত্যাদি। রক্ত চলাচল দ্বারা পাওয়া পুষ্টিদ্রব্য বা তাদের অংশকে শরীরের বিভিন্ন টিসু বা অর্গ্যান জারণ বা অন্য প্রক্রিয়া করে। ক্যালরী ও জীবনদায়ী কিছু রাসায়নিক তৈরী হয় শরীরের এবং জীবনের স্বার্থে। এইরকম প্রত্যেক খাদ্যাংশের রাসায়নিকের এক-একটা নিয়মিত রাস্তায় পরিবর্ত্তন বা রিঅ্যাকশন হয়। জীবনের কাজ করার পর বাকী

অংশ যার দরকার থাকে না, সেগুলি বেরিয়ে যায় প্রস্রাব দিয়ে। খাবারের যে অংশ জারিত হতে পারে না সেগুলো মল দ্বারা খাদ্যনালীর শেষভাগ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

২.৭.২ জৈব অনুঘটক

জীবনবিজ্ঞানে সব প্রক্রিয়াই সাধারণভাবে এনজাইম দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, অল্প কিছু স্বঘটিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়া। এনজাইমগুলো এক-একটা প্রোটিন নিজেদের বিশেষ বিশেষ জিনদের দ্বারা তৈরী হয়। মানুষের প্রায় হাজারেরও বেশী এনজাইম নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। অনেক প্রক্রিয়া এমনিতে প্রায় হয় না, হয়ত বা পাশ্ব প্রক্রিয়া করে বা খুব আস্তে আস্তে অথবা শরীরের অনুপযুক্ত তাপ বা ঘন দ্রবণে হয়। অনুঘটক এই প্রক্রিয়াগুলোকে বাঞ্ছনীয় দ্রুততায়, শরীরের উপযুক্ত অম্লত্ব-ক্ষারত্ব ও তাপ বা দ্রবণে এবং পার্শ্বক্রিয়া প্রায় না ঘটিয়ে করিয়ে দিতে পারে। অনুঘটকের উল্লেখ খুব স্পষ্টভাবে রসায়নশাস্ত্রে আছে, শিল্পে প্রচুর ব্যবহার হয় নানা রকমের অনুঘটক। প্রকৃতি শরীরের জন্য প্রোটিনকেই বেছে নিয়েছে অনুঘটকের কাজের জন্য—ইহা একটা বিস্ময়ও বটে শরীর বিজ্ঞানে।

২.৮ খাদ্যের অপুষ্টি

প্রথমতঃ সব পুষ্টিদ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে যদি না হয় এবং দ্বিতীয়তঃ খাবারে যদি কোন বিষক্রিয়া হয় তবে অপুষ্টি হয়। পুষ্টিবিজ্ঞানে অপুষ্টি থেকে সাবধান হতেই হয়।

২.৮.১ অপর্যাপ্ত পুষ্টি

সুপারিশ করা দৈনিক খাবার (আর. ডি. এ. নামে বেশি পরিচিত) প্রত্যেকটি পুষ্টিদ্রব্য দরকার মত এবং ক্যালরী দিয়ে থাকে। এই অনুযায়ী খাবার হতেই হবে। তা হলেই পুষ্টি ঠিক আছে বলা যেতে পারে।

দরকারের বেশী পুষ্টিদ্রব্য কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন চর্বিতে দ্রবণীয় কয়েকটি ভিটামিন অনিষ্ঠ করতে পারে। সেটাও অপুষ্টির পর্যায়ে পড়তে পারে। তবে এইরকম ব্যাপার বেশী হয় না বলে খুব মাথা ঘামাবার দরকার হয় না। অধিক পুষ্টি যদিও অপকার করতে পারে এবং যদিও অপুষ্টির পর্যায়ে পড়তে পারে, তবু সমস্যা হয় না। পুষ্টি পর্যাপ্ত না হলে অনেক অনেক অসুবিধা, দৌর্বল্য, অসুখ এবং সাবধান না হলে সব শেষে মৃত্যু হতে পারে। এ সব যাতে না হয় তাই পুষ্টিবিজ্ঞান বিচার করে। পরে এর আরও বিষদ আলোচনা করা যেতে পারে।

২.৮.২ খাদ্যে বিষক্রিয়া

প্রকৃতি তৈরী করে রেখেছে এমন জিনিষ থেকেই খাদ্য পাওয়া যায়, যেমন—উদ্ভিজ্জ প্রধানতঃ, তাছাড়া মাছ ও মাংস (জন্তু ও পাখি) আছে, অন্যান্য প্রাণীও আছে। ওদেরকে কেবল মনুষ্যভক্ষ্য করেই প্রকৃতিতে সৃষ্ঠ হয়েছে এমন ভাবার কারণ নাই। প্রত্যেক প্রাণীরই নিজস্ব প্রয়োজন আছে সৃষ্টিতে সন্তুলন, পরিবেশে ভারসাম্য, খাদ্য-খাদক, পরস্পর নির্ভরতা হয়ত এমন কিছু কিছু কারণ। অনেক তথাকথিত

খাদ্যই খাওয়ার অনুপযুক্ত, সামান্য কয়েকটি উপযুক্ত এবং বাকীগুলো এমন যে এদের মধ্যে কিছু মন্দকারী বা বিষক্রিয়াকারী রাসায়নিক অল্পবিস্তর থাকে। এই শেষোক্ত তৃতীয় শ্রেণী অনেক খাদ্যদ্রব্যই খাবার হিসেবে ব্যবহার করতে হয় কারণ খাদ্য সাধারণভাবে অপ্রতুল। প্রথমশ্রেণীর দ্রব্য (উদ্ভিদ ও প্রাণী) খাওয়া হয় না বিষক্রিয়ার জন্যই। কোন কোন বিষকারী বা বিপজ্জনক রাসায়নিক থাকে বলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি, নানারকম রোগ, এমনকি মৃত্যুও হয়। ঐ রাসায়নিকগুলোকে বিষ বা টক্সিক দ্রব্য বলা হয়। খাদ্যে তিনভাবে বিষাক্ত বা টক্সিক দ্রব্য আসতে পারে—

(১) প্রকৃতিজাতভাবে

(২) খাবার তৈরী করা এবং মজুত করা বা ধরে রাখার মধ্যে এগুলো তৈরী হয়

(৩) একেবারে বাইরে থেকে আসা—

(ক) ইচ্ছে করে প্রযুক্তির খাতিরে মেশানো হয়, যেমন—রং, এন্টিঅক্সিডেন্ট, প্রিজারভেটিভ ইত্যাদি

(খ) খাবারের জন্য নয়, অন্য দরকারে ব্যবহৃত রাসায়নিকের অযাচিত উপস্থিতি, যেমন—পেস্টিসাইড, সার, এ্যান্টিবায়োটিক ইত্যাদির লেগে থাকা অংশ

(গ) পরিবেশ থেকে আসা দূষণ পদার্থ, বীজাণু ও বীজাণুঘটিত পদার্থ

২.৮.৩ খাদ্যের বিষের নিষ্ক্রিয়করণ

জীবন রসায়নে খাদ্যের জারণ যেমন আছে তেমনি বিষের নিষ্ক্রিয় করাও আছে, নতুবা খাদ্যের সুফল পাওয়া সম্ভব ছিল না। খাদ্যাংশ যেমন অক্সিডাইজ হয়ে ওদের উপকারী কাজ করে, বিষ বা টক্সিন পদার্থগুলোও অক্সিডাইজ হওয়ার কারণে পোলার হয়ে জলে গুলে যায় এবং কিডনী দিয়ে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কোন খাদ্যাংশ বা খাদ্যাংশের জারিত অংশের সঙ্গে রাসায়নিক মিলনের পর বিষ বা অক্সিডাইজড বিষ একইভাবে প্রস্রাবের সঙ্গে বা অন্য কোনভাবে শরীরের বাইরে আসতে বাধ্য হয়।

২.৯ অপুষ্টির অনিষ্ট

(১) শরীরের বৃদ্ধি কম হয়, ওজন কম থাকে।

(২) শরীরের দৈর্ঘ্যও কম হয়। ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং অন্যান্য জৈব জিনিস পুষ্টি থেকে কম পাওয়া বা না পাওয়ার জন্য হাড় লম্বা মোটা ও শক্ত হয় না; সুতরাং দৈর্ঘ্য এবং ওজনও কম। গবেষণালব্ধ জ্ঞানে দৈর্ঘ্য ও ওজন বয়সের সঙ্গে কিরকম বাড়বে তার হিসেবের টেবিল আছে। যেটা মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে অপুষ্টি আছে।

(৩) বলাবাহুল্য শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সবগুলোই অপুষ্টিতে ঠিক ঠিক বাড়ে না এবং কার্য্যধারায়ও নিম্নমানের হবে। চোখ, মস্তিষ্ক, লিভার, হার্ট, কিডনীর মত অপরিহার্য্যরূপে দরকারী প্রত্যঙ্গ খারাপ হয় বলে জীবনের সমূহ বিপদ, তাছাড়া হাত, পা, পেশীও নিচু দরের হয়। তাই অপুষ্ট মানুষ পরিশ্রমী বা ভাল খেলোয়াড় হতে পারে না। একটা প্রবাদই বলা যায়, 'অপুষ্টি ব্রেন ও ব্রন দুইই মেরে দেয়।'

(৪) প্রায় সব অসুখই জেঁকে বসতে পারে অপুষ্টিতে। বীজাণু সংক্রমণতা বেড়ে যায়, তাই আমাদের যে প্রায় আশিভাগ অসুখই সংক্রমণজনিত সেগুলোও বেড়ে যেতে পারে। যক্ষা রোগে, অপুষ্টি আগে হয়ে জমি তৈরী করে যক্ষার বীজাণু সংক্রমণের এ সবাই জানে, বাচ্চাদের হৃৎপিন্ড খারাপ হয় অপুষ্টিতে (রিউমেটিক হার্ট) এবং সঙ্ঘাতিক প্রোটিন অপুষ্টিতে কোয়াশিওরকর ও মেরাসমাস হয়।

(৫) অপুষ্টির জন্য শরীরের জীবন রসায়নদের তৈরী ব্যাহত হয়। যেমন, এন্টিবডি —যার অভাবে বীজাণু সংক্রমণতা বাড়ে এবং হরমোন—যাদের অনেক কাজ করতে হয়, একটা কাজ হল শরীরের সন্তুলিত বৃদ্ধি ও লাবণ্য বৃদ্ধি; সেইজন্য অপুষ্ট মানুষ দেখতে সুন্দর হতে পারে না।

(৬) অপুষ্টি মানবিক অধিকারের মধ্যে যদি নিজস্ব গাফিলতি বা অজ্ঞতার জন্য না হয় সেই ক্ষেত্রে দেশকে মানুষের দরকার দেখতে হবে যাতে মানুষ নিজস্ব পরিশ্রমে অপুষ্টির হাত থেকে রেহাই পেতে পারে সেই সেই সুযোগ তৈরী করে দিতে হবে দেশকে। অনেকে এটাকে প্রাণীর মৌলিক অধিকার এবং উপভোক্তাদের পবিত্র অধিকার বলেও মনে করে।

(৭) দেশবাসী পুষ্ট হলে দেশেরও ভাল। দৈনিক কাজ বা পরিশ্রম বেশী হয়; মৃত্যু বা বার্দ্ধক্যের অপারগতা দেশের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

(৮) দেশের হিসেবে, সামান্য পুষ্টিদ্রব্য কম খাওয়ার জন্য অসুখ হওয়ার পর চিকিৎসা খরচা বা হাসপাতাল খরচ প্রায়ই ঐ পুষ্টিদ্রব্যের দামের থেকে অনেক বেশী হয়—এটা পেনীজ্ঞানী পাউন্ড নির্বোধ গোছের অকর্ত্তব্য।

(৯) খুব বেশিদিন ধরে অথবা অনেক পুরুষে অপুষ্টি চলতে থাকলে জিন পরিবর্ত্তনও হতে পারে বলে অনেকে মনে করেন। অন্য সব প্রভাব একই তবু উন্নত অনুন্নত শ্রেণীর শারীরিক পার্থক্য অনেকটা অপুষ্টিজনিত হতে পারে।

(১০) খেলোয়াড় ও যোদ্ধাদের শারীরিক সক্ষমতা ভারতীয়দের তুলনায় অনেক দেশের বেশী। চীনা ও জাপানীদের বর্ত্তমান শারীরিক উন্নতি দেখা গেছে। এগুলো পুষ্টির সুফল নিশ্চয়ই।

(১১) পুষ্টিদ্রব্য কম খেলে কি কি অসুখ হতে পারে তা মোটামুটি জানা আছে, আরও ভবিষ্যতে জানা যাবে গবেষণা দ্বারা। প্রোটিনের অপুষ্টি থাকলে অনেক অস্বাস্থ্যজনিত বিরূপতা বেড়ে বেড়ে অসুখ হয় আগে বলা হয়েছে। চর্বির অপুষ্টির জন্য ক্যালরীর অভাব ও অন্যান্য জীবনরাসায়নিক অসুবিধার পর আবশ্যিক ফ্যাটি অম্লর অভাবে চর্মরোগ। শর্করার কমতি খুব হয় না, হতেও পারে। মস্তিষ্কে গ্লুকোজ সরবরাহ কম হলে অসুখ ও সমূহ বিপদ। ভিটামিন 'এ'র অভাবে চোখের ও শ্বাসনালীর অসুখ ছাড়াও অনেক প্রক্রিয়াগত অসুখ। ভিটামিন 'বি'দের ওভাবে গুচ্ছের অসুখ। ভিটামিন 'সি'র অভাবে স্কার্ভি ও অন্যান্য। ভিটামিন 'ডি' না থাকলে বাচ্চাদের রিকেট ও বয়স্কদের প্রক্রিয়াগত রোগ। ভিটামিন 'ই' না হলে পেশীর অসুখ এবং ফ্রি র‍্যাডিকেলজনিত প্রায় অনেক রকমের অসুখ। ভিটামিন 'কে' না থাকলে রক্তপাত হয়ে মানুষ মারা যেত। প্রায় সেই রকম প্রত্যেক খনিজ (সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাংগানিজ, লৌহ, তাম্র, নিকেল, কোবাল্ট, সিলেনিয়াম, ক্রোমিয়াম) এদের আলাদা আলাদা প্রভাব আছে—অভাবে বিশৃংখলা ও অসুখ হয়, যেমন—লোহার অভাবে রক্তাল্পতা, ক্যালসিয়ামের অভাবে হাড়ের বৃদ্ধি না হওয়া এবং আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড এগুলো হতে পারে।

(১২) উল্টোদিক দিয়েও পুষ্টিজ্ঞান হয়। কি কি পুষ্টিদ্রব্যের কি কি কাজ ও উপকারিতা পুষ্টিবিজ্ঞানের অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয়। পুষ্টিদ্রব্যের অভাব হলে এই সব জীবনদায়ী প্রক্রিয়া হতে পারে না।

২.১০ পুষ্টি পরিদর্শন বা সার্ভে

ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ পুষ্টি এবং একত্রে কোন কোন সমষ্টি (যেমন—দেশ, স্থান, কাল, সম্প্রদায়গতভাবে) এদের মান কি রকম বের করার দরকার ত হয়ই। অপুষ্টি ত বড় বিপদ। এর অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পদক্ষেপ নিতেই হয়। কি কি ব্যাপারে বা কোন্ কোন্ পুষ্টিদ্রব্যের জন্য অপুষ্টি জেনে নিয়ে খাবারে বা ঔষধের মত এদের খেতে হয়। এতে অপুষ্টি দূর হয়, এই সহজ ব্যাপারই অনেক সময় সাধন করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে পদক্ষেপ ব্যক্তিই নেবে, আর সম্প্রদায়ের জন্য প্রতিষ্ঠান বা সরকার সবার জন্য অপুষ্টি দূর করার চেষ্টা করবে। লোককে জানাতে হবে অপুষ্টির প্রাদুর্ভাব প্রচার, উপদেশ বা আদেশের দ্বারা যাতে প্রত্যেকে নিজের থেকে বা বৃহত্তর সাহায্যে অতিরিক্ত পুষ্টি পেতে পারে। সরকার সাধারণ খাবারকে পুষ্ট করে তুলবে গরহাজির পুষ্টিদ্রব্য মিশিয়ে—একে ফরটিফিকেশন বা এনরিচমেন্ট বলা হয়। যেমন বনস্পতিতে ভিটামিন 'এ' এবং নুনে আয়োডিন 'ও' লৌহ সরকার মিশিয়ে থাকে।

২.১০.১ সার্ভে পদ্ধতি

ব্যক্তি এবং সমষ্টির জন্য স্বীকৃত পদ্ধতি আছে ব্যক্তি বেলায় ঃ (ক) শরীর সম্বন্ধীয়, যেমন—উচ্চতা, ওজন, চুল, চোখ ও দৃষ্টিশক্তি (চোখে দাগ আছে কিনা), চামড়া (সাধারণভাবে খশখশে ভাব ও চুলকানি

নাই, বিশেষভাবে চামড়া ভাঁজ করে পুরুত্ব দেখা) ইত্যাদি। (খ) রোগ পরীক্ষা (প্যাথলজি), যেমন—রক্ত ও প্রস্রাবের পরীক্ষা (রক্তে হিমোগ্লোবিন দেখা খুব দরকারী)। (গ) খাবারের পরীক্ষা—কাঁচা খাদ্য পরীক্ষা করে পুষ্টি ও ক্যালরী হিসাব করা ও পথ্যে (বা খাবারে) পুষ্টিদ্রব্য পরিমাপ করা।

গ্রুপ বা সমষ্টির বেলায় ঃ (ক) খাদ্যদ্রব্য অথবা খাবার পুষ্টিদ্রব্যের জন্য বিশ্লেষণ করা, কখনো কখনো বিষকারী রাসায়নিকের জন্য বিশেষ করে পুষ্টিবিরোধী (এ্যান্টি-নিউট্রিয়্যান্ট) কিছু যদি থাকার সম্ভাবনা হয় ওদেরকে খোঁজ ও বিশ্লেষণ করা। (খ) এ্যাপিডেমিওলজি নিয়মে—বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রদের বেলায় কোন বিশেষ পৌষ্টিক অসুখ দেখা যায় কিনা। ঐ অসুখের সঙ্গে কোন পুষ্টিহীনতার যোগাযোগ (করিলেশন) আছে কিনা। যেমন তরাই ভাগে পর্বতের পাদদেশে ঢালু জায়গায় মানুষের (এমনকি গরু-ছাগলেরও) গলগন্ডের প্রকোপ দেখা যেত। অন্য কোন স্থানে বিশেষ কোন দেখা মিলত না। সেই গলগন্ডের সঙ্গে আয়োডিনের অল্পতার সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হল। তা থেকেই এই দুইয়ের কার্য্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপিত হল। সরকার ঐ স্থানীয় অপুষ্টিজনিত অসুখের বিরুদ্ধে নুনে পটাশিয়াম আয়োডাইড বা আইয়োডেট মেশানোর আইনী আদেশ দিল। পরে দেখা গেল তরাই স্থল ছাড়া অন্য কিছু সাধারণ স্থানেও গলগন্ড এবং খাদ্যদ্রব্যে কম আইয়োডিন আছে। সুতরাং তরাই স্থল ছাড়াও সাধারণভাবে সব নুনে আইয়োডিন মেশানোর আদেশ হয়।

২.১১ সারাংশ

পুষ্টি ঠিক ঠিক না হলে মানুষের ওজন, দৈর্ঘ্য, সৌন্দর্য্য, কাজ করবার ক্ষমতা, খেলাধূলায় ও মস্তিষ্কের নৈপুন্য, রোগ ও সংক্রমণ প্রতিরোধের ক্ষমতা এবং ভাল স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কোনটাই হয় না। সমাজ বা দেশের স্তরেও ক্ষতি হয়—উৎপাদন ক্ষমতা কম হয়—অসুস্থতার জন্য হাসপাতালের খরচ বেশী হয়, এমনকি যে যে পুষ্টিদ্রব্যের যে যে পরিমাণ অভাবে অপুষ্টি হল এদের দামের থেকেও বেশী, অকাল মৃত্যু বা কম আয়ুর জন্য ওদের কাছ থেকে পুরো সুবিধা দেশ পেল না, ইমিউনিটিরও অসুবিধা হয়, দেশে সংক্রামক রোগের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে, জাতীয় সৌন্দর্য মার খায় এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে দেশের সুনাম হয় না ইত্যাদি।

খাবারের পুষ্টিদ্রব্য বিচার করতে গিয়ে এ্যান্টিঅক্সিডেন্টকেও এক শ্রেণীর পুষ্টিদ্রব্য বলে উল্লেখ করা হল; খুবই প্রয়োজনীয় এরা—সেইজন্য চা ও রঙ্গীন শাকসব্জী উল্লেখযোগ্য। খাবারে বা পথ্যে কি কি ধরনের প্রাকৃতিক খাদ্য থাকবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। খাবার কেমন হবে বলতে গিয়ে সুষম খাদ্যের ধারণা করা দরকার—আর. ডি. এ. অনুযায়ী পুষ্টিদ্রব্য থাকলেই সেই খাবারকে সুষম খাদ্য (ব্যালেন্সড ফুড) বলা যাবে। আর. ডি. এ. টেবিল দেওয়া আছে—সেই অনুযায়ী বিচার করতে হবে। প্রত্যেক খাদ্যেরই পুষ্টিগুণ আছে কম-বেশী। বেশী পুষ্টি থাকলে কম পুষ্টির খাবারে মিশিয়ে আর. ডি. এ. অবধি নিয়ে আসা যায়। খাদ্য বিশ্লেষণ এবং পুষ্টি বিশ্লেষণ করে খাদ্যে পুষ্টিদ্রব্য কি কি আছে তার একটা বড় টেবিল দেওয়া আছে, আর. ডি. এ.ও টেবিল দেওয়া আছে। প্রক্রিয়াজনিত কিছু অনিষ্ট হতেও পারে পুষ্টিদ্রব্যে—এর স্বল্প আলোচনা আছে। অপুষ্টি শুধু পুষ্টির অভাবেই নয়, বিষকারী দ্রব্যও বিষক্রিয়া করে, স্বাস্থ্যেরও সরাসরি

কোন পুষ্টিদ্রব্যের হানি করেও অনিষ্ট করতে পারে। শরীর কিছু কিছু পরিমাণ বিষকারী বা বিষাক্ত দ্রব্যকে নির্বিষ করতে পারে—অবশ্য এর জন্য কিছু কিছু ভিটামিন, এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, ক্যালরী ইত্যাদির খরচের বোঝা শরীরকে বহন করতে হয়।

খাদ্যের জীবনবিদ্যা, জারণ, উৎসেচকের কার্য্যপ্রণালী, অপুষ্টি বা বিষকারকতার জন্য ইমিউনিটির বিষক্রিয়া বা বিরূপতা ইত্যাদিও পুষ্টিসংক্রান্ত ব্যাপারে দরকারী।

২.১২ অনুশীলনী

(১) পুষ্টিদ্রব্যগুলির নাম বলুন।

(২) জল, ফাইবার ও এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট কতখানি পুষ্টিদ্রব্য বিচার করুন।

(৩) তাপবিদ্যার ক্যালরী ও পুষ্টিবিজ্ঞানের ক্যালরী এক কিনা আলোচনা করুন।

(৪) খাবারের প্রকারভেদে কি কি প্রকার খাবার খেতেই হয়?

(৫) ভিটামিনগুলোর কি কি প্রয়োজনীয়তা?

(৬) খনিজ দ্রব্য (মিনারেল) কি রকমভাবে দরকারী?

(৭) কোন্ কোন্ শ্রেণীর খাবারের ক্যালরী কত কত?

(৮) জৈব অনুঘটক বলতে কি বোঝেন? কিভাবে এদের দরকার হয়?

(৯) প্রোটিন খাবারে কি প্রোটিনই শুধু থাকবে?

(১০) সুষম খাদ্য ও আর. ডি. এ. সম্বন্ধে বলুন।

(১১) ডায়েটেটিক্স কি এবং কি দরকারে লাগে?

(১২) খাদ্য বিশ্লেষণ করে কি সুবিধা পাওয়া যায়?

(১৩) খাদ্যের জারণ (ডাইজেশন) কি করে হয়?

(১৪) কাঁচা খাবার খাওয়ার পর ওর কি কি রাস্তায় গতি হয়?

(১৫) অপুষ্টিতে কি কি শারীরিক অনর্থ হয়?

(১৬) বিষক্রিয়া করে এমন দুইটি পদার্থের নাম বলুন যারা খাবারে থাকতেও পারে।

একক ৩ ❑ খাদ্যের বিষ-বিষয়ক বিজ্ঞান [Toxicology in Food Item]

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য
৩.১ প্রস্তাবনা
৩.২ খাদ্যের প্রকৃতিগত বিষকারী দ্রব্য
৩.২.১ গলগণ্ডকারী (গয়টরোজেন)
৩.২.২ এ্যালারজেন
৩.২.৩ লেকটিন
৩.২.৪ এনজাইমরোধক বা এ্যান্টিএনজাইম
৩.২.৫ এ্যান্টিভিটামিন ও এ্যান্টিমেটাবলাইট
৩.২.৬ সায়নোজেন গ্লাইকোসাইড
৩.২.৭ ল্যাথিরোজেন
৩.২.৮ কারসিনোজেন, মিউটাজেন ও টেরাটোজেন
৩.২.৯ মাইকোটক্সিন
৩.২.১০ অন্যান্য বিষকারী
৩.৩ কিছু উপকারী রসায়ন
৩.৩.১ খাদ্যের ম্যানেজমেন্ট
৩.৪ অপ্রাকৃতভাবে আসা বিষকারী দ্রব্য
৩.৪.১ র‍্যানসিডিটি
৩.৪.২ অম্লতা
৩.৪.৩ প্রোটিনজাত বিষকারক
৩.৫ জেনোবায়োটিক বিষকারী
৩.৫.১ খাবারে মেশানো রাসায়নিক
৩.৫.২ রেসিডিউ
৩.৫.৩ পরিবেশ থেকে
৩.৬ বিষক্রিয়া
৩.৬.১ এল ডি-৫০
৩.৬.২ সাব-এ্যাকিউট বা ক্রনিক টেষ্ট

৩.৬.৩ সবচেয়ে দরকারী প্রত্যঙ্গের কার্য্যকারিতার পরীক্ষা
৩.৬.৪ জীব রসায়ন পরীক্ষা
৩.৬.৫ জিনোটক্সিসিটি টেষ্ট
৩.৭ এ ডি আই (এ্যাক্সেপ্টে বল ডেইলী ইনটেক)
৩.৮ খাবার থেকে পাওয়া (খাদ্যবাহিত) রোগ
৩.৮.১ উপরে বর্ণিত (৩.৪ এবং ৩.৫) বিষকারী দ্রব্য দ্বারা বিষক্রিয়া
৩.৮.১ খাদ্যবাহিত বীজাণু বা ভাইরাস দ্বারা অনেক রোগ
৩.৯ সারাংশ
৩.১০ অনুশীলনী

৩.০ উদ্দেশ্য

খাদ্যে বিষ বা বিষক্রিয়াকারী কিছু কিছু রাসায়নিক যৌগ থাকে স্বাভাবিকভাবেই, যেমনভাবে পুষ্টিদ্রব্যও থাকে। কিছু পুষ্টিদ্রব্য যা নেহাৎই প্রয়োজনীয় এরাও বিষক্রিয়া করতে পারে বেশী পরিমাণে গৃহীত হলে পরে। কিছু কিছু বিষকারী রাসায়নিক ছিল না তবু তৈরী হয় আমাদেরই জন্য, যেমন রান্না বা অন্য কোন প্রক্রিয়ার সময়; ষ্টোর করে রেখে দিলে, ঠিক ঠিক সংরক্ষণ না করলে। আরও কিছু বিষকারী বাইরে থেকে আসে, যেমন ইচ্ছে করে দরকার মত কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্য অ্প পরিমাণে খাবারে মেশালে (এ্যাডিটিভ); কাঁচা খাদ্য চাষ করার সময় বা পশুপালনে ব্যবহৃত রাসায়নিক শেষ খাবারে বা পথ্যে চলে আসতে পারে—এরা বেশী পরিমাণে থাকলে বিষকারী; আর পরিবেশ (জল, বায়ু ও মাটি) দূষর ত হতেই পারে—খাবার এদের থেকে পাওয়া যায় বলে এদের মধ্যে থাকা বিষকারী দ্রব্য খাবারেও আসতে পারে। এই সমস্ত বিপত্তির আলোচনা করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য।

৩.১ প্রস্তাবনা

খাদ্যে পুষ্টি যেমন আছে তেমনি আছে বিষকারী অনেক রাসায়নিক দ্রব্য। দ্বিতীয়টি বেশী থাকলে সেই কাঁচা খাবার খাদ্য হিসাবে বাতিল হয়ে যায়। এমন অল্প অল্প পরিমাণে থাকবে যে পরিমাণটা আমাদের শরীরে এঁটে উঠতে (ডিটক্সিফাই করতে) পারবে। সেই পরিমাণের দিকে লক্ষ্য রেখেই বিষওয়ালা খাদ্য গ্রহণ বা বর্জন করা হয়। তাছাড়া, খাদ্য অসংরক্ষিত থাকলে বা প্রক্রিয়াগত কারণে বা পরিবেশ দূষণের জন্য, এই সব কারণে বিষকারী দ্রব্য খাবারে এসে যেতে পারে।

বিষক্রিয়া কোন্ কোন্ রাসায়নিক দ্রব্য করছে তা জানা যায়। এর বিপদ ঘটানোর ক্ষমতা কতখানি এরও পরীক্ষা বা টেষ্ট করা যেতে পারে। কোন্ রাসায়নিক কোন্ পরিমাণে গ্রহণ চলবে না অর্থাৎ এর সবচেয়ে কত বেশী পরিমাণ দৈনিক আহারের সঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে সেটাও হিসেব করা যায়।

খাদ্য পুষ্টি ত দেয়ই, যে জন্য আমরা খাই। কিন্তু পুষ্টি দ্রব্য ছাড়াও অন্যান্য জিনিষ আছে যেগুলো বিষক্রিয়া করতে পারে। খাদ্যদ্রব্য যেমন উদ্ভিজ্জ কি কেবল মানুষের ভোগের জন্যই প্রকৃতি তৈরী করেছে? হয়ত না; প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা জীবন ও জীবনবৃত্ত আছে—নিজেদের প্রয়োজন বৃদ্ধি, বংশ রক্ষা ও পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করে, পার্শ্বক্রিয়া হিসেবে মানুষ ও অন্য প্রাণীর খাবারের কাজও করে, খাদ্য—বৃত্তে ঢুকে প্রকৃতির সার্বিক কাজে সাহায্য করে।

উদ্ভিদের নিজের দরকারে যেমন আত্মরক্ষায় কোন কোন জৈব রাসায়নিক নিজেই সৃষ্টি করে। এগুলো সাধারণভাবে জীবনবিরুদ্ধ হতেই হবে যেমন পোকামাকড়ের ও গবাদি পশুর বিরুদ্ধে বিষক্রিয়ার ভয়ের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন জীবন হলেও অনেক ক্ষেত্রে মিল আছে, তুলনামূলক জীবনবিজ্ঞান সেই কথাই বলে, সুতরাং ওদের ঐ আত্মরক্ষাকারী রাসায়নিকগুলো মানুষেরও বিষক্রিয়া করতে পারে। কমবেশী বিষকারী জিনিষ থাকার জন্য সব গাছ বা সব প্রাণী মানুষের খাদ্য হয়ে উঠেনি; গরুও নিজস্ব পছন্দ বা বুদ্ধিমত্তার জন্য সব গাছপালা খায় না।

৩.২ খাদ্যের প্রকৃতিগত বিষকারী দ্রব্য

মানুষের বিষকারী প্রচুর রাসায়নিক দ্রব্য খাদ্যে আছে। এদেরকে কয়েকটা শ্রেণীতে, মানুষের উপর ক্রিয়ার ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছে; কখনও বা রাসায়নিক চরিত্রের ভিত্তিতেও।

৩.২.১ গলগন্ডকারী (গয়টরোজেন)

কয়েক রকম রাসায়নিক আছে যারা থাইরয়েড গ্রন্থির কাজে বাধা দেয়, থাইরক্সিন নামক হরমোন শরীর তৈরী করতে বাধা পায়। যেমন গ্লুকোসাইনোলেট ভেঙে গয়টরোজেন জাতীয় জিনিষ তৈরী হয়। বাঁধাকপি, সরষে ও ক্রুসিফার জাতীয় গাছে এ জিনিষ বেশী হয়। গয়টরোজেন ছাড়াও থাইরক্সিন তৈরী হতে বাধা হতে পারে, যেমন খাদ্যে আয়োডিন কম থাকলেও। থাইরক্সিন কম হলে গলগন্ড হয়।

৩.২.২ এ্যালারজেন

খুবই জানা আছে সবার, অনেক খাবারেই এ্যালার্জী হয়। এতে অনেক রকম শারীরিক কষ্ট হয়, মারাত্মক না হলেও ক্লেশকারী। এরা প্রোটিন জাতীয়, এ্যান্টিবডির সঙ্গে ক্রিয়া করে ক্রমান্বয়ে হিস্টামিন তৈরী করে; যা এই অসুখের মূল। তাই হিস্টামিন বিরোধী ঔষধের আবিষ্কার ও ব্যবহার হতে হয়েছে। উন্নত বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় জিন ইঞ্জিনিয়ারিং করে এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতেও পারে খাতা-কলমে; তবে এর অভাবে গাছের ক্ষতি মারাত্মক হয় কি না দেখতে হবে—হয়ত এতে গাছই বাঁচল না।

৩.২.৩ লেকটিন

এ একটা অদ্ভুত জিনিষ। অনেক কাজ করে, তার মধ্যে মানুষের কিছু অসুবিধা, হয়ত অসুখও হয়। এরাও সাধারণতঃ প্রোটিন।

৩.২.৪ এনজাইমরোধক বা এ্যান্টিএনজাইম

এরা জৈব অনুঘটকের কাজে বাধা দেয়। যেমন সয়াবিন ও অনেক ডালে এ্যান্টিট্রিপসিন আছে, যেগুলো সেদ্ধ করলে নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এগুলো কাঁচা খেতে নেই, তবে অঙ্কুরোদগমের সময় নষ্ট হয় বলে অঙ্কুরিত ছোলা মটর ইত্যাদি খাওয়া যায়।

৩.২.৫ এ্যান্টিভিটামিন ও এ্যান্টিমেটাবলাইট

এরা ভিটামিন ও মেটাবলাইটদের বিরুদ্ধে কাজ করে।

৩.২.৬ সায়নোজেন গ্লাইকোসাইড

এদের থেকে হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড (মারাত্মক বিষ) তৈরী হয় ও বিষক্রিয়া করে। কিছু কচু এবং টেপিওকাতে থাকে। এদের কেটে কিছুক্ষণ রেখে দিলে অনুঘটক দ্বারা ভগ্ন হওয়ার পর অম্ল মিডিয়ামে হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড বেরিয়ে যায়।

৩.২.৭ ল্যাথিরোজেন

এরা স্নায়ুর বিষ। খেশারী ডালে ছন্ত্রব্ধড়ন্ডজত্তব্দ ব্ব্র্ধন্নত্তব্দগ্ন থাকে বলে শ্রেণীর এই নাম। খেশারী ডালে থাকে বি ও এ এ (বিটা ওক্স্যালিল এ্যামাইনো এ্যালানিন)। এটা এ্যান্টি-মেটাবলাইটও, এ্যালানিনের এন্টি প্রাথমিকভাবে হয় বলেই হয়ত স্নায়ুর বিষ বা অন্য বিষক্রিয়া করে। সেদ্ধ চাল তৈরী করার মত সেদ্ধ (পার-বয়েলিং) করে শুকিয়ে ডাল তৈরী করলে অনেকটা বিষ বেরিয়ে যেতে পারে।

৩.২.৮ কারসিনোজেন, মিউটাজেন ও টেরাটোজেন

এগুলি জিনকে বদলে দেয়। তাতে যথাক্রমে নানারকমের ক্যান্সার, চেহারা বা ফিনোটাইপ বদল এবং আকৃতি (হাড়ের খাঁচার কোন অংশ) অন্যরকম হতে পারে।

৩.২.৯ মাইকোটক্সিন

খুব বিপজ্জনক বিষ, কয়েকরকম ছত্রাক থেকে হয়। আফলাটক্সিন মানুষ, গরু ও মুরগীর মারাত্মক লিভারের বিষ।

৩.২.১০ অন্যান্য বিষকারী

হেমোগ্লুটিন, সাইকাসিন, সেপোনিন, গসিপল, ফ্যাবিজম, এস্ট্রোজেন, ষ্টিমুল্যান্ট ও ডিপ্রেস্যান্ট, লিভার ও কিডনী বিষ, কিলেটিং (ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেশিয়ামের বাঁধন) এজেন্ট, ফ্ল্যাটাস (ডালে থাকা ওলিগো স্যাকারাইড), টক্সিক এ্যালকালয়েড (যেমন আমানিটিন যা এক ধরনের আমানিটা ছত্রাকে বা মাশরুমে

থাকে বলে সেই ছত্রাক খেলে মৃত্যুও হতে পারে), ম্যারিনটক্সিন (কয়েক ধরনের সামুদ্রিক মাছে থাকে যেমন পাফার মাছে টেট্রোডোটক্সিন ও কয়েকটা শেলওয়ালা মাছ শেলফিস পয়জনিং হয়) ইত্যাদি।

৩.৩ কিছু উপকারী রসায়ন

উপরে বর্ণিত বিষগুলি ত আছে, তবে কিছু কিছু উপকারী জিনিষও থাকে খাদ্যে, যেমন ক্যান্সার বিরোধী, রক্তে গ্লুকোজ কমানো (যেমন করলা, মেথী এতে অজানা রসায়ন), দরকার মত উত্তেজক (যেমন চায়ের ক্যাফিন) ইত্যাদি। খাবারে কিছু স্বাস্থ্যের উপকারী জিনিষ আছে যেগুলিকে নিউট্রাসিটিক্যাল বলা হয় যায় পুষ্টি দেয় এবং ঔষধেরও কাজ করে। টমেটোতে এ্যাস্পিরিনের বিকল্প অথচ একেবারে নিরাপদ পি-৩ হালে আবিস্কৃত হয়েছে।

১.৩.১ খাদ্যের ম্যানেজমেন্ট

বিষকারী দ্রব্য যাতে এ ডি আই (এ্যাক্সেপ্টেবল ডেইলি ইনটেক)-এর বেশী না হয় (যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জানা বা বোঝা আছে) দেখতে হবে। খাবার ত পরিত্যাগ করা যায় না, তাই সাবধানতা অবলম্বন করে বাঁচতে হবে। ১.৭ তে এ ডি আই-এর কথা বলা আছে।

৩.৪ অপ্রাকৃতভাবে আসা বিষকারী দ্রব্য

খাবার তৈরী করার সময় এবং রাখার সময় নতুন করে কিছু কিছু বিষকারী তৈরী হতে পারে।

৩.৪.১ র‍্যানসিডিটি

এটা তেলে হতে পারে। তেলের অসম্পৃক্ত অম্লের সঙ্গে অক্সিজেন ক্রিয়া হওয়ার হাইড্রোপারওক্সাইড এবং পর পর ক্রমান্তয়ে ছোট ছোট অক্সিজেন সমৃদ্ধ যৌগের সৃষ্টি হয়, যেমন এ্যালডিহাইড, কিটোন, অম্ল ও এষ্টার। এদের সবার গন্ধ মিলে মিশে এক রকমের গন্ধ তৈরী হয় যাকে র‍্যানসিডিটি বলা হয়। এটা অনেকেরই চেনা গন্ধ। এত বিষকারী এবং পচা বা নষ্ট হওয়ার সঙ্গে সংযুক্ত জ্ঞানে সবার অবাঞ্ছিত, তাছাড়া এতে কয়েকটা ভিটামিন অক্সিজেন সহযোগে নষ্ট হয়।

৩.৪.২ অম্লতা

অনেক খাদ্যদ্রব্যই বেশী সময়ে জল, তাপ ও কিছু খনিজ (যেমন লোহা ও তামা) সহযোগে অম্ল হয়ে যায়। বিশেষ করে প্রোটিন ও চর্বি ত অম্ল পদার্থ দ্বারা তৈরী। সময়ে ক্রমে ক্রমে রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক (অনুঘটকের জন্য) উপায়ে অম্লের উদ্ভব হয়। অম্ল খুব বেশী না হলেও বিষকারী বটে।

১৩৪.৩ প্রোটিনজাত বিষকারক

বেশী তাপে বিশেষতঃ ক্ষার (খাবার সোডা) থাকলে প্রোটিন থেকে কিছু বিপদ তৈরী হয়, যেমন রেসিমাইজেশন (এল থেকে ডি এ্যামাইনো অম্ল), আইসোপেপটাইড এই ধরনের অন্য কিছু। এদের থেকে প্রোটিনের পুষ্টি ত পাওয়া যায়ই না, বরং এরা নানাভাবে বিষকারী। সুতরাং বেশী তাপ (যেমন তেলে বেশী তাপে অনেকক্ষণ ভাজা) এবং সোডার ব্যবহার বর্জনীয়। তবে বেশী তাপ অল্প সময় (এইচ টি এল টি) যেমন প্রেশার কুকার চলতে পারে।

৩.৫ জেনোবায়োটিক বিষকারী

শরীর বা জীবনবিজ্ঞানের সিষ্টেমে থাকে না (বাইরে থেকে আমদানীকৃত) বিষ সৃষ্টিকারী এরা।

৩.৫.১ খাবারে মেশানো রাসায়নিক

নানারকমের রাসায়নিক অল্প পরিমাণে খাবারে মেশানো হয় কোন কোন প্রযুক্তির দরকারে। যেমন রং, স্বাদ ও গন্ধ দ্রব্য, প্রিজারভেটিভ, এ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, কিছু দ্রব্য নানা কাজের জন্য ব্যবহৃত যেমন ইমালশন করা, স্থায়ীত্ব বাড়ানো, পরিষ্কার করা ইত্যাদি।

৩.৫.২ রেসিডিউ

খাদ্য খামারে উৎপাদন করার সময় ব্যবহৃত রাসায়নিক। যেগুলো খাদ্যে আসুক কেউ চায় না, তবুও অনিচ্ছাকৃত হলেও এসে যায়। যেমন কীটনাশক থেকে, সার থেকে, গরুকে দেওয়া ঔষধ বা এ্যান্টিবায়টিক থেকে ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এইগুলো সাধারণভাবে বিষকারী। কীটনাশকের রেসিডিউ ইতিমধ্যেই অনেক বিপদের কারণ হয়েছে, কারণ কীটনাশক কীটের নাশ করলেও অন্য প্রাণকেও বিষাক্ত করতে পারে।

৩.৫.৩ পরিবেশ থেকে

কৃষি, শিল্প, গৃহস্থালী, খনিজ, খাবারের পাত্র বা প্যাক বিশেষতঃ প্লাষ্টিক, রেডিওএ্যাক্টিভ দূষণ ইত্যাদি থেকে বিষকারী পদার্থ আসতে পারে। এ্যাসপারজিলাস এবং অন্য কয়েকটি ছত্রাক থেকে মাইকোটক্সিন তৈরী হয় খাবারে, যেমন আফলাইক্সিন। পরিবেশের বায়ু, জল ও মাটি দূষিত হয়; এই তিনটি থেকেই খাবার জন্মায়, সুতরাং খাবারে বিষ এসে যায়।

৩.৬ বিষক্রিয়া

শরীরের যে কোন অঙ্গে (যেমন মস্তিষ্ক, লিভার, হৃদয়, কিডনী, যৌনাঙ্গ ইত্যাদি), যে কোন শারীরিক দ্রব্যে (যেমন চোখ, চামড়া, চুল, রক্ত ইত্যাদি), মানসিকভাবে (মানসিক ক্রিয়া), শারীরিক ক্রিয়া (যেমন

কাজে উৎসাহ বা পরিশ্রমের ক্ষমতা), প্রজনন (বাচ্চার জন্ম, বৃদ্ধি ইত্যাদি) অথবা জিনে এসব ক্ষেত্রে অনিষ্ট হতে পারে।

এই সব ক্রিয়ার উপর নির্ভর করেই বিষক্রিয়ার পরীক্ষা করা হয়; কোন বিষ কিভাবে ক্রিয়া করে এবং ক্রিয়ার কঠোরতা কতখানি। ভুক্তভোগী মানুষ, কোন কোন ল্যাবরেটরী পশু মডেল হিসাবে অথবা নানারকম বীজাণু দ্বারা পরীক্ষা করা হয়। কয়েকটা জিনোটক্সিসিটি পরীক্ষাও আছে, যাতে জিনের ক্ষতি হয়েছে কিনা জানা যায়।

৩.৬.১ এল ডি-৫০

এটা একটা বিশেষ বিষক্রিয়া নির্দ্ধারণকারী তাৎক্ষণিক (এ্যাকিউট) টেষ্ট। কত পরিমাণ বিষ গ্রহণ করলে শতকরা ৫০ ভাগ ভোক্তার মৃত্যু হবে। বলাবাহুল্য, এটা ল্যাবরেটারীর প্রাণীদের দিয়ে করা হয় যেমন ইঁদুর, মাউস, খরগোশ, মুরগী বা মাছের বাচ্চা। এর থেকে বিষক্রিয়ার একটা ধারণা করা যেতে পারে এবং কোনটা কত বেশী বর্জ্জ্য তাও জানা যায়। আফলাটক্সিন-এর এল ডি-৫০ খুব কম, সুতরাং এটা প্রচন্ড বিষাক্ত। নুনে খুব বেশী, সুতরাং নুন আমরা খাই যদিও বেশী পরিমাণে খেলে বিষক্রিয়াকারী।

৩.৬.২ সাব-এ্যাকিউট বা ক্রনিক টেষ্ট

বিষকারী রাসায়নিক ৯০ দিন এবং এক বা তিন পুরুষ ক্রমাগত খাওয়ালে প্রাণীদের কি অবস্থা হয়। যেমন ওজন ও দৈর্ঘ্য, প্রজনন ক্ষমতা ও বাচ্চার সংখ্যা ও ওজন দৈর্ঘ্য, সাধারণ চোখে পড়ার মত বা বোঝার মত অবস্থা যেমন লোম ঠিক ঠিক আছে কিনা বা চোখে ঠিক ঠিক দেখতে পায় কিনা বা বুদ্ধিবৃত্তি ঠিক আছে মনে হয় কিনা, সবশেষে মিউটেশন, ক্যান্সার বা হাড়ের বৈকল্য হয় কিনা। এই পরীক্ষাতে ঐ রাসায়নিক যাকে বিষকারী বলে সন্দেহ হচ্ছে ওর কতখানি দৈনিক খেলে পরে জ্ঞানতঃ কোন বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম।

৩.৬.৩ সবচেয়ে দরকারী প্রত্যঙ্গের কার্য্যকারিতার পরীক্ষা

লিভার ও কিডনীর ফাংশন টেষ্ট চলিত ত আছেই। দরকার মত মস্তিষ্ক বা হার্টের ক্রিয়াও দেখা যেতে পারে। টেষ্টের প্রাণী যদি কন্ট্রোল (যাদের কোন বিষকারী দেওয়া হয়নি—সাধারণ বা নিয়মিত) প্রাণী থেকে খারাপ না হয় তবে টেষ্টে ব্যবহৃত পরিমাণে গ্রহণ করা যেতে পারে।

৩.৬.৪ জীব রসায়ন পরীক্ষা

কিছু কিছু জৈব রসায়ন, এনজাইম, হিমোগ্লোবিন ইত্যাদি বিপদগ্রস্ত হয় কিনা দেখাও হয়ে থাকে।

৩.৬.৫ জিনোটক্সিসিটি টেষ্ট

বিষকারী দ্রব্য কোনও পরিমাণে জিনঘটিত বিপত্তি করে কিনা দেখা হয়। বেশ কয়েকটা পরীক্ষা আছে যার মধ্যে এ্যাম্‌স টেষ্ট সহজে করা যায়; মিউটেশন হল কিনা জানতে পারা যায়।

৩.৭ এ ডি আই (এ্যাক্সেপ্টেবল ডেইলী ইনটেক)

প্রাণীদের সাহায্যে বিষগুলোর কি পরিমাণ সবচেয়ে বেশী পরিমাণ মানুষকে খাওয়ানো যেতে পারে তার পরীক্ষা করে পাওয়া। সব বিষেরই এ ডি আই থাকার বা বের করার কথা।

খাবারের মধ্যে সামলানো যায় এমন বিষকারী পদার্থ থাকলে (এ ডি আই-এর মধ্যে) ব্যবহার করতেই হয়। তবে কোন ক্ষেত্রেই দৈনিক পুরো খাওয়ার পরিমান এ ডি আই-এর বেশী হবে না।

পুষ্টিদ্রব্য নয় এমন সব রাসায়নিকই বিষকারী বলা যায়। সায়ানাইডের এল ডি-৫০ কম এবং সেই হেতু এ ডি আইও কম; সায়ানাইডকে বিষ বলা হয়। ঐগুলি বেশী হলে সরাসরি বিষ না বলে বিষকারী (টক্সিক) বলা যেতে পারে।

৩.৮ খাবার থেকে পাওয়া (খাদ্যবাহিত) রোগ

৩.৮.১ উপরে বর্ণিত (৩·৪ এবং ৩·৫) বিষকারী দ্রব্য দ্বারা বিষক্রিয়া

৩.৮.২ খাদ্যবাহিত বীজাণু বা ভাইরাস দ্বারা অনেক রোগ

বিষক্রিয়া শরীরের পক্ষে সব রকমের বিপদই ডেকে আনতে পারে। শারীরিক বা মানসিক (মানসিক রোগও সাধারণতঃ শারীরিক কারণে হয়ে থাকে) যে কোন রোগই বিষক্রিয়াতে হয় অথবা উল্টোভাবে কোন রোগই কোন কারণে হলে একে বিষক্রিয়া বলা হয়। রক্ত, চোখ, চামড়া, লিভার, কিডনী-হার্ট বা মস্তিষ্ক, বায়োকেমিক্যাল বা জৈব বিপত্তি, কর্মক্ষমতা (ফাংসনালিটি) কম—কোন ক্ষেত্রে বেশি যেমন হাইপার-এ্যাকটিভিটি, জিনঘটিত অসুখ ও পরিবর্ত্তন, শরীরের বৃদ্ধি, প্রজনন ক্ষমতা ও বাচ্চাকে খাওয়ানো ইত্যাদির অনিষ্ট হতে পারে বিষক্রিয়াতে।

খাদ্য (বা জল) বাহিত বিষক্রিয়া জনিত রোগ হয় বিশেষ করে জীবাণু ও ভাইরাসের জন্য। কলেরা হয় ভিব্রিও জাতীয় জীবাণুর জন্য; আন্ত্রিক রোগ হয় এ্যামিবা, অন্যান্য প্রোটোজোয়া ও শিগেলার জন্য, জ্বর জাতীয় অসুখ টাইফয়েড ও প্যারাটাইফয়েড হয় ওদের জীবাণুর জন্য; ভাইরাস বা কোন বিশেষ বীজাণুর জন্য হেপাটাইটিস বা জন্ডিস। এছাড়া রাসায়নিক বিষক্রিয়া হয় জলবাহিত আর্সেনিক ও ফ্লুরিনের জন্য; এগুলো নির্দিষ্ট সহ্যমাত্রা থেকে বেশী হলে সে জল বর্জ্জনীয়—শোধন করে মাত্রা কমিয়ে ব্যবহার করতে হয়।

খাদ্যে বিটা বা গামা বিকিরণ দেয় এ রকম অবস্থা থাকলে, যেমন রেডিওএ্যাকটিভিটি বা রেডিওনিউক্লাইড থাকলে, কঠিন অসুখ হতে পারে। কোন নষ্ট হতে পারে বা জিন সম্বন্ধীয় বিপর্যয় হতে পারে যাকে বলা যায় 'র‍্যাডিয়েশন ডেমেজ'।

খাদ্যবাহিত জীবাণু নানারকমের এবং এরা নানারকম অসুস্থতারও জন্ম দেয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা খাদ্য জীবাণুবিদ্যা অংশে করা হয়েছে।

৩.৯ সারাংশ

খাবারের ত খুব দরকার, বিশেষ করে লোকসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে। কাঁচা খাবারে বিশেষতঃ উদ্ভিদ খাবারে প্রাকৃতিকভাবেই বিষকারী দ্রব্য থাকে। যেখানে কম থাকে যা শরীর সহ্য করতে পারবে সেই খাবারই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া কাঁচা খাবার তৈরী বা চাষ করা থেকে আরম্ভ করে পথ্য বানানো পর্য্যন্ত অনেক প্রক্রিয়া করা হয়। সংগ্রহোত্তর প্রক্রিয়া (পোষ্ট-হারভেষ্ট প্রক্রিয়া), গুদামজাত করা (স্টোরেজ), খাদ্য ইঞ্জিনিয়ারিং বা খাদ্য প্রযুক্তি, প্যাকিং, স্টোরেজ ও বিতরণ এবং সবশেষে ভোক্তাদের রান্নাঘরের প্রক্রিয়া ইত্যাদি করার জন্য প্রযুক্তিগত বা রাসায়নিক ব্যবহারজনিত নানারকমের বিষকারী দ্রব্যের সৃষ্টি হয়। এইগুলি সাবধানতা বা উল্টো প্রযুক্তি দ্বারা কমিয়ে সহ্যসীমার মধ্যে আনতে পারলেই সেই খাদ্য গ্রহণ করা হবে, নতুবা বর্জন। সেই বিষগুলোকে জানার চেষ্টা হয়। যতখানি থাকল সেই পরিমাণ ঐ রাসায়নিকের এ ডি আই-এর মধ্যে থাকতেই হবে। তখন গ্রহণ করা যেতে পারে সেইটুকু বিষের ভার। এতে শরীরের অনিষ্ট হয় না, শরীর সহ্য করে যায়। বলাবাহুল্য অন্যদিকে, এগুলো কমাবার চেষ্টা অবশ্য করা হয়। কি কি বিষকারী খাবারে হতে পারে তার, বিষকারিতার টেষ্ট এবং সেগুলির বিচার এখানে সংক্ষেপে করা হয়েছে।

৩.১০ অনুশীলনী

(১) রান্না প্রক্রিয়া থেকে কি কি বিষক্রিয়া হতে পারে?

(২) চাযের জমিতে কীটনাশক এবং ম্যালেরিয়া নিরোধে কীটনাশক ব্যবহার করাতে কাঁচা খাবার ও পথ্য (টেবিল খাবার)-এ কি বিপত্তি হতে পারে?

(৩) খাদ্যবাহিত ও জলবাহিত রোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু লিখুন।

(৪) এল ডি-৫০ এই টেষ্টটা কি?

(৫) খেশারী ডালে স্বাভাবিকভাবে যে টক্সিন থাকে তার নাম, তজ্জনিত অসুখের নাম ও কোন প্রক্রিয়ায় একে কমানো যায় কিনা বলুন।

(৬) এ ডি আই কি এবং এর ব্যবহার কি? পরিমাণ-এর নীচে থাকলে কোন বিষও খাওয়া যেতে পারে—এই কথার সত্যতা আছে কি?

একক ৪ ❑ সন্ধান [Fermentation]

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য
৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ খাদ্যের সন্ধান (ফুড ফার্মেন্টেশন)
৪.৩ খাদ্য জীবাণুবিদ্যায় জীবাণুসমূহের উপকারী ভূমিকা
৪.৪ সন্ধানজাত খাদ্য শিল্প
৪.৫ রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতিতে সন্ধান
৪.৬ এনজাইমার বা উৎসেচক প্রস্তুতি
৪.৭ ঈষ্টের ভূমিকা
৪.৮ মোল্ডের ভূমিকা
৪.৯ জৈব অ্যাসিড প্রস্তুতি
৪.১০ সন্ধানজাত খাদ্য প্রস্তুতি
৪.১১ অ্যাক্টিনোমাইসেটিসের ভূমিকা
৪.১২ সারাংশ
৪.১৩ অনুশীলনী

৪.০ উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ের মূল লক্ষ্য হলো গাঁজন প্রক্রিয়ার মৌলিক ধারণা, প্রকারভেদ এবং ব্যবহার সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা প্রদান করা। নির্দিষ্টভাবে, এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থীরা—

- গাঁজনের সংজ্ঞা ও মূল প্রক্রিয়া বুঝতে পারবে।
- বিভিন্ন ধরনের গাঁজন (যেমন: এলকোহলিক ও ল্যাকটিক এসিড গাঁজন) সম্পর্কে জানতে পারবে।
- খাদ্য, ঔষধ, জ্বালানি ও শিল্পে গাঁজনের ব্যবহার ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবে।
- গাঁজন প্রক্রিয়ায় অণুজীবের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
- গাঁজন সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণা ও প্রযুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।

এই অধ্যায় পাঠের মাধ্যমে গাঁজন সম্পর্কিত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ তৈরি হবে।

৪.১ প্রস্তাবনা

ফার্মেন্টেশন বা সন্ধান প্রক্রিয়া একটি জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন বা ঘটনা। জীবাণুর উপস্থিতিতে জীবাণু দ্বারা সংশ্লেষিত এনজাইম বা উৎসেচকের সহায়তায় অনুকূল পরিবেশ তথা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের আনুকূল্যে (যথা বাহ্যিক পরিবেশ সহায়ক সূচক—তাপমাত্রা, চাপ, ঘূর্ণন মাত্রা, আন্দোলন মাত্রা ইত্যাদি এবং আভ্যন্তরীণ পরিবেশ সহায়ক সূচক—pH অর্থাৎ অম্লভিত্তিক বা ক্ষারকীয় মাত্রা, দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘনত্ব, বহির্গত কার্বন ডাঅিক্সাইডের পরিমাণ, ইত্যাদি) একটি জটিল যৌগিক পদার্থের অপেক্ষাকৃত সরল পদার্থে রূপান্তরকে সাধারণতভাবে সন্ধান প্রক্রিয়া বলে। যেহেতু এই প্রক্রিয়াটিতে জীবাণু এবং উৎসেচকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সেইজন্য এই পরিবর্তনকে জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।

৪.২ খাদ্যের সন্ধান (ফুড ফার্মেন্টেশন)

সন্ধান প্রক্রিয়া প্রধানত দুই ধরনের হয়। প্রথমটি বায়ু বা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সন্ধান প্রক্রিয়া এবং দ্বিতীয়টি বায়ুর বা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সন্ধান প্রক্রিয়া। উদাহরণস্বরূপ প্রথমটির ক্ষেত্রে বেকারী শিল্পে ব্যবহৃত ঈষ্ট অর্থাৎ বেকারস ঈষ্ট (Baker's Yeast) উৎপাদন খান্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। বেকারস ঈষ্ট (১ মোলাসেস বা ঝোলাগুড় এবং (২) গ্লুকোজ দুইটি পদার্থ হইতেই প্রস্তুত করা যেতে পারে।

(১) ঝোলাগুড় (Molasses) $\xrightarrow[\text{বায়ু বা অক্সিজেন অনুপস্থিত}]{\text{* ঈষ্ট}}$ ঈষ্ট কোষের সমষ্টি (Cell Biomass) (Major Product) + কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ↑ (Minor Product)

*ঈষ্টের নাম **স্যাকারোমাইসেস সেরিভেসি** (*Saccharomyces Cerevisiae*) অল্প ঈষ্ট কোষ থেকে অসংখ্য ঈষ্টের অর্থাৎ ঈষ্ট কোষের সমষ্টি তৈরী করাই (সেল বায়োমাস) এই প্রক্রিয়ার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। প্রধানতঃ পাউরুটি (Bread) পিজ্জা (Pizza) এক ধরনের বিস্কুট ইত্যাদি উৎপাদনে বেকারস ঈষ্ট ব্যবহৃত হয়।

(২) গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) $\xrightarrow[\text{বায়ু বা অক্সিজেন অনুপস্থিত}]{\textit{Saccharomyces Cerevisiae}}$ ঈষ্ট কোষের সমষ্টি (Cell Biomass) (Major Product)

+ কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ↑ (Minor Product)

উদাহরণস্বরূপ দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ইথাইল অ্যালকোহল উৎপাদনের কথা বলা যেতে পারে। এই ইথাইল অ্যালকোহল মদ প্রস্তুত শিল্পে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ। ইথাইল অ্যালকোহল (১) ঝোলাগুড় বা মোলাসেস এবং (২) শর্করা জাতীয় খাদ্য সুক্রোজ বা চিনি থেকে প্রস্তুত করা যেতে পারে। দুটি ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি নীচে দেখানো হোল ঃ

(১) ঝোলাগুড় (Molasses) —ঈষ্ট (*Saccharomyces Cerevisiae*)→ ইথাইল অ্যালকোহল (C_2H_5OH) (Major Product) + কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ↑ (Minor Product)

(ক) বায়ু বা অক্সিজেন উপস্থিত
(খ) এনজাইম বা উৎসেচক উপস্থিত (জাইমেজ)

(২) সুক্রোজ ($C_{12}H_{22}O_{11}$) + (H_2O) —ঈষ্ট (*Saccharomyces Cerevisiae*)→ গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) + ফ্রুক্টোজ ($C_6H_{12}O_6$)

(ক) বায়ু বা অক্সিজেন উপস্থিত
(খ) এনজাইম বা উৎসেচক উপস্থিত (ইনভারটেজ)

গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) —ঈষ্ট (*Saccharomyces Cerevisiae*)→ ইথাইল অ্যালকোহল ($2C_2H_5OH$) + কার্বন ডাইঅক্সাইড ($2CO_2$) ↑

(ক) বায়ু বা অক্সিজেন উপস্থিত
(খ) এনজাইম বা উৎসেচক উপস্থিত (জাইমেজ)

এই ইথাইল অ্যালকোহল থেকে বিভিন্ন ধরনের পাতিত অ্যালকোহলিক বেভারেজ (Distilled Alcoholic Beverage) যেমন হুইস্কি (Whisky), ব্র্যাণ্ডি (Brandy), রাম (Rum) ইত্যাদি তৈরী করা হয়। এই সমস্ত প্রোডাক্টের মধ্যে মূলতঃ পার্থক্য তৈরী হয় ইথাইল অ্যালকোহলের ঘনত্বের তারতম্যের জন্য।

ফার্মেন্টেশন বা সন্ধান প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিল্প জগৎও অনেক উপকৃত। বিভিন্ন ধরনের উপকারী জীবাণু, প্রধানতঃ ব্যাক্টেরিয়া তাছাড়া ঈষ্ট এবং মোল্ড এই প্রক্রিয়ার উপস্থিত থেকে বিভিন্ন ধরনের পদার্থ

যেমন—বিয়ার, ওয়াইন (মদ), অ্যান্টিবায়োটি (যেমন—পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরোটেট্রাসাইক্লিন, ষ্ট্রেপ্টোমাইসিন, নিওমাইনিস, ব্যাসিট্রাসিন ইত্যাদি), বিভিন্ন ধরনের জৈব অ্যাসিড (যেমন—সাইট্রিক অ্যাসিড, গ্লুকোনিক অ্যাসিড, ফিউমারিক অ্যাসিড, ম্যালিক অ্যাসিড) অ্যামিনো অ্যাসিড (গ্লুটামিক অ্যাসিড, অ্যাসপারটিক অ্যাসিড), ভিটামিন ছদ্দন্ধ. চ্$_{১২}$ বা সায়ানোকোবালামিন) ইত্যাদি তৈরী করতে সহায়তা করে।

সন্ধান প্রক্রিয়া যে পাত্র বা ভেসলের মধ্যে সম্পন্ন হয়, তাকে ফার্মেন্টর বলে। ফার্মেন্টর একটি বিশেষ ধরনের পাত্র যার মধ্যে জৈব রাসায়নিক পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্ত সূচক পরিমাপ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। এছাড়াও ফার্মেন্টরের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকে। চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হোল।

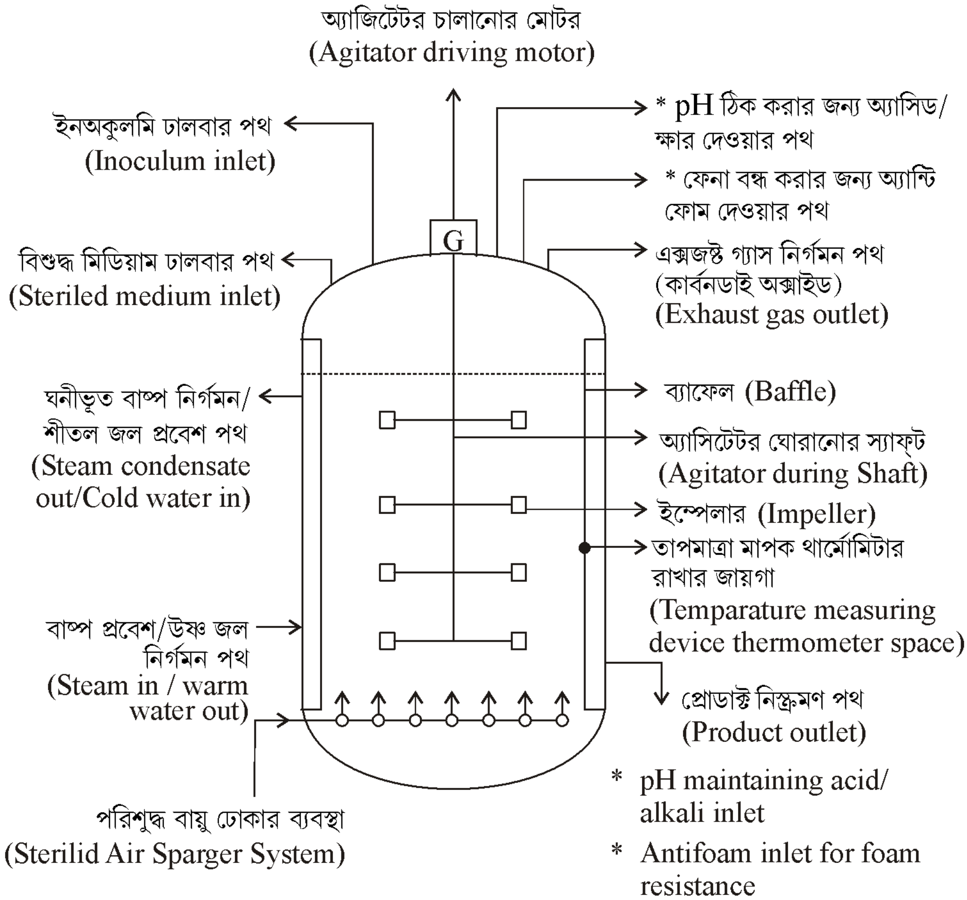

একটি কন্টিনিউয়াস ষ্টার্ড ট্যাঙ্ক ফার্মেন্টরের সচিত্র বর্ণনা (সিলিণ্ড্রিকাল টাইপ)

এছাড়াও আরও বিভিন্ন প্রকারের ফার্মেন্টর দেখা যায়। যেমন—(১) ব্যাচ ফার্মেন্টর, (২) এয়ার লিফট ফার্মেন্টর, (৩) কনিক্যাল ব্রিউিং টাইপ ফার্মেন্টর এবং (৪) ফ্লুইডাইজড্ বেড ফার্মেন্টর ইত্যাদি।

৪.৩ খাদ্য জীবাণুবিদ্যায় জীবাণুসমূহের উপকারী ভূমিকা

ব্যাক্টেরিয়ার ভূমিকা (Role of Bacteria) :

দুগ্ধ শিল্প (Dairy Industry) : দুগ্ধ শিল্পে জীবাণুর ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুধকে জীবাণুর উপস্থিতিতে সন্ধান প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের পদার্থে রূপান্তরিত করা যেতে পারে :

(ক) **দুধ থেকে যোগার্ট প্রস্তুতি :** যোগার্ট এক ধরনের দই। কিন্তু এতে গন্ধ মিশ্রিত থাকে এবং দুটি নির্বাচিত জীবাণু বা ব্যাক্টেরিয়া ইহার উৎপাদনের উল্লেখযোগ্য [illegible] (*Streptococcus thermophilus* sp.) এবং ল্যাক্টোব্যাসিলাস বুলগেরিকাস (*Lactobacillus bulgaricus*)। এই ব্যাক্টেরিয়া-দ্বয়ের সমষ্টিকে স্টার্টার কালচার (Starter culture) বলে।

দুধ —(ক) স্ট্রেপ্টোকক্কাস থার্মোফিলাস / (খ) ল্যাক্টোব্যাসিলাস বুলগেরিকাস→ যোগার্ট

(খ) **দুধ থেকে দই প্রস্তুতি :** দুধ থেকে দই প্রস্তুতিতে সহায়তাকারী ব্যাক্টেরিয়ার নাম ল্যাক্টোব্যাসিলাস কেসাই (*Lactobacillus casei*)। দই উৎপাদন করার প্রক্রিয়াটি একটি অবায়বীয় সন্ধান প্রক্রিয়া। ব্যাক্টেরিয়াটি মূলতঃ একটি ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়া।

দুধ —(ক) ল্যাক্টোব্যাসিলাস কেসাই / (খ) অবায়বীয় সন্ধান প্রক্রিয়া→ দই

(গ) **দুধ থেকে কোথার প্রস্তুতি :** এটিও সন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা উৎপন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য। স্ট্রেপ্টোকক্কাস ল্যাকটিস (*Streptococcus lactis*) এবং ল্যাক্টোব্যাসিলাস বুলগেরিকাস (*Lactobacillus bulgaricus*) নামক দুটি ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতিতে এই পরিবর্তন দেখা যায়।

দুধ —(ক) স্ট্রেপ্টোকক্কাস ল্যাকটিস / (খ) ল্যাক্টোব্যাসিলাস বুলগেরিকাস→ কোথার Khoa (Mawa)

৪.৩ খাদ্য জীবাণুবিদ্যায় জীবাণুসমূহের উপকারী ভূমিকা

২.৩.২ সন্ধানজাত খাদ্য শিল্প

(১) **বাঁধাকপি থেকে সাওয়ারক্রাউট উৎপাদন :** সাওয়ারক্রাউট (Sauerkraut) উৎপাদন একটি ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান প্রক্রিয়ার ফল। কুঁচোনো (Shredded) বাঁধাকপি (2-3%) খাদ্য লবণের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাবে উপযুক্ত পরিবেশে (20°-25°C তাপমাত্রায়, 3-5 সপ্তাহে) অবায়বীয় অবস্থায় সাওয়ারক্রাউটে রূপান্তরিত হয়। এই ব্যাক্টেরিয়াগুলির মধ্যে ল্যাক্টোব্যাসিলাস প্ল্যানটারাম (*Lactobacillus plantarum*) এবং লিউকোনষ্টক মেসেনটেরয়েড (*Leuconostoc mesenteroide*) নামের দুটি ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়া উল্লেখযোগ্য এছাড়া অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়াও উপস্থিত থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ল্যাক্টোব্যাসিলাস ব্রেভিস (*Lactobacillus brevis*), স্ট্রেপ্টোকক্কাস ফিকালিস (*Streptococcus faecalis*) এবং পিডিওকক্কাস সেরিভেসি (*Pediococcus cerevisiat*) ব্যাক্টেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

কুঁচোনো বাঁধাকপি (Shredded cabbage) —(ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়া / অবায়বীয় সন্ধান প্রক্রিয়া)→ সাওয়ারক্রাউট (Sauerkraut)

(২) **শূয়োরের মাংস/গোমাংস থেকে মাংসের সসেজ প্রস্তুতি :** মাংসের এইরূপ পরিবর্তনে সহায়তাকারী ব্যাক্টেরিয়ারা হোল পেডিওকক্কাস সেরিভেসি (*Pediococcus cerevisiae*) এবং মাইক্রোকক্কাস প্রজাতি (*Micrococcus* sp.)।

শূয়োরের মাংস/গোমাংস (Pork/Beef) —((ক) *Pediococcus cerevisiae* / (খ) *Micrococcus* sp.)→ শূয়োরের মাংসের সসেজ/গোমাংসের সসেজ (Pork/Beef Sausage)

(৩) **সয়াবিন থেকে ন্যাটো প্রস্তুতি :** ন্যাটো একটি সয়াবিনের সন্ধানজাত খাদ্য। ব্যাসিলাস ন্যাটো (*Bacillus natto*) নামের ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতিতে এই পরিবর্তন সম্পন্ন হয়।

সয়াবিন —(ব্যাসিলাস ন্যাটো)→ ন্যাটো।

৪.৪ সন্ধানজাত খাদ্য শিল্প

(১) **বাঁধাকপি থেকে সাওয়ারক্রাউট উৎপাদন :** সাওয়ারক্রাউট (Sauerkraut) উৎপাদন একটি ল্যাকটিক অ্যাসিড সন্ধান প্রক্রিয়ার ফল। কুঁচোনো (Shredded) বাঁধাকপি (2-3%) খাদ্য লবণের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ধরনের ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়ার প্রভাবে উপযুক্ত পরিবেশে (20°-25°C তাপমাত্রায়, 3-5 সপ্তাহে) অবায়বীয় অবস্থায় সাওয়ারক্রাউটে রূপান্তরিত হয়। এই ব্যাক্টেরিয়াগুলির মধ্যে ল্যাক্টোব্যাসিলাস প্ল্যানটারাম (*Lactobacillus plantarum*) এবং লিউকোনষ্টক মেসেনটেরয়েড (*Leuconostoc mesenteroide*) নামের দুটি ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়া উল্লেখযোগ্য এছাড়া অন্যান্য ব্যাক্টেরিয়াও উপস্থিত থাকে।

উদাহরণস্বরূপ ল্যাক্টোব্যাসিলাস ব্রেভিস (*Lactobacillus brevis*), ষ্ট্রেপ্টোকক্কাস ফিকালিস (*Streptococcus faecalis*) এবং পিডিওকক্কাস সেরিভেসি (*Pediococcus cerevisiat*) ব্যাক্টেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

কুঁচোনো বাঁধাকপি (Shredded cabbage) —ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়া / অবায়বীয় সন্ধান প্রক্রিয়া→ সাওয়ারক্রাউট (Sauerkraut)

(২) **শূয়োরের মাংস/গোমাংস থেকে মাংসের সসেজ প্রস্তুতি :** মাংসের এইরূপ পরিবর্তনে সহায়তাকারী ব্যাক্টেরিয়ারা হোল পেডিওকক্কাস সেরিভেসি (*Pediococcus cerevisiae*) এবং মাইক্রোকক্কাস প্রজাতি (*Micrococcus* sp.)।

শূয়োরের মাংস/গোমাংস (Pork/Beef) —(ক) *Pediococcus cerevisiae* / (খ) *Micrococcus* sp.→ শূয়োরের মাংসের সসেজ/গোমাংসের সসেজ (Pork/Beef Sausage)

(৩) **সয়াবিন থেকে ন্যাটো প্রস্তুতি :** ন্যাটো একটি সয়াবিনের সন্ধানজাত খাদ্য। ব্যাসিলাস ন্যাটো (*Bacillus natto*) নামের ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতিতে এই পরিবর্তন সম্পন্ন হয়।

সয়াবিন —ব্যাসিলাস ন্যাটো→ ন্যাটো।

৪.৫ রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতিতে সন্ধান

(১) **ফলের রস বা সিরাপ থেকে ভিনিগার বা অ্যাসেটিক অ্যাসিড প্রস্তুতি :** ভিনিগার হচ্ছে (4% V/V অর্থাৎ 4% $\frac{\text{আয়তন}}{\text{আয়তন}}$) অ্যাসেটিক অ্যাসিড। বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য যেমন—মাংস, আচার ইত্যাদিতে ভিনিগারের ব্যবহার আছে। ভিনিগার প্রস্তুতিতে সহায়ক ব্যাক্টেরিয়াটি

হোল অ্যাসিটোব্যাক্টর অ্যাসেটি (*Acetobacter aceti*)।

ফলের রস/সিরাপ —(ক) অ্যাসিটোব্যাক্টর অ্যাসেটি / (খ) সন্ধান প্রক্রিয়া→ ভিনিগার

(২) **অ্যাসিটোন থেকে বিউটানল বা বিউটাইল অ্যালকোহল উৎপাদন** : অ্যাসিটোন থেকে বিউটানল উৎপাদনে সহায়তাকারী ব্যাক্টেরিয়ার নাম ক্লসট্রিডিয়াম অ্যাসিটোবিউটাইলিকাম (*Clostridium acetobutylicum*)। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জৈব যৌগ।

অ্যাসিটোন —ক্লসট্রিডিয়াম অ্যাসিটোবিউটাইলিকাম→ বিউটানল / বিউটাইল অ্যালকোহল

(৩) **ডেক্সট্রান উৎপাদন** : ডেক্সট্রান একটি পলিস্যাকারাইড বা জটিল শর্করা। এটি লিউকোনস্টক মেসেনটেরয়েড (*Leuconostoc mesenteroide*) নামের ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতিতে ডেক্সট্রোজ নামক শর্করা থেকে উৎপাদিত হয়।

ডেক্সট্রোজ —লিউকোনস্টক মেসেনটেরয়েড→ ডেক্সট্রান

৪.৬ এনজাইম বা উৎসেচক প্রস্তুতি

(১) **ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা প্রস্তুত অ্যামাইলেজ (Bacterial Amylase)** : অ্যামাইলেজ একটি ষ্টার্চ বিশ্লেষক উৎসেচক। এটি প্রধানতঃ ব্যাসিলাস সাবটিলিস (*Bacillus subtilis*) নামক ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা উৎপন্ন হয়। অ্যামাইলেজ প্রধানতঃ তিন ধরনের হয়, যথা আলফা অ্যামাইলেজ (α-amylase) বিটা, অ্যামাইলেজ (β-amylase) এবং গামা অ্যামাইলেজ বা অ্যামাইলো গ্লুকোসাইডেজ (γ-amylase)। ব্যাসিলাস ষ্টিয়ারোথার্মোফিলাস (*Bacillus stearothermophilus*), ব্যাসিলাস মেগাটেরিয়াম (*Bacillus megaterium*) এবং ব্যাসিলাস অ্যামাইলোলিকুইফেসিসেন্স (*Bacillus amyloliquefaciens*) জাতীয় ব্যাসিলাস প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়াও অ্যামাইলেজ উৎসেচক তৈরী করতে সক্ষম। এটি কাগজ সাইজ করতে ব্যবহার করা হয়।

(২) **ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা প্রস্তুত প্রোটিয়েজ (Bacterial Protease)** : প্রোটিয়েজ একটি প্রোটিন বিশ্লেষণ উৎসেচক। এটি প্রধানতঃ ব্যাসিলাস সাবটিলিস (*Bacillus subtilis*) নামক ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা উৎপাদন করা হয়। বস্ত্র বা অন্যান্য পদার্থের ছোপ দূরীকরণে প্রোটিয়েজ ব্যবহৃত হয়।

(৩) **ব্যাক্টেরিয়ার দ্বারা প্রস্তুত লাইপেজ (Bacterial Lipase)** : লাইপেজ একটি ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ বিশ্লেষক উৎসেচক। সেরাসিয়া প্রজাতি (*Serratia* sp.),

করিনিব্যাক্টেরিয়াম প্রজাতি (*Corynebacterium* sp.) ইত্যাদি প্রজাতির ব্যাক্টেরিয়া লাইপেজ প্রস্তুত করতে সক্ষম। স্নেহ পদার্থের বিশ্লেষণে এবং ঔষধ প্রস্তুত শিল্পে লাইপেজ ব্যবহৃত হয়।

৪.৭ ঈষ্টের ভূমিকা

(১) **মোলাসেস বা ঝোলাগুড় থেকে বেকারীতে ব্যবহৃত ঈষ্ট প্রস্তুতি:** শিল্পে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে সন্ধান প্রক্রিয়ায় স্যাকারোমাইসেস সেরিভেসি (*Saccharomyces cerevisiae*) নামক ঈষ্টের সহায়তায় মোলাসেস বা ঝোলাগুড় থেকে বেকারস ঈষ্ট প্রস্তুত করা হয়। এই বেকারস ঈষ্ট হচ্ছে অসংখ্য ঈষ্ট কোষের সমষ্টি (cell biomass) বা কোষের জৈব ভর। এই প্রক্রিয়া কার্বন ডাইঅক্সাইড একটি উপজাত দ্রব্য হিসাবে উৎপন্ন হয়। বেকারস ঈষ্ট পাঁউরুটি শিল্পে অত্যন্ত সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

মোলাসেস/ঝোলাগুড় —[(ক) স্যাকারোমাইসেস সেরিভেসি (ঈষ্ট); (খ) অক্সিজেনের উপস্থিতিজনিত সন্ধান প্রক্রিয়া]→ কোষসমষ্টি বা কোষের জৈব ভর বা বেকারস ঈষ্ট (Cell Biomass/) (Baker's Yeast) + কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ↑

(২) **মোলাসেস বা ঝোলাগুড় থেকে ইথাইল অ্যালকোহল প্রস্তুতি :** শিল্পে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে সন্ধান প্রক্রিয়ায় স্যাকারোমাইসেস সেরিভেসি (*Saccharomyces cerevisiae*) নামক ঈষ্টের সহায়তায় মোলাসেস বা ঝোলাগুড় থেকে ইথাইল অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়। এই প্রক্রিয়াতে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস CO_2 একটি উপজাত পদার্থ হিসাবে সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রকার পাতিত অ্যালকোহলিক পানীয় প্রস্তুতিতে ইথাইল অ্যালকোহল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ।

মোলাসেস বা ঝোলাগুড় —[(ক) স্যাকারোমাইসেস সেরিভেসি; (খ) অক্সিজেনের অনুপস্থিতিজনিত সন্ধান প্রক্রিয়া]→ ইথাইল অ্যালকোহল (C_2H_5OH) + কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) ↑

(৩) **ফলের রস থেকে মদ প্রস্তুতি :** ফলের রস থেকে মদ প্রস্তুতিতে অন্যতম সহায়ক ঈষ্ট হচ্ছে স্যাকারোমাইসেস ইলিপসয়ডিউস (*Saccharomyces ellipsoideus*)। বিভিন্ন প্রকার ফলের রস যেমন, আঙুর, আপেল, চেরী, ষ্ট্রবেরী ইত্যাদির থেকে এই মদ প্রস্তুত করা যেতে পারে। এই প্রস্তুতিও সন্ধান প্রক্রিয়ায় একটি দৃষ্টান্ত। এই প্রক্রিয়াতেও ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হয় এবং ঘনত্ব (14–16%)।

$$\text{ফলের রস} \xrightarrow{\text{স্যাকারোমাইসেস ইলিপসয়ডিউস}} \text{মদ}$$

(৪) **মল্ট বা বার্লির অঙ্কুরোদ্‌গম দ্বারা সৃষ্ট পদার্থের থেকে বিয়ার প্রস্তুতি :** বার্লি একটি শস্যজাতীয় পদার্থ। ইহার অঙ্কুরোদ্‌গমের (Germination) ফলে মল্ট উৎপন্ন হয়। সন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা মল্ট থেকে বিয়ার উৎপাদনের স্যাকারোমাইসেস কার্লসবারজেনসিস (*Saccharomyces carlsbergensis*) নামক ঈষ্টের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়াতেও ইথাইল অ্যালকোহল উৎপন্ন হয় এবং ইহার ঘনত্বের পরিমাণ (6–8%)।

$$\underset{\text{(Malt)}}{\text{মল্ট}} \xrightarrow{\text{স্যাকারোমাইসেস কার্লসবারজেনসিস}} \underset{\text{(Beer)}}{\text{বিয়ার}} + \underset{(CO_2)\uparrow}{\text{কার্বন ডাইঅক্সাইড}}$$

(৫) **চিনি থেকে সাকে মদ প্রস্তুতি :** সাকে মদ জাপানে বহুল ব্যবহৃত একটি মদ। এটি চিনি বা কোনও বেশী চিনিযুক্ত ফলের অবায়বীয় সন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা তৈরী করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি স্যাকারোমাইসেস সাকে (*Saccharomyces sake*) নামক ঈষ্টের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়।

$$\text{চিনি} \xrightarrow{\text{স্যাকারোমাইসেস সাকে}} \text{সাকে}$$

(৬) **কাগজ শিল্পের বর্জ্য পদার্থ থেকে এককোষী প্রোটিন (Single Cell Protein or S.C.P) উৎপাদন :** এই এককোষী প্রোটিন একটি জীবাণুভুক্ত প্রোটিন (Microbial protein)। কাগজ শিল্পের বর্জ্য পদার্থ থেকে ক্যানডিডা ইউটিলিস (*Candida utilis*) বা টরুলা ইউটিলিস (*Torula utilis*) ঈষ্টের উপস্থিতিতে এই উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

(৭) **ভিটামিন B_2 বা রিবোফ্ল্যাভিন উৎপাদন :** এরিমোথেসিয়াম অ্যাসবি (*Erymothecium ashbi*) নামক ঈষ্ট জলে দ্রবীভূত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিটামিন—ভিটামিন B_2 বা রিবোফ্ল্যাভিন (Riboflavin) উৎপাদনে সহায়তা করে।

৪.৮ মোল্ডের ভূমিকা (Role of Molds) :

অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন (Antibiotic Production) :

(১) **পেনিসিলিন প্রস্তুতি** : পেনিসিলিয়াম নোটেটাম (*Penicillium notatum*)বা পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম (*Penicillium chrysogenum*) নামক ছত্রাক পেনিসিলিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনে সহায়তা করে।

(২) **নিষ্টাটিন উৎপাদন** : সন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা অ্যাসপারজিলাস প্রজাতি (*Aspergillus* sp.) বা পেনিসিলিয়াম প্রজাতির (*Penicillium* sp.) মোল্ডের উপস্থিতিতে নিষ্টাটিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক প্রস্তুত করা হয়।

(৩) **গ্রিসিওফালভিন** : পেনিসিলিয়াম গ্রিসিওফালভাম (*Penicillium Griseofulvum*) নামক মোল্ডের সহায়তায় গ্রিসিওফালভিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন করা হয়।

(৪) **সেফালোস্পোরিন উৎপাদন** : সেফালোস্পোরিয়াম অ্যাক্রিমোনিয়াম (*Cephalosporium acremonium*) নামক মোল্ডের উপস্থিতিতে সেফালোস্পোরিন নামক অ্যান্টিবায়োটিক উৎপন্ন হয়।

৪.৯ জৈব অ্যাসিড প্রস্তুতি (Production of Organic Acids) :

(১) **সাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতি** : সন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা অ্যাসপারজিলাস নাইগার (*Aspergillus niger*) বা অ্যাসপারজিলাস ওয়েনটি (*Aspergillus wentii*) নামক মোল্ডের উপস্থিতিতে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই সাইট্রিক অ্যাসিড বিভিন্ন খাদ্যে যেমন আমের স্কোয়াশ, ঠাণ্ডা পানীয়, জেলি, জ্যাম, ইত্যাদিতে এবং ঔষধ প্রস্তুতিতেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

(২) **ফিউমারিক অ্যাসিড প্রস্তুতি** : সন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা রাইজোপাস নিগ্রিক্যান্স (*Rhizopus nigricans*) নাকম মোল্ডের উপস্থিতিতে ফিউমারিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। রেজিন তৈরীতে এই অ্যাসিডের ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) **গ্লুকোনিক অ্যাসিড প্রস্তুতি** : সন্ধান প্রক্রিয়ার সাহায্যে অ্যাসপারজিলাস নাইগার (*Aspergillus niger*) নামক মোল্ডের উপস্থিতিতে গ্লুকোনিক অ্যাসিড উৎপাদন করা হয়। বস্ত্র শিল্পে, ঔষধ শিল্পে, চামড়ার জিনিস তৈরীর এই অ্যাসিডের ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম।

(৪) **ইটাকনিক অ্যাসিড প্রস্তুতি** : সন্ধান প্রক্রিয়ায় দ্বারা অ্যাসপারজিলাস টেরিয়াস

(*Aspergillus terreus*) নামক মোল্ডের উপস্থিতিতে ইটাকনিক অ্যাসিড উৎপাদন করা হয়। এই অ্যাসিড রেসিন প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা হয়।

(৫) **ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদন** : সন্ধান প্রক্রিয়ার সাহায্যে রাইজোপাস ওরাইজি (*Rhizopus oryzae*) নামক মোল্ডের উপস্থিতিতে ল্যাকটিক অ্যাসিড উৎপাদন করা হয়। বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দ্রব্য এবং ঔষধ শিল্পে এই অ্যাসিডের ব্যবহার আছে।

৪.১০ সন্ধানজাত খাদ্য প্রস্তুতি

(১) **সয়াবিন থেকে কিনেমা প্রস্তুতি** : কিনেমা একটি সন্ধান প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বহুল প্রচলিত জাপানী খাদ্য। রাইজোপাস অলিগোস্পোরাস (*Rhizopus oligosporus*) নামক মোল্ডের উপস্থিতিতে সয়াবিন থেকে কিনেমা প্রস্তুত করা হয়।

$$\text{সয়াবিন} \xrightarrow{\text{রাইজোপাস অলিগোস্পোরাস}} \text{কিনেমা}$$

(২) **সয়াবিন থেকে টেম্পে প্রস্তুতি** : টেম্পেও সন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রস্তুত একটি জাপানী খাদ্য। রাইজোপাস অলিগোস্পোরাস (*Rhizopus oligosporus*) নামক মোল্ডের একটি বিশেষ স্ট্রেইন (Strain) ব্যবহার করে টেম্পে প্রস্তুত করা হয়।

৪.১১ অ্যাক্টিনোমাইসেটিসের ভূমিকা

(১) অ্যাক্টিনোমাইসেটিসের গোত্রের জীবাণুরা হোল এক ধরনের শাখা-প্রশাখা সমন্বিত তন্তুযুক্ত গ্রাম পজিটিভ ব্যাক্টেরিয়া। ইহাদের খাদ্যজীবাণুবিদ্যায় অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনে ব্যবহার অপরিসীম।

(ক) **স্ট্রেপ্টোমাইসিন উৎপাদন** : স্ট্রেপ্টোমাইসেস গ্রিসিয়াস (*Streptomyces griseus*) সন্ধান প্রক্রিয়ায় স্ট্রেপ্টোমাইসিন তৈরী করে।

(খ) **ক্লোরামফেনিকল বা ক্লোরোমাইসেটিন প্রস্তুতি** : স্ট্রেপ্টোমাইসেস ভেনিজুয়েলা (*Streptomyces venezuelae*) এই অ্যান্টিবায়োটিক তৈরীতে সহায়তা করে।

(গ) **এরিথ্রোমাইসিন উৎপাদন** : স্ট্রেপ্টোমাইসেস এরিথ্রাসিয়াস (*Streptomyces erythraceus*) নামক অ্যাক্টিনোমাইসেটিস সন্ধান প্রক্রিয়ায় এই অ্যান্টিবায়োটিক তৈরী করে।

(ঘ) **টেট্রাসাইক্লিন উৎপাদন :** স্ট্রেপ্টোমাইসেস অরিওফেসিয়েন্স (*Streptomyces aureofaciens*) নামক অ্যাক্টিনোমাইসেটিস সন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা এই অ্যান্টিবায়োটিক উৎপন্ন করে।

(ঙ) **ভ্যানোমাইসিন উৎপাদন :** স্ট্রেপ্টোমাইসেস ওরিয়েন্টালিস (*Streptomyces orientalis*) নামক অ্যাক্টিনোমাইসেটিস এই অ্যান্টিবায়োটিক উৎপন্ন করে। এটিও একটি সন্ধান প্রক্রিয়া।

(চ) **অক্সিটেট্রাসাইক্লিন উৎপাদন :** স্ট্রেপ্টোমাইসেস রাইমোসাস (*Streptomyces rimosus*) নামক অ্যাক্টিনোমাইসেটিস এই অ্যান্টিবায়োটিক তৈরী করে। ইহাও একটি সন্ধান প্রক্রিয়া।

(ছ) **ক্লোরোটেট্রাসাইক্লিন প্রস্তুতি :** স্ট্রেপ্টোমাইসেস অরিওফেরিয়েন্সের (*Streptomyces aureofaciens*) একটি বিশেষ স্ট্রেইন (Strain) এই অ্যান্টিবায়োটিক সন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা তৈরী করে।

(জ) **কানামাইসিন প্রস্তুতি :** স্ট্রেপ্টোমাইসেস কানামাইসেটিকাস (*Streptomyces kanamyceticus*) নামক বিশেষ ধরনের অ্যাক্টিনোমাইসেটিস এই অ্যান্টিবায়োটিক তৈরী করে। এই প্রক্রিয়াটি একটি সন্ধান প্রক্রিয়া।

(২) **ভিটামিন B_{12} বা সায়ানোকোবালামিন উৎপাদন :** ভিটামিন B_{12} বা সায়ানোকোবালামিন এটি জলে দ্রবণীয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন। স্ট্রেপ্টোমাইসেস অলিভাসিয়া (*streptomyces olivaceus*) নামক অ্যাক্টিনোমাইসেটিস সন্ধান প্রক্রিয়ার দ্বারা ভিটামিন B_{12} বা সায়ানোকোবালামিন তৈরী করে।

৪.১২ সারাংশ

সমগ্র বিষয়টি অধ্যয়ন করে সন্ধান প্রক্রিয়া ও বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের পচন সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করতে পারি। এছাড়াও খাদ্যজীবাণুবিদ্যায় ব্যাক্টেরিয়া, ঈষ্ট, মোল্ড এবং অ্যাক্টিনোমাইসেটিসের গুরুত্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারি। সুতরাং সামগ্রিকভাবে খাদ্য জীবাণুবিদ্যায় বিভিন্ন ধরনের জীবাণুর সংক্রমণ এবং তাদের উপকারী ভূমিকা সম্বন্ধে একটি বিস্তারিত তালিকা প্রস্তুত করতে পারি।

৪.১৩ অনুশীলনী

1. শূন্যস্থান পূরণ করুণ ঃ

(ক) সন্ধান প্রক্রিয়া —— এবং —— দুই ভাবেই সম্পন্ন হয়।

(খ) বেকারস ঈষ্ট উৎপাদনকারী জীবাণুর নাম ——।

(গ) সন্ধান প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত দুটি উৎসেচকের নাম —— এবং ——।

(ঘ) মোল্ড দ্বারা পাঁরুটির পচনকে —— বলে।

(ঙ) ব্যাক্টেরিয়া দ্বারা পাঁউরুটির পচনকে —— বলে।

(চ) ব্যাক্টেরিয়াজনিত নরম পচনের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়া হোল ——।

(ছ) দুধের রোপিনেসের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়ার নাম ——।

(জ) দুধের হলুদ রঙের পরিবর্তনের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়ার নাম ——।

2. একাধিক উত্তরের মধ্যে সঠিকটি বাছুন ঃ

(১) গাঁজ প্রক্রিয়ায় কোন উপাদান প্রধানত ভেঙে যায়?

(ক) প্রোটিন, (খ) শর্করা, (গ) লিপিড, (ঘ) খনিজ পদার্থ

উত্তর ঃ (খ) শর্করা

(২) দুধকে দইয়ে রূপান্তরিত করতে প্রধানত কোন ব্যাকটেরিয়া ব্যবহৃত হয়?

কs

(ক) Streptococcus thermophilus এবং Loctobacillus bulgaricus

(খ) Escherichia coli এবং Bacillus subtilis

(গ) Clostridium botulinum এবং Pseudomonas aeruginosa

(ঘ) Rhizobium এবং Azotobacter

উত্তর ঃ (ক) Streptococcus thermophilus এবং Loctobacillus bulgaricus

(৩) নিম্নলিখিত কোনটি গাঁজনজনিত খাদ্য নয়?

(ক) দই, (খ) পনির, (গ) মধু, (ঘ) কিমচি

উত্তর ঃ (গ) মধু

(৪) গাঁজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রধানত কোন গ্যাস উৎপন্ন হয়?

(ক) অক্সিজেন, (খ) নাইট্রোজেন, (গ) কার্বন ডাই অক্সাইড, (ঘ) হাইড্রোজেন

উত্তর ঃ (গ) কার্বন ডাই অক্সাইড

(৫) এলকোহলিক গাঁজনের ফলে কোন যৌগ তৈরি হয়?

(ক) অ্যাসিটিক অ্যাসিড, (খ) ল্যাকটিক অ্যাসিড, (গ) ইথানল, (ঘ) ম্যালিক অ্যাসিড

উত্তর ঃ (গ) ইথানল

(৬) নিম্নলিখিত কোনটি ল্যাকটিক এসিড গাঁজনের একটি উদাহরণ?

(ক) রুটি বানানো, (খ) মদ প্রস্তুতি, (গ) দই তৈরি, (ঘ) সিরকা উৎপাদন

উত্তর ঃ (গ) দই তৈরি

(৭) গাঁজন একটি কী ধরণের প্রক্রিয়া?

(ক) অ্যারোবিক (Aerobic), (খ) অ্যানারোবিক (Anaerobic), (গ) উভয় (Both), (ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর ঃ (খ) অ্যানারোবিক (Anaerobic)

একক ৫ ❑ খাদ্য প্রযুক্তি

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য
৫.১ প্রস্তাবনা
৫.২ খাদ্য সংরক্ষণ
৫.২.১ শুষ্কীকরণ পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ
৫.২.১.১ নিরুদন ও সূযালোকে শুষ্কীকরণ
৫.২.১.২ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুষ্কীকরণ
৫.২.২ টিনের পাত্রে খাদ্য সংরক্ষণ
৫.২.৩ হিমায়ন পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ
৫.২.৪ রাসায়নিক প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করে সংরক্ষণ
৫.৩ ফল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে কারিগরী বিদ্যা
৫.৩.১ জেলি
৫.৩.২ জ্যাম
৫.৩.৩ মার্মালেড
৫.৩.৪ স্কোয়াস
৫.৩.৫ আচার ও সস্
৫.৪ খাদ্যশস্যে কারিগরী বিদ্যা
৫.৪.১ চাল
৫.৪.২ ধান ও চাল হতে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্যবস্তু
৫.৪.২ গম
৫.৪.৪ ডাল
৫.৫ বেকারী শিল্প
৫.৬ সারাংশ
১.১২ অনুশীলনী

১.০ উদ্দেশ্য

উদ্ভিকাঁচা খাবার থেকে তৈরী খাবার অনেক প্রযুক্তি করতে হয় রান্নাঘর থেকে আরম্ভ করে ফ্যাক্টরী হয়ে ভোক্তার টেবিল পর্য্যন্ত। তবে শিল্প বা ইন্ডাষ্ট্রী এখানে কিছু কিছু আলোচনা করা হবে; তাও মাত্র কয়েকটি বিষয়ে যাদের যৌক্তিকতা বেশী বলে মনে হয়েছে। খাবার ত নষ্ট হয়ে যায়; সেইজন্য সংরক্ষণ

করতে হয়। কি কি উপায়ে খাদ্য সংরক্ষিত হতে পারে সেটা জানা দরকার, যেমন বায়ু পরিবেশ কন্ট্রোল করেও। খাবার ত নানারকমের, ইন্ডাষ্ট্রীও অগুণতি। একেবারে কাঁচা খাবার থেকে কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য তৈরী করার এবং পরিবেশে তৈরী খাবারেরও ইন্ডাষ্ট্রী হয়েছে। এদের থেকে বেছে কয়েকটি সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়াও প্রচেষ্টা আছে। দেশ ও কালের সঙ্গে সাযুজ্য আছে, আপেক্ষিকভাবে কম হাই-টেক, এখানে লোকেরা মোটামুটি জানেও হয়ত নিজেরা করতেও পারে, ক্ষুদ্র থেকে মাঝারি শিল্প—এ রকম বিবেচনায় আলোচনা করা হয়েছে এদের ঃ ফল প্রক্রিয়াকরণ ও নানারকম ফলজাত দ্রব্য, খাদ্যশস্যে কিছু কিছু সুবিদিত প্রক্রিয়া ও দ্রব্য, বেকারী শিল্প, এক্সট্রুডেড খাদ্যসামগ্রী, মিষ্টান্ন তৈরীর প্রযুক্তি এবং শেষে প্যাকেজিং।

৫.১ প্রস্তাবনা

কৃষি, পশুপালন, ফিশারী ও ফরেষ্ট্রী থেকে খাদ্য উৎপাদন ত হল, এরপর অনেক প্রযুক্তি দরকার। প্রথমেই পোষ্ট-হার্ভেষ্ট প্রযুক্তি খাওয়ার জন্য তৈরী করার আগে পর্য্যন্ত। এখানে যেমন খাদ্য উৎপাদন বিচার করা হচ্ছে না, তেমনি এর পরের প্রযুক্তিও না। আমরা দেখব খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ থেকে শুরু করে—তারপর খাদ্যশিল্প বা ইন্ডাষ্ট্রী। খাদ্য উৎপাদন খুব জরুরী ও দরকারী; এটা করেই ছেড়ে দেওয়া হত। সাধারণ বা গ্রামের স্তরে কিছু মাধ্যমিক মাপের কাজ করে রান্নাঘরের প্রযুক্তির উপর ছেড়ে দেওয়া হত। কয়েক বছর আগে এই কাজের চেইনটাকে বাড়ানো হয়; কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রসেসিং প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং ষ্টেটগুলিতে ঐ রকম ডিপার্টমেন্ট স্থাপন করা হয়। গ্রামাঞ্চলের বেকারত্ব কমানোরও উদ্দেশ্য ছিল। আর কাঁচা খাদ্য উৎপাদনের জায়গা গ্রাম; গ্রাম শহরে মাল নিয়ে আসবে না—শহর গ্রামে যাবে এবং খাদ্য প্রেসেসিং ইন্ডাষ্ট্রী যে মাপেরই সম্ভব হয় (গ্রামের পঞ্চায়েত বা গ্রামবাসী যা পারবে) তাহাই করা যাবে। সরকারের অফিসগুলো থেকে নানারকমের সাহায্য পাওয়ার ফলে খাদ্যপ্রযুক্তির ইন্ডাষ্ট্রী তৈরী হচ্ছে। নাগরিকদের স্তরে কিছু করতে পারার প্রস্তুতিতে এই লেখা। তাছাড়া খাদ্যবিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান ও জীবনবিজ্ঞান ইত্যাদি পড়ে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগ বা ফলিতবিদ্যা একটি দরকারী পদক্ষেপও হবে।

খাদ্য সরক্ষণ খাদ্যপ্রযুক্তিতে প্রথমেই আসে। খাদ্য উৎপাদনের মরশুম এবং বিশেষ বিশেষ উৎপাদনস্থলে কোন কোন সময় কাঁচা খাদ্য বেশ খানিকটা কমে যেতে পারে। এগুলোতে জৈবিক প্রক্রিয়া চলতেই থাকে এরা অন্যান্য জড় পদার্থের মত নয়; নিজস্ব এনজাইম এবং জীবাণু ও পোকাদের জৈব কাজে খাদ্য পরিবর্তিত হতেই থাকে। শেষে নষ্ট বা খাবার অযোগ্য হয়। উৎপাদিত ফল শতকরা ৩০ ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং সংরক্ষণ করা দরকার। আর মাত্র একভাগ উৎপাদন প্রসেস করা হয়, বাকী সব টাটকা অবস্থায় খাওয়া হয় (ব্যাপারটা ভাল হলেও উৎপাদক ঠিক দাম পায় না) অথবা নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য প্রক্রিয়াজাত নানারকম উৎপাদন করাই যুক্তিযুক্ত। সংরক্ষণ খাদ্য প্রযুক্তিতে একটি বিশেষ কাজ। তাপ, ঠাণ্ডা শুকোনো ও বায়ুশূন্যতা ত আছেই, তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিবেচিত প্রয়োগ আজকাল সম্ভব—এর সব বন্দোবস্ত আজকাল করা যায়। বায়বীয় আবহাওয়ার কন্ট্রোল ও পরিবর্তন করে কাঁচা ও টাটকা খাবার, পাকাবার মতন ফল এবং অক্সিজেনে নষ্ট হতে পারে এমন খাবার সিল করে রাখা এবং ট্রান্সপোর্ট করা যায়। প্লাষ্টিক পাত্র বা প্যাক-এর জন্য উপযোগী। পুরো ব্যাপারটা সহজেই করা যায়।

অনেক অনেক এবং নতুন নতুন প্রক্রিয়া করা যায়। এখানে মাত্র গুটিকয়েক নমুনা হিসাবে উল্লেখিত হল।

ফল প্রক্রিয়াকরণ একটা আকর্ষনীয় কাজ। নানারকমের সুস্বাদু, পুষ্টিকর, ভাইটামিন বিশেষ করে ভাইটামিন সি সমৃদ্ধ, এবং আনন্দদায়ক খাবার হয়। এই ইন্ডাষ্ট্রীর পরিচিতিও খুব, কারণ অনেকেই ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান গড়ে ফলজাত খাদ্য ও পানীয় তৈরী করে ব্যবসায় করতে পেরেছে।

খাদ্যশস্যের প্রযুক্তি ছোট স্কেলে হলেও চলে আসছে এবং চলে আসতে বাধ্য। খাবারের ইন্ডাষ্ট্রীর মূলধন এবং টার্নঅভার পৃথিবী জুড়েই সবচেয়ে বেশী; খাদ্যশস্য অন্যান্য খাদ্যের সঙ্গে মিলে এই বৃহৎ পটভূমিকার সৃষ্টি করেছে খাদ্য প্রযুক্তির অনুকূলে।

বেকারী শিল্পও খুব বিস্তৃত। কারণ বেকারী দ্রব্য পাউরুটি, কেক ও বিস্কুট খুব প্রিয় খাদ্য চা ও জলখাবারে। তাছাড়া গম ত প্রধান শস্য; পশ্চিমবঙ্গেও এখন প্রচুর চাষ হচ্ছে। বেকারী ওভেনও খুব খরচ সাপেক্ষ নয়, বিশেষভাবে পঞ্চায়েত বা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে স্থাপন করা যায়। সুতরাং গ্রামাঞ্চলে বেকারী শিল্প স্থাপনা ও বৃদ্ধির খুব সম্ভাবনা আছে।

এক্সট্রুডেড খাবার আজকাল খুব চালু হতে চলেছে। মেসিনের খুব সুবিধা। নানারকমের খাদ্যের মিক্সচার—যে খাবার চালের খুদ, ডালের গুড়ো, তৈলবীজের তৈলবিহীন খাওয়ার উপযুক্ত গুড়ো, ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেক রকমের এই ধরনের খাবার সুন্দর প্যাকেটে বিক্রী হতে পারে।

মিষ্টান্ন শিল্প বাংলার একটি বিশেষ গর্বের বস্তু। আজকাল এই শিল্পের সঙ্গে ব্যবসায়িক সাফল্য, এমনকি রপ্তানীর সম্ভাবনা, এই ইন্ডাষ্ট্রীর ভাল ভবিষ্যতের নির্দেশ দেয়। ট্রাডিশন্যাল খাবারগুলির ব্যবহার খুবই যুক্তিযুক্ত।

সব খাদ্যবস্তুর জন্যই ভাল প্যাকেজ আজকাল খুবই দরকার, এমনকি ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য আরও বিশেষভাবে। চিরাচরিত প্যাকেজ ছাড়া আজকাল প্লাষ্টিক ফিল্ম ও ল্যামিনেটের ব্যবহার বেড়েছে। এদের সহজে তাপ অথবা বিশেষ আঠা দিয়ে সিল করা যায়, সহজে ছাপানো যার বাইরের দিকে, ভেতরের জিনিষ দেখে ক্রেতারা বুঝতে পারে; এবং নিষিদ্ধ নয় এমন ফরমুলেশন ব্যবহার করলে নিরাপদ হবে ও আইনের কোন বিপদ হবে না।

শুধু খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য মিনিষ্ট্রি বা ডিপার্টমেন্টই নয়, গভর্ণমেন্ট বহু ফুড পার্কও স্থাপন করছে; সমুদয় পরিকাঠামোর সুবিধাই যাতে এক জায়গায় পাওয়া যায়। খাদ্য ইন্ডাষ্ট্রীর জন্য কাঁচামাল ও অন্যান্য ইনপুট, সংরক্ষণ (ঠাণ্ডা স্টোরেজ, চিলিং প্লান্ট), ম্যানুফেকচার মার্কেট ও ট্রেডিং করা, গুদাম ঘর ইত্যাদির বন্দোবস্ত থাকবে; কোন কোন স্থানে বিশেষ ব্যাঙ্কও থাকতে পারে।

৫.২ খাদ্য সংরক্ষণ

১.২.১ শুষ্কীকরণ পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ

নিরুদন—কৃত্রিম উপায়ে শুষ্কীকরণ, নিরুদন বনাম সূর্যালোকের শুষ্কীকরণ, শুকনো খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, নিরুদন পদ্ধতি খাদ্য সংরক্ষণের সহায়ক।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুলের সূর্যালোকে শুষ্কীকরণ পদ্ধতি। যথা—কলা, আম, ইত্যাদি। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুষ্কীকরণ—প্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র ও অপ্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র।

প্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র, যথা—

(১) Tray শুষ্কীকরণ যন্ত্র

(২) টানেল শুষ্কীকরণ যন্ত্র

(৩) Fluidised bed শুষ্কীকরণ যন্ত্র

(৪) স্প্রে জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্র

অপ্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র, যথা—

(১) ড্রাম জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্র

(২) বায়ুশূন্য শুষ্কীকরণ যন্ত্র

(৩) Freeze শুষ্কীকরণ যন্ত্র

শুষ্কীকরণ ঃ

শুষ্কীকরণ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি থেকে অনুসরণ করা হয়েছে। যদিও আমরা এই পদ্ধতির কিছু অংশ আরো উন্নততর করতে সমর্থ হয়েছি। শুষ্কীকরণ হচ্ছে প্রচলিত খাদ্য সংরক্ষণ পদ্ধতি। আগুনের তাপে খাবারকে শুকনো করার পদ্ধতি বহু পূর্বেই মানুষ আবিষ্কার করে। আদিম মানুষও এই পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত ছিল। যদিও ১৭৯৫ খ্রীঃপূর্বে শুষ্ক উষ্ণ বাতাসে সংস্পর্শ দ্বারা খাদ্য শুকনো পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষ অবহিত ছিল না। সর্বপ্রথম মেসন এবং চেলট ফ্রান্সে শুষ্ক উষ্ণ বায়ু সংস্পর্শের দ্বারা সব্জী শুষ্কীকরণে পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এ প্রসঙ্গে এই ঘটনাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে শুষ্কীকরণ পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ এবং টিনের পাত্রজাত করে খাদ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি একই সময়ে আবিষ্কৃত হয়েছিল।

৫.২.১.১ নিরুদন ও সূর্যালোকে শুষ্কীকরণ

নিরুদন পদ্ধতিতে আবহাওয়ার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং একটি ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিবেশ গড়ে তোলা হয়, যা শুষ্কীকরণের পক্ষে উপেযোগী। অপরদিকে সূর্যালোকে শুষ্কীকরণ সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। নিরুদন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন শুকনো খাদ্যের গুণমাত্রা সূর্যালোক দ্বারা শুকনো খাদ্যের তুলনায় ভাল। তাছাড়া সূর্যালোকে খাদ্য শুকাতে যে পরিমাণ জায়গা লাগে তার থেকে নিরুদন প্রক্রিয়ায় খাদ্য শুকাতে অনেক কম জায়গা লাগে। তাছাড়া নিরুদন প্রক্রিয়ায় শুকানোর ফলে খাদ্যের পরিমাণ অনেক বেশী থাকে, কেন না সূর্যালোকে শুকানোর সময়ে স্বাভাবিক শ্বসনের কারণে প্রচুর পরিমাণ চিনি অপসারিত হয়। তাছাড়া যেহেতু সূর্যালোকে শুকাতে বেশী সময় লাগে সেহেতু স্বাভাবিক সন্ধান প্রক্রিয়াতেও বেশ কিছু পরিমাণ চিনি নষ্ট হয়। যদিও সূর্যালোকে খাদ্য শুকাতে কোন খরচা হয় না। এছাড়া প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য সূর্যালোকে খাদ্য শুকানো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না

শুষ্কীকৃত এবং নিরুদিত খাদ্যদ্রব্যের মাত্রা (Food value) অন্যান্য পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খাদ্যের তুলনায় বেশী। তাছাড়া খাদ্য শুকাতে অনেক কম খরচ লাগে এবং অনেক কম পরিশ্রম।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফলের শুষ্কীকরণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করবার পদ্ধতির বর্ণনা—যথা কলা ও আম।

কলা ঃ পাকা শুকনো কলাকে বলা হয় 'Banana fig' । এর জন্য প্রথমে পাকা ফলের খোসা ছাড়িয়ে লম্বালম্বি করে কাটা হয়। এরপর সেই টুকরোগুলিকে SO_2 দ্রবণে ডুবিয়ে সূর্যালোক উপস্থিতিতে অথবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুকনো হয়। কাঁচা কলাকে এরপর কিছুক্ষণ গরম জলে ডুবিয়ে খোসা ছাড়ানো হয়। তারপর খণ্ডীকৃত করা হয়। সেই খন্ডগুলিকে শুকানো হয়। এরপর সেইগুলিকে ভাজা হয় অথবা রান্না করা হয়। শুকানোর পর কলার খণ্ডগুলিকে গুড়ো করে কলার পাউডার তৈরী করা যায়।

আম ঃ কাঁচা, সবুজ খন্ডীকৃত আম সূর্যালোকে শুকানো হয়। সেই শুষ্কীকৃত আম, আমের পাউডার তৈয়ারীতে ব্যবহৃত হয় এবং বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে স্বাদবর্ধক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পাকা আমের Pulp হাত দিয়ে চাপ দিয়ে বার করা হয়। এরপর সেই আমের Pulp-তে অল্প চিনি যোগ করে বাঁশের মাদুরে বিছিয়ে শুকান হয়। একটি স্তর শুকান হলে তার উপরে আবার নতুন আমের Pulp যোগ করে পুনরায় শুকান হয়। এই পদ্ধতি ততদূর পর্যন্ত চালান হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত শুষ্কীকৃত Pulp-এর বেধ ১·২-২·৫ সেমি হয়। এই প্রকার শুষ্কীকৃত আমের Pulp-এর রঙ হয় ঈষৎ হালকা হলুদাভ লাল। যদিও এই জাতীয় দ্রব্যের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েকমাস, এর মূল কারণ হল পতঙ্গের আক্রমণ এবং দ্রব্যের নিজস্ব বর্ণের দ্রুত পরিবর্তন। যদিও এই সমস্ত ত্রুটিসমূহ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শুষ্কীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে দূর করা যায়।

৫.২.১.২ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শুষ্কীকরণ

নিরুদন বা শুষ্কীকরণ যখন কোন যন্ত্রের মাধ্যমে করা হয় এবং যখন উত্তাপ সূর্যালোক ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যম থেকে পাওয়া যায় এবং সেই তাপ জল শুষ্কীকরণের কাজে ব্যবহৃত হয়, সেই পদ্ধতিকেই যান্ত্রিক শুষ্কীকরণ পদ্ধতি বলে। শুষ্কীকরণ পদ্ধতিতে তাপ এবং ভর উভয়েরই সঞ্চালন হয়। তাপ খাদ্যদ্রব্যের মধ্যস্থিত জলে সঞ্চালিত হয় এবং তাপই সেই জলে বাষ্পীভবনের জন্য প্রয়োজনীয় লীন তাপ সরবরাহ করে।

শুষ্কীকরণ যন্ত্র মূল্য দুই প্রকার—

(১) রুদ্ধতাপ জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্র, যেখানে উত্তপ্ত গ্যাস যন্ত্রের অভ্যন্তরে উত্তাপ বহন করে নিয়ে যায়। সেই উত্তপ্ত গ্যাস খাদ্যে অভ্যন্তরস্থ জলে তাপ সঞ্চালন করে জলের বাষ্পীভবন ঘটায় এবং সেই বাষ্পীভূত জলকে সেই উত্তপ্ত গ্যাস বহন করে নিয়ে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই উত্তপ্ত গ্যাস বাতাসকে গরম করার মাধ্যমে তৈরী করা হয়।

(২) যেখানে তাপ সঞ্চালন কোন কঠিন তলের মাধ্যমে হয় এবং তাপ একটি ধাতব পাতের মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্যের মধ্যস্থিত জলে সঞ্চালিত হয় এবং খাদ্যদ্রব্যটি ধাতব পাতের উপরে রক্ষিত থাকে। সাধারণত খাদ্যদ্রব্যটি বায়ুশূণ্য পাত্রে রক্ষিত থাকে এবং উদ্ভূত জলীয় বাষ্পকে একটি বায়ু নিষ্কাশন পাম্পের মাধ্যমে বের করে নেওয়া হয়। যদি খাদ্যদ্রব্যটি বায়ুশূন্য পাত্রে না থাকে, সেক্ষেত্রে পাত্র মধ্যস্থিত বায়ু সঞ্চালনের মাধ্যমে উদ্ভূত জলীয় বাষ্পকে দূর করা হয়।

আধুনিক যুগে তাপ সরবরাহকারী মাধ্যম হিসেবে ইনফ্রারেড বিকিরণ অথবা মাইক্রোওয়েব বিকীরণের মাধ্যমেও করা হয়।

প্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র বিভিন্ন রকমের হয়। যথা—(১) Tray শুষ্কীকরণ যন্ত্র, (২) টানেল শুষ্কীকরণ যন্ত্র, (৩) Fluidised bed শুষ্কীকরণ যন্ত্র, (৪) স্প্রে জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্র।

ট্রে শুষ্কীকরণ যন্ত্রে খাদ্যদ্রব্যকে ঘন সন্নিবেষ্ঠিত তারজালির উপর রাখা হয় এবং দ্রুত প্রবাহমান উষ্ণ শুষ্ক বাতাসের মাধ্যমে শুকান হয়।

টানেল শুষ্কীকরণ যন্ত্রে একটি লম্বা টানেলের মধ্যে অনেকগুলি ট্রে বা র‍্যাককে চালানো হয়। তার উল্টো দিক থেকে উচ্চগতিসম্পন্ন উষ্ণ শুষ্ক বাতাসকে চালানো হয়।

Fluidised bed শুষ্কীকরণ যনত্র প্রকৃতপক্ষে একটি Pneumatic কনভেয়ার শুষ্কীকরণ যন্ত্র। এই যন্ত্রে উত্তপ্ত বাতাসকে খাদ্যদ্রব্যের মধ্য দিয়ে নীচ থেকে উপরের দিকে অত্যন্ত উচ্চ গতিবেগে চালনা করা হয়। এই বাতাসের গতিবেগকে এমন রাখা হয়, যাতে খাদ্যদ্রব্যাদি সেই উচ্চগতিসম্পন্ন বাতাসে প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে।

স্প্রে শুষ্কীকরণ যন্ত্রে ঘন তরল খাদ্যদ্রব্যকে স্প্রে আকারে বিপরীত দিক থেকে আসা উচ্চগতিসম্পন্ন উষ্ণ শুস্ক বাতাসে সংস্পর্শে আনা হয় এবং অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তরলীকৃত খাদ্যদ্রব্য শুষ্কীকরণের পর পাউডারের আকারে জমা হয়।

অপ্রত্যক্ষ তাপ সঞ্চালনের মাধ্যমে শুষ্কীকরণ যন্ত্র বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যথা—(১) ড্রাম-জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্র, (২) বায়ুশূন্য শুষ্কীকরণ যন্ত্র এবং (৩) Freeze শুষ্কীকরণ যন্ত্র।

ড্রাম-জাতীয় শুষ্কীকরণ যন্ত্রে খাদ্যদ্রব্যকে পেষ্টের আকারে উত্তপ্ত ড্রামের গায়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। ড্রামের অভ্যন্তরে উচ্চ চাপ যুক্ত সম্পৃক্ত উচ্চ অংশে ষ্টীম চালানোর মাধ্যমে গরম করা হয়।

বায়ুশূন্য শুষ্কীকরণ যন্ত্রে বায়ুশূন্য স্থানে অত্যন্ত কম তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রব্যকে শুকানো হয়।

Freeze শুষ্কীকরণ যন্ত্রে হিমায়িত খাদ্যদ্রব্যকে বায়ুশূন্য অবস্থায় শুকানো হয়।

৫.২.২ টিনের পাত্রে খাদ্য সংরক্ষণ (ক্যানিং)

তাপের প্রয়োগে খাদ্য সংরক্ষণ ঃ প্রকৃতপক্ষে তাপ প্রয়োগে জীবাণু ধ্বংসের মূল কারণ হলো প্রোটিনের তঞ্চন এবং উৎসেচকের নিষ্ক্রীয়করণ। তাপ প্রয়োগে জীবাণু এবং তার স্পোরের ধ্বংসের মাত্রা, জীবাণুর প্রকৃতি, তার অবস্থা এবং পরিবেশের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতপক্ষে তাপ প্রয়োগ জীবাণু ধ্বংসের সময়ে তাপের পরিমাণ যে জীবাণু ধ্বংস করা হচ্ছে তার প্রকৃতি অথবা অন্য কোন সংরক্ষণ পদ্ধতি সেই খাদ্যে অবলম্বিত হয়েছে কিনা তার উপর এবং সেই খাদ্যের উপর তাপের প্রভাবের উপর নির্ভরশীল। অণুবীক্ষণিক প্রাণীর মধ্যে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে সবচেয়ে তাপ সহনশীল। কিন্তু ঈষ্ট ও মোল্ড গোত্রীয় প্রাণীগুলির তাপ সহনশীলতা অনেক কম। সুতরাং তাপ প্রয়োগে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ব্যাকটেরিয়া স্পোরে তাপ সহ্য করার ক্ষমতা সাধারণ ব্যাকটেরিয়া কোষের তুলনায় অনেক বেশী। সুতরাং তাপ প্রয়োগে কোন জীবাণুকে ধ্বংসের সময়ে সেই জীবাণুর স্পোরকে ধ্বংস করতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণ তাপকেই 'সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় তাপ' বলা হয়। সাধাণরত ১২১°C

তাপমাত্রায় একটি জীবাণুকে ধ্বংস করতে যত মিনিট সময় লাগে, তাকেই সেই জীবাণু ধ্বংসের Processing time বলা হয়।

জীবাণু ধ্বংসের প্রকৃতি লগারিদম জাতীয় হয় এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ৯০ শতাংশ জীবাণুকে ধ্বংস করতে যে সময় লাগে, তাকে সেই জীবাণুর 'Decimal reduction' time বলে।

জীবাণু ধ্বংসে সময় ও উষ্ণতার সম্পর্ক

ব্যকটেরীয় কোষ অথবা স্পোর ধ্বংসের সময়ে তাপমাত্রা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে তাপ প্রয়োগে জীবাণু ধ্বংসের সময়ে তাপমাত্রা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংসের সময়ে কমে যায়, তা নিম্নলিখিত টেবিলের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে—

তাপ প্রয়োগে যে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করা হয়েছে তার নাম Flat Spour-Bacteria.

তাপমাত্রা °C	**সমস্ত স্পোরকে ধ্বংস করার সময়** (সেকেন্ড)
১০০	১২০০
১০৫	৬০০
১১০	১৯০
১১৫	৭০

একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় খাদ্যদ্রব্য মধ্যস্থিত ব্যাকটেরিয়ার ধ্বংসের সময় আরো কয়েকটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। যথা—(১) জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, (২) হাইড্রোজেন আয়নের ঘনত্ব (pH).

(১) যেহেতু আর্দ্রতাপ শুষ্ক তাপ অপেক্ষা জীবাণু ধ্বংসের কাজে অনেক বেশী কার্যকর, সেহেতু আর্দ্র স্টীমের উপস্থিতিতে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতার জীবাণু ধ্বংস করা সম্ভব। উদারহণস্বরূপ বলা যায় যে Bacillus Subtilis-এর জীবাণু স্পোরকে স্টীমের উপস্থিতিতে মাত্র ১২০°C তাপমাত্রায় ১০ মিনিটে মারা সম্ভব। কিন্তু নিরুদিত গ্লিসারলের উপস্থিতিতে ঐ একই জীবাণু মারতে ১৭০°C তাপমাত্রায় ৩০ মিনিট প্রয়োজন হয়।

(২) খাদ্যদ্রব্যের pH বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তাপ প্রয়োগের সময় বেড়ে যা হয়, তা নিম্নলিখিত টেবিলের মাধ্যমে বোঝান হয়েছে—

pH-এর প্রভাব Bacillus Subtilus জীবাণুর স্পোরের উপর—

pH	**জীবাণু ধ্বংসের সময়** (সেকেন্ড)
৪·৪	২
৫·৬	৭
৬·৮	১১
৭·৬	১১

বাণিজ্যিক পদ্ধতিতে টিনের পাত্রে খাদ্য সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অবলম্বিত হয়—

খাদ্যদ্রব্য বাছাই এবং আলাদা করা

↓

বাছাই করা খাদ্যদ্রব্য ভালো করে ধোয়া

↓

বাছাই করা খাদ্যদ্রব্যের খোসা ছাড়ান। যথা হাত দিয়ে ও তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা চুন জলের মাধ্যমে

↓

ব্ল্যানচিং-এর মাধ্যমে খাদ্য মধ্যস্থিত উৎসেচকের নিষ্ক্রীয়করণ

↓

এরপর খাদ্যদ্রব্যকে টিনের পাত্রে ভর্তি করা।

↓

টিনের পাত্র এবং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যস্থিত জায়গা লবণ জল তথা চিনির জলীয় দ্রবণ দ্বারা পূর্ণ করা হয়।

↓

এবার পাত্রের মুখ আলতোভাবে ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা হয়।

↓

এবার পাত্র মধ্যস্থিত বায়ুকে তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বের করে দেওয়া হয়।

↓

এবার পাত্রের মুখের ঢাকনাকে শক্ত করে আটকে দেওয়া হয় বা সীল করে দেওয়া হয়। যাকে সীমিং অপারেশন বলে।

↓

তাপ প্রয়োগের মাধ্যমে পাত্র মধ্যস্থিত খাদ্যদ্রব্যকে সংরক্ষিত করা হয়।

৫.২.৩ হিমায়ন পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ

একটি উন্নয়নশীল দেশে আর্থসামাজিক ব্যবস্থার উন্নতিবিধানে খাদ্য সংরক্ষণ একান্ত জরুরী। ভারতবর্ষের মতো দেশে যেখানে জনসংখ্যা ক্রমশঃ ঊর্ধ্বমুখী সেখানে জনসাধারণকে অধিক খাদ্য যোগান দেবার জন্য খাদ্যের অপচয় রোধ করে খাদ্য সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সহজ এবং সুলভে হিমায়ন পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ একান্ত জরুরী।

প্রকৃতপক্ষে জীবাণুই খাদ্য নষ্ট করে (মূলত ব্যাকটেরিয়া)। জীবাণুরও বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য এবং অক্সিজেন প্রয়োজন। ব্যাকটেরিয়া বেঁচে থাকার জন্য সাধারণ তাপমাত্রা এবং সাধারণ অক্সিজেন চাপ দরকার। খুব সহজ এবং কার্যকরী পদ্ধতিতে খাদ্য সংরক্ষণ করার জন্য খাদ্য মধ্যস্থিত জীবাণুর বংশবিস্তার এবং কার্যক্ষমতাকে কমানো প্রয়োজন। যা খাদ্যের তাপমাত্রা কমানোর মাধ্যমে করা যেতে পারে। ০-৪°C তাপমাত্রায় খাদ্যকে রাখলে বেশ কয়েকদিন ঠিক রাখা যায়। এই পদ্ধতিকে ঠাণ্ডাকরণ বা ট্রড়্গপ্তপ্তন্দ্ধ বলা হয়। খাদ্যকে দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষিত রাখতে গেলে খাদ্যের তাপমাত্রা -১৮°C-এর নীচে রাখার প্রয়োজন হয়। এমন অবস্থায় ব্যাকটেরিয়ার জীবনবৃত্তীয় কার্যকলাপ এবং বংশবিস্তার প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনাকে ড্ডদ্বন্দ্বন্দ্ম বা চরম হিমায়ন বলে।

হিমায়িত খাদ্যদ্রব্যকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য সেই খাদ্যদ্রব্যকে সেই তাপমাত্রায় রেখে একটি বিশেষ ধরনের যানবাহনের মাধ্যমে পাঠান হয়। সেই ধরনের যানবাহনকে 'Refrigerated Transport Vessel' অথবা Van বলে।

হিমায়ন জীবাণুর জীবনবৃত্তরীয় কার্যকলাপকে প্রায় বন্ধ করে দেয়। কিন্তু উৎসেচকের কার্যকলাপকে কিছুটা মন্দীভূত করে। প্রকৃতপক্ষে উৎসেচকের কার্যকলাপকে সম্পূর্ণ বন্ধ করার জন্য হিমায়নের পূর্বে খাদ্যদ্রব্যকে একটি সংক্ষিপ্ত আর্দ্র তাপপ্রয়োগ (Blanching) করা দরকার।

প্রকৃতপক্ষে খাদ্যের মধ্যে প্রচুর জল থাকার জন্য খাদ্যকে ঠাণ্ডা করলে সেই জল ০ থেকে -৩ণ্ট্র তাপমাত্রায় কঠিনভূত হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত খাদ্য অভ্যন্তরস্থ সমস্ত জল কঠিনভুত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের তাপমাত্রা মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে, দ্রুত হিমায়ন পদ্ধতিতে (Quick freezing process) জলের কঠিনীভবন অত্যন্ত দ্রুত হয় এবং খাদ্যের তাপমাত্রা ৩৯ মিনিট বা তার কম সময়ে ০ থেকে -৩°C-এর মধ্যে চলে আসে। এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন স্ফটিককৃত বরফের আকৃতি অনেক ছোট হয়। Air blast Freezer বা উচ্চ গতিবেগসম্পন্ন হিমায়িত বাতাসের সংস্পর্শে হিমায়ন অথবা তরলীকৃত নাইট্রোজেন, বাতাস অথবা কার্বন ডাইঅক্সাইড-এর সাহায্যে এই ধরনের দ্রুত হিমায়ন (Quick freezing) করা সম্ভব।

প্রকৃতিগতভাবে হিমায়নকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা (১) Block freezing বা ব্লকের আকারে হিমায়নকরণ, (২) IQF (Individually quick frozen) process বা আলাদাভাবে প্রতিটি খাদ্যদ্রব্যের দ্রুত হিমায়ন পদ্ধতি।

দ্রুত হিমায়ন বা Quick freezing করার জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রের নাম—

(১) Plat freezer—এই পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যের) —করা যায়। ইহা একটি অপ্রত্যক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য হিমায়নকারী পদার্থের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে না।

(২) (a) Air blast tunnel freezeer, (b) Air blast spiral freezer—ইহা একটি প্রত্যক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যকে স্বতন্ত্র সত্তা বজায় (IQF) রেখে হিমায়িত করা সম্ভব। এই পদ্ধতিতে উচ্চ গতিসম্পন্ন অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় বাতাসের সংস্পর্শে খাদ্যদ্রব্যকে হিমায়িত করা হয়।

(৩) তরলকৃত নাইট্রোজেন অথবা কার্বন ডাইঅক্সাইডের টানেল জাতীয় হিমায়ন যন্ত্র—এই পদ্ধতিতে অত্যন্ত নিম্ন তাপমাত্রায় তরলীকৃত নাইট্রোজেন অথবা কার্বন ডাইঅক্সাইডের প্রত্যক্ষ সংযোগে খাদ্যদ্রব্যকে আনা হয়। এই পদ্ধতিতেও হিমায়িত হবার পর স্বতন্ত্র সত্তা বজায় (IQF) রাখা সম্ভব।

৫.২.৪ রাসায়নিক প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করে সংরক্ষণ

বেশ কিছু প্রিজারভেটিভ আছে যেগুলো ব্যবহার করলে পচনশীল খাদ্য কিছু দিন পর্যন্ত খাওয়ার যোগ্য থাকতেও পারে; এমনকি এ্যান্টিবায়োটিকও ব্যবহার করার রিপোর্ট আছে। তবে এদের বিষক্রিয়াজনিত সমস্যা আছেই কমবেশী; তাছাড়া খাবারে প্রয়োগ করার প্রযুক্তিগত এবং মূল্যগত অসুবিধাও আছে। নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ব্যবহারে সংরক্ষণের সাহায্য হয়, যেমন—জীবাণু ও পোকামাকড় হয় না এবং খাবারের পুষ্টিদ্রব্য অক্সিডাইজড্ হয় না।

তবে তৈরি খাবারে কোন কোন প্রিজারভেটিভ ব্যবহার করতেই হয়। আইনতঃ গ্রাহ্য কিছু রাসায়নিক, যেমন—বেনজোয়িক, সালফিউরাস (সালফার ডাইঅক্সাইড), ল্যাকটিক, সরবিক ও প্রপিওনিক এ্যাসিড এবং এদের সোডিয়াম পটাশিয়াম ও ক্যালসিয়াম লবণ, এছাড়া আরও কিছু রাসায়নিক এবং কোন কোন প্রাকৃতিক খাদ্যদ্রব্য।

৫.৩ ফল প্রক্রিয়াকরণশিল্পে কারিগরী বিদ্যা

দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্নভাবে ফল প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। নিম্নে কিছু প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি ও উৎপাদিত দ্রব্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হল ঃ

৫.৩.১ জেলি

জেলি একপ্রকার অর্ধকঠিন চটচটে অর্ধস্বচ্ছ খাদ্যবস্তু যা ফলের রস ও চিনি একত্রে জ্বাল দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। এর সঙ্গে অ্যাসিড (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড বা সাইট্রিক অ্যাসিড), খাদ্যে অনুমোদিত রঙ ও গন্ধ এবং খাদ্য সংরক্ষক হিসাবে রাসায়নিক যেমন সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট বা পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট যোগ করা হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী ঃ

(১) জেলি প্রস্তুতির জন্য পাকা ও কাঁচা উভয় প্রকার পেয়ারাই একত্রে নেওয়া হয়। পাকা

পেয়ারা প্রস্তুত জেলিতে সুগন্ধ আনে এবং কাঁচা পেয়ারা জেলির দৃঢ়তা আনে। কাঁচা পেয়ারায় পেক্‌টিন বেশী থাকে যা জেলির বিশেষ প্রকারের গঠনের জন্য দায়ী। জেলি প্রস্তুতির সময় যে কাঁচা পেয়ারা নিতে হবে তা হবে সবুজ অথচ সম্পূর্ণ পরিণত পেয়ারা।

(২) সমস্ত পেয়ারা ভাল করে ধুয়ে নিয়ে ওজন করে নিতে হবে।

(৩) ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবে (স্টেনলেস ষ্টীলের ছুরির সাহায্যে)।

(৪) ফলের টুকরোগুলি ষ্টীম জ্যাকেটেড প্যান (Steam jacketted pan) এ দিয়ে, জল দিয়ে, অল্প সাইট্রিক অ্যাসিড দিতে হবে। আধঘন্ট সিদ্ধ করার পর পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে সিদ্ধ ফলের নির্যাস নিষ্কাশন করা হল।

(৫) নিষ্কাশিত নির্যাস-এ পেক্‌টিনের পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য অ্যালকোহল পরীক্ষা করা হল। ১ মিলি নির্যাস-এ ২ মিলি অ্যালকোহল দেওয়া হল। পেক্‌টিনের পরিমাণ বেশী থাকলে বড় টুকরোর আকারে পেক্‌টিন থিতিয়ে পড়বে। মাঝারি পরিমাণ পেক্‌টিন থাকলে ছোট ছোট টুকরোর আকারে পেক্‌টিন থিতিয়ে পড়বে। খুব কম পেক্‌টিন থাকলে অতি ছোট ছোট পেক্‌টিনের টুকরো দেখা যাবে।

(৬) এই নির্যাস-এর আয়তন পরিমাপ করা হল। ১/২-৩/৪ অংশ ওজনের চিনি যোগ করা হল। পেক্‌টিনের পরিমাণের উপর প্রদেয় চিনির পরিমাণ নির্ভর করবে। বেশী পেক্‌টিন থাকলে বেশী চিনি দিতে হবে, কম থাকলে কম দিতে হবে।

(৭) সাইট্রিক অ্যাসিড যোক করতে হবে এমন পরিমাণে যাতে মোট আম্লিকতা ১%-এর বেশী না হয়।

(৮) মিশ্রণকে দ্রুত ২২২ °F-এ ফোটাতে হবে।

(৯) খাদ্য সংরক্ষক হিসাবে সোডিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট (সর্বাধিক ৪০ পি পি এম সালফার ডাইঅক্সাইড) বা সোডিয়াম বেনজোয়েট (সর্বাধিক ২০০ পি পি এম বেনজোয়িক অ্যাসিড) দেওয়া হল।

(১০) পরিষ্কার, শুষ্ক বোতল বা শিশিতে গরম গরম ঢালা হল। শিশির মুখ বন্ধ করে সিল (seal) করে দেওয়া হল।

পেয়ারায় প্রচুর পরিমাণে পেক্‌টিন থাকে। কিন্তু যে সকল ফলে পেক্‌টিন কম থাকে যেমন, আপেল, আঙুর, কাঁঠাল, জাম ইত্যাদি থেকেও জেলি প্রস্তুত করা যায়, তবে সেক্ষেত্রে বাইরে থেকে পেকটিন পাউডার যোগ করতে হয়।

জেলি প্রস্তুতিতে বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি ও তার ফলাফল

(১) পেক্‌টিনের অপ্রতুলতা—জেলি ঠিকমতো জমবে না।

(২) অ্যাসিডের অপ্রতুলতা—জেলি ঠিকমতো জমবে না।

(৩) চিনি বেশী হলে—জেলি না জমে সিরাপের মতো হয়ে যাবে।

(৪) সমাপ্তিবিন্দুর পরও অধিকক্ষণ রন্ধন—দু'রকম ঘটনা ঘটতে পারে। (ক) যদি অ্যাসিড কম থাকে—জেলি শক্ত হয়ে যাবে; (খ) যদি অ্যাসিড বেশী থাকে; পেক্‌টিন ভেঙে যাবে ফলে সিরাপের মতো হয়ে যাবে।

(৫) সমাপ্তিক্ষণের আগে রন্ধন শেষ করলে—জেলি বসবে না এবং সিরাপের মতো হয়ে যাবে বা খুব নরম হবে।

(৬) দীর্ঘক্ষণ ধরে কম আঁচে রন্ধন—অ্যাডিস ও দীর্ঘক্ষণ তাপের প্রভাবে পেক্‌টিন নষ্ট হয়ে যাবে এবং জেলি জমবে না।

(৭) সবুজ অপরিণত ফল ব্যবহার করলে—ফলের মধ্যে থাকা জলে অদ্রাব্য শ্বেতসার (ষ্টার্চ) জেলিকে অস্বচ্ছ করে তুলবে।

(৮) খুব বেশী উচ্চতা থেকে জেলি, জেলি রাখার শিশিতে ঢালা হলে—তার মধ্যে বাতাসের বুদ্বুদ এসে যাবে।

(৯) শিশিতে ঢালার আগে ফেনা না অপসারণ করলে—জেলি অস্বচ্ছ হয়ে যাবে।

(১০) অ্যাসিড বেশী হলে—জেলি থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জল বেরিয়ে যাবে, যাকে 'জেলির কান্না' বলা হয়।

(১১) চিনি কম হলে—জেলি থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জল বেরিয়ে যাবে, যাকে 'জেলির কান্না' বলা হয়।

৫.৩.২ জ্যাম

জ্যাম হচ্ছে জেলির তুলনায় ঘন খাদ্যবস্তু যা মণ্ডীকৃত ফলের শাঁস ও চিনি জ্বাল দিয়ে প্রস্তুত হয়। এপ্রিকট, আপেল, ন্যাসপাতি, কাঁঠাল, আনারস, আম, ফুটি, ষ্ট্রবেরী, চেরী ইত্যাদি ফল থেকে জ্যাম প্রস্তুত করা যায়। একাধিক ফল একসঙ্গে মিশিয়ে মিশ্র জ্যাম প্রস্তুত করা হয়। বিভিন্ন অনুপাতে আম, কলা, কমলালেবু, আনারস ইত্যাদি মিশিয়ে মিশ্র জ্যাম প্রস্তুত করা যায়। জেলির মতো জ্যামেও খাদ্যে অনুমোদিত রঙ ব্যবহার করা হয়। বাইরে থেকে সাধারণত গন্ধ যোগ করা হয় না।

জ্যাম প্রস্তুতিতেও জেলির মতো স্টেনলেস ষ্টীলের বাসনপত্রাদি ব্যবহার করা হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী ঃ

(১) ১ পাউন্ড ফল নেওয়া হল (ধরা যাক এপ্রিকট)।

(২) ভাল করে ধুয়ে নিয়ে অল্প জল দিয়ে ২ মিনিট সিদ্ধ করা হল।

(৩) সিদ্ধ ফল থেকে বীজ ও খোসা বাদ দেওয়া হল এবং উৎপন্ন মন্ডের ওজন নেওয়া হল।

(৪) এই মন্ড ষ্টীম জ্যাকেটেড প্যান (Steam jacketted pan)-এ নিয়ে ৬০% চিনির দ্রবণ এমন পরিমাণ ঢালা হল যাতে ফলের শাঁসের মন্ডের ওজনের ১/২-৩/৪ অংশ চিনি রইল। ফলের আম্লিকতার উপর চিনির পরিমাণ নির্ভর করবে। আম্লিকতা বেশী হলে চিনি বেশী লাগবে, কম হলে কম লাগবে। ফলে পেক্‌টিনের পরিমাণ কম থাকলে ০·৮% পেক্‌টিন যোগ করতে হবে।

(৫) মিশ্রণকে দ্রুত ফোটাতে হবে। খাদ্য অনুমোদিত রঙ দেওয়া যাবে।

(৬) খাদ্য সংরক্ষক হিসাবে সোডিয়াম বেনজোয়েট (২০০ পিপিএম) বা সোডিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট (৪০ পিপিএম) দেওয়া হল।

(৭) পরিষ্কার, শুষ্ক শিশি, গরম গরম জ্যাম ঢালতে হবে। শিশির মুখ বন্ধ করে সিল (seal) করে দিতে হবে।

৫.৩.৩ মার্মালেড

মার্মালেড একপ্রকার জেলিজাতীয় পদার্থ যাতে ফলের খোসা ছোট ছোট টুকরো অবস্থায় প্রলম্বিত থাকে। সাধারণত লেবুজাতীয় ফল থেকে মার্মালেড প্রস্তুত করা হয়। মার্মালেড প্রস্তুতির জন্য জেলি প্রস্তুতির সমস্ত শর্তই প্রযোজ্য। জেলির তুলনায় এতে অ্যাসিড ও পেক্‌টিনের পরিমাণ বেশী থাকে। মিষ্ট ধরনের কমলালেবু থেকে 'মিষ্ট মার্মালেড' ও মিষ্ট এবং তিক্ত উভয় ধরনের কমলালেবু থেকে 'তিক্ত মার্মালেড' প্রস্তুত করা হয়। 'তিক্ত মার্মালেড'ই বেশী জনপ্রিয়।

মার্মালেডকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। জেলি মার্মালেড ও জ্যাম মার্মালেড।

মার্মালেড প্রস্তুত-প্রণালী ঃ

(১) ফল নির্বাচন—সুপক্ক ফল বেছে নেওয়া হল।

(২) ফল প্রস্তুতকরণ—লেবুজাতীয় ফলের খোসার বাহিরের দিকে রঞ্জক পদার্থ ও উদ্বায়ী তৈল থাকে এবং ভিতরে দিকের সাদা অংশে পেক্‌টিন থাকে। খোসার বাহিরের দিকের হলুদ

অংশ পাতলা ভাবে ছাড়িয়ে নেওয়া হল এবং ছোট ছোট টুকরো করে নেওয়া হল। এই ছোট ছোট টুকরো সিদ্ধ করে জলে ফেলে দেওয়া হল (তিক্তভাব দূর করার জন্য)। এই সিদ্ধ টুকরোগুলি রেখে দেওয়া হল। বহিঃস্ত্বক ছাড়ানো ফলগুলি টুকরো করে কাটা হল।

(৩) পেক্‌টিন নিষ্কাশনের জন্য সিদ্ধ করা—টুকরো করা ফলগুলি ২-৩ গুণ (ওজন হিসাবে) জলের সঙ্গে মিশিয়ে সিদ্ধ করা হল। সিদ্ধ করা নির্যাস-এ পেক্‌টিনের পরিমাণ দেখার জন্য অ্যালকোহল পরীক্ষা করা হল। নির্যাস-এ যথেষ্ট পরিমাণ পেক্‌টিন পেলে আর সিদ্ধ করার প্রয়োজন নাই। সাধারণত ৪৫-৬০ মিনিট ধরে সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয়।

জেলি মার্মালেড-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধ ফলকে চাপ দিয়ে ফলের রস নিষ্কাশন করা হয়। জ্যাম মার্মালেড-এর জন্য সিদ্ধ ফলকে মন্ডে পরিণত করে ব্যবহার করা হয়। (জ্যাম মার্মালেড-এর জন্য পেক্‌টিন পরীক্ষা করার প্রয়োজন নাই। এক্ষেত্রে ফল ও চিনির অনুপাত ১:১ হিসাবে নিতে হবে।)

(৪) সিদ্ধ ফলের খোসা যোগ করা—পূর্বে বর্ণিত ফলের খোসার সিদ্ধ টুকরোগুলি, চিনি ও সিদ্ধ ফলের নির্য্যাস বা সিদ্ধ ফলের মন্ডে যোগ করতে হবে।

(৫) রন্ধন—চামচ পরীক্ষা, শীট (Sheet) পরীক্ষা ইতাদি দ্বারা সমাপ্তিক্ষণ নির্ণয় করা হয়। সমাপ্তিক্ষণ অবধি রন্ধন করা হয়।

(৬) শীতলীকরণ—প্রস্তুত করার পর ঠাণ্ডা করার সময় চামচ দিয়ে অবিরামভাবে মার্মালেড নাড়তে হবে যাতে ফলের খোসাগুলি ভেসে না ওঠে।

(৭) গন্ধদ্রব্য যোগ—অল্প পরিমাণ কমলালেবুর তেল যোগ করা হয়।

(৮) প্যাকেজিং—কাঁচের জার বা টিনের ক্যান (Can)-এ মার্মালেড রাখা হয়।

মার্মালেড কালো হয়ে যাওয়া—দীর্ঘদিন গুদামজাত অবস্থায় রাখলে মার্মালেড কালো হয়ে যায়। এর জন্য প্রতি ১০০ কেজি মার্মালেড-এ প্রায় ৯ গ্রাম পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট যোগ করা হয়। পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট ব্যবহার করলে টিনের ক্যান ছন্ত্রুগ্ন ব্যবহার করা যাবে না।

৫.৩.৪ স্কোয়াস

কমলালেবু, কাগজিলেবু, আপেল, আঙুর, জাম, আনারাস ইত্যাদি থেকে স্কোয়াশ প্রস্তুত করা হয়। স্কোয়াশে মোট কঠিন পদার্থের পরিমাণ কমপক্ষে ৪০% হবে এবং অন্ততঃ ২৫% ফলের রস থাকবে।

কমলালেবুর স্কোয়াশ

(১) কমলালেবুর রস প্রস্তুত করা হল। বীজ বা অন্য কঠিন অংশ পরিস্রাবণ করে বাদ দেওয়া হল। লেবুর রসের আয়তন মেপে রাখা হল।

(২) ৭০% চিনির দ্রবণ প্রস্তুত করা হল।

(৩) লেবুর রস ও চিনির দ্রবণ এমন অনুপাতে মেশানো হল যাতে উৎপন্ন মিশ্রণে প্রায় ৬০% চিনি থাকে।

(৪) প্রয়োজনমত সাইট্রিক অ্যাসিড যোগ করা হল, যাতে উৎপন্ন পদার্থে সর্বাধিক ৩·৫% অ্যাসিডিটি (আম্লিকতা) থাকে।

(৫) খাদ্য সংরক্ষক রাসায়নিক পটাশিয়াম মেটা-বাই-সালফাইট মেশানো হল (সর্বাধিক ৩৫০ পিপিএম) বা সোডিয়াম বেঞ্জোয়েট (সর্বাধিক ১০০০ পিপিএম) মেশানো হল।

(৬) খাদ্যে অনুমোদিত রঙ এবং গন্ধ মেশানো হল।

(৭) প্রস্তুত স্কোয়াশ, পরিস্কার, উত্তপ্ত বোতলে ভর্ত্তি করা হল। ছিপি থেকে ১½ ইঞ্চি স্থান শূন্য রেখে ভর্ত্তি করে সিল (Seal) করে দেওয়া হল।

৫.৩.৫ আচার ও সস্

নুন কিংবা ভিনিগারের সাহায্যে সংরক্ষিত ফলকে আচার বলা হয়। এতে তেল ও মশলা যোগ করা যায়। আম, শশা, লেবু ইত্যাদি থেকে আচার প্রস্তুত করা যায়।

শুষ্ক পদ্ধতি

প্রস্তুত-প্রণালী ঃ

(১) ফলগুলি ভাল করে ধুয়ে কেটে জল ঝরিয়ে ওজন করা হল।

(২) ১০০ কেজি ফলের জন্য ৩ কেজি নুন ব্যবহার করা হয়।

(৩) একস্তর কাটা ফলের উপর কিছু নুন ছড়িয়ে আবার একস্তর ফল এইভাবে স্তরে স্তরে রেখে, শুষ্ক, গরম স্থানে (২৭-৩০° সেন্টিগ্রেড), ৮-১০ দিন রাখা হল।

নুনজলে সন্ধান প্রক্রিয়া পদ্ধতি

প্রণালী—১৫% নুনজলে ব্যাকটিরিয়ার বংশবৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল নয়। নুনজল প্রস্তুত করে তাতে কাটা ফলগুলি ডুবিয়ে দেওয়া হল। ফলের মধ্যে থাকা জল বেরিয়ে এসে নুন জলের ঘনত্ব কমিয়ে

দেয় সেইজন্য বাইরে থেকে প্রয়োজনমতো নুন মাঝে মাঝে যোগ করা হয়। সন্ধান প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে তা নুনজল থেকে তুলে ভিনিগারে রাখলে তা বহুদিন অবিকৃত থাকে, এতে মশলা যোগ করা হয়।

৫.৪ খাদ্যশস্যে কারিগরী বিদ্যা

৫.৪.১ চাল

ধান ভাঙানোর আগে কোনোরকম প্রক্রিয়াকরণ না করলে সেই ধান থেকে উৎপন্ন চালকে বলা হয় 'সাদা চাল'। ভাঙানোর আগে বিশেষ একপ্রকার প্রক্রিয়াকরণ পারবয়েলিং (Parboiling) করা হলে সেই ধান থেকে প্রাপ্ত চালকে বলা হয় পারবয়েল্ড (Parboiled) চাল।

বাষ্প ও তাপের যৌথ প্রভাবে ধানের মধ্যেকার শ্বেতসারজাতীয় পদার্থের গঠনের পরিবর্তনকে পারবয়েলিং বলা হয়। তিনটি ধাপে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

(ক) ধান ভেজানো—ধানের খোসা এবং শস্যের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান জলে ভরে ওঠে ও শ্বেতসার দানাগুলি জল শোষণ করে ফুলে ওঠে।

(খ) বাষ্পদ্বারা প্রক্রিয়াকরণ—ভেজা ধান বাষ্পের সংস্পর্শে কিছুক্ষণ থাকার ফলে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের জিলেটিনিভবর (Gelatinization) হয়।

(গ) শুষ্কীকরণ—এই ধানকে ড্রায়ারে (Dryer)-এর সাহায্যে শুকানো হয় যতক্ষণ না এর জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রায় ১৬%-এ না পৌঁছায়।

পারবয়েলিং-এর সুবিধা

(১) পারবয়েলিং-এর ফলে ধানের ভিতরকার শস্য অতিরিক্ত দৃঢ়তা লাভ করে, যার ফলে ধান ভাঙানোর সময় ভাঙা চালের সংখ্যা কমে যায়।

(২) ধানের খোসার ঠিক নীচে ভিটামিন ও প্রোটিন বেশী থাকে এবং শস্যের কেন্দ্রের দিকে কম থাকে। জলে ভেজানোর ফলে বহিঃস্তরের ভিটামিন ও প্রোটিন ভিতরের দিকেও শোষিত হয়ে যায়, ফলে চাল পালিশ করার সময় সমস্ত ভিটামিন ও প্রোটিন অপসারিত হয়ে যায় না।

(৩) ভাত সিদ্ধ হবার পর, ফেন অপেক্ষাকৃত কম ঘনত্বযুক্ত হয়, ফলে ক্ষতি কম হয়।

(৪) ভাত সিদ্ধ করার সময় দীর্ঘক্ষণ তাপ সহ্য করতে পারে।

(৫) পারবয়েল্ড চাল শক্ত ফলে দীর্ঘদিন গুদামজাত রেখেও পোকার আক্রমণ সহজে হয় না।

পারবয়েলিং-এর অসুবিধা

(১) দীর্ঘক্ষণ ধরে জলে ভিজে থাকার জন্য পারবয়েল্ড ধান বা চালে ছত্রাক জন্মাতে পারে এবং তা থেকে ক্ষতিকারক বিষাক্ত পদার্থের ক্ষরণ ঘটতে পারে।

(২) পারবয়েলিং পদ্ধতি শেষ ধাপ শুষ্কীকরণ যার জন্য খরচ অনেক বেড়ে যায়।

(৩) পারবয়েল্ড চাল রান্না করতে অনেক বেশী সময় লাগে।

ধান ভাঙানো—ধান ভাঙানোর জন্য আগে হস্তচালিত ঢেঁকি বা চাকী ব্যবহার হত, এখন হালার (Hullur) বা শেলার (Sheller) মেশিন ব্যবহার করা হয়। হালার মেশিনে ভাঙা ছালের সংখ্যা বেশী হয় এবং তুষ ও ব্রান (Bran) আলাদা করা যায় না ফলে ব্র্যান থেকে তেল নিষ্কাশন সম্ভব হয় না। শেলার মেশিন অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং এতে উপরোক্ত ত্রুটিগুলি নেই। বর্তমানে সর্বসুবিধাযুক্ত 'আধুনিক ধান ভাঙানো কল' ব্যবহার করা হয়। এই মেশিনে ধান পরিষ্করণ (ধান হতে খড়, লোহা, মাটি, পাথর, ধূলো পরিষ্কার করা), তুষ ছাড়ানো, তুষ ও চাল পৃথক করা, চাল পালিশ করা সকল প্রক্রিয়াই হয়।

৫.৪.২ ধান ও চাল হতে প্রস্তুত বিভিন্ন খাদ্যবস্তু

মুড়ি—মাটির কিংবা লোহার কড়াইয়ে বালি দিয়ে উনুনে চাপানো হয়। বালি গরম হলে তাতে চাল দিয়ে অনবরত নাড়তে হয়। চাল ফুলে মুড়িতে পরিণত হয়। চালুনির সাহায্যে বালি ও মুড়ি পৃথক করা হয়।

খই—ধানকে ২-৩ মিনিট জলে ভিজিয়ে রেখে, ভাল করে জল ঝরিয়ে নেওয়া হয়। মুড়ি তৈরীর মতো একইভাবে মাটির বা লোহার কড়াইয়ে বালি দিয়ে এই ভিজে ধান ভাজা হয়। ফুলে ওঠা শস্য ধানের খোসা ফাটিয়ে দেয় ও নরম সাদা খইয়ে রূপান্তরিত হয়। চালুনির সাহায্যে বালি দূর করার পর খই থেকে ধানের খোসা কুলোর সাহায্যে ঝেড়ে দূর করা হয়।

চিঁড়া—ধানকে ২-৩ দিন জলে ভিজিয়ে রাখার পর, কয়েকমিনিট ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করে, জল ঝরিয়ে নেওয়া হয়। এই ধান, অগভীর, মাটির বা লোহার কড়াইয়ে রেখে উত্তপ্ত করা হয়। তারপর কাঠের পেষণ যন্ত্রের সাহায্যে শস্যকে চ্যাপ্টা করা হয় ও তুষ আলাদা হয়ে যায়। কুলোর সাহায্যে তুষ ও চিঁড়াকে পৃথক করা হয়।

৫.৪.৩ গম

গম থেকে সুজি, আটা ও ময়দা প্রস্তুত করা হয়। শস্যের বাহিরের ত্বককে ব্র্যান (Bran) বলে। এই অংশে ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় পদার্থ, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি বেশী থাকে। শস্যের ভিতরের অংশে শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ বেশী থাকে। ব্র্যান সমেত অর্থাৎ সম্পূর্ণ (গোটা) গম থেকে প্রাপ্ত

চূর্ণ অংশকে আটা বলে। শস্যের ভিতরের অংশ বেশী নরম ও সদা হয়। এই অংশ থেকে প্রাপ্ত চূর্ণ অংশকে ময়দা বলা হয়।

স্টোন (Stone) পদ্ধতিতে ভাঙানো গমে ১০০% নিষ্কাশন হয় বা আটা পাওয়া যায় অর্থাৎ ১০০ কেজি গম থেকে ১০০ কেজি আটা পাওয়া যায়।

রোলার (Roller) পদ্ধতিতে আটা ও ময়দার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ পাওয়া যায়। ১০০ কেজি গম থেকে ২০-৪০ কেজি উৎকৃষ্ট ময়দা পাওয়া যায়।

৫.৪.৪ ডাল

ডালের খোসা ছাড়ানো ও ভিতরের শস্যকে দুটি সমান অংশে ভাগ করে ফেলা হয় ডাল ভাঙানোর সময়। ডালকে একাধিক্রমে জলে ভেজালে ও শুকালে ডালের খোসা ছাড়ানো ও এক-দুই অংশে বিভক্ত করা যায়। দেশী পদ্ধতিতে ডাল ভাঙলে অনেক ভাঙা ডাল ও ডালের গুঁড়ো উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে ৬৫-৭০% খোসা ছাড়ানো দুভাগে ভাঙা ডাল পাওয়া যায় যেখানে আধুনিক ডাল ভাঙানো মেশিন ব্যবহার করলে ৮২-৮৫ক্ষ খোসা ছাড়ানো ও দুটুকরোভাবে ভাঙা ডাল পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে দানাশস্যের মধ্যে ডাল নিরামিশাষীদের এবং গরিবদের জন্য খুবই দরকারী; কৃষিজাত পুরোটাই ডাল হিসাবে খাওয়া হয়ে যায়। উন্নত দেশে স্যুপ তৈরি করতে কখন কখন লাগে এবং উন্নত প্রক্রিয়াজাত প্রোটিন-আইসোলেট এবং কনসেন্ট্রেটও করা হয়। প্রোটিন হাইড্রোলাইসেট ও ফুড-সাপ্লিমেন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে বৃদ্ধ ও রোগীদের জন্য।

৫.৫ বেকারী শিল্প

পাঁউরুটি, কেক, বিস্কুট প্রস্তুতির শিল্পকে বেকারী শিল্প বলে।

আটা বা ময়দার থাকা প্রোটিনকে গ্লুটেন ছগুপ্তুত্ত্বল্প্ত্ত্ব বলে। গ্লুটেন-এর গুণ ও পরিমাণের উপর নির্ভর করে উৎপান্ন বস্তুর গুণমান।

পাঁউরুটি, কয়েকপ্রকার কেক ও কয়েকপ্রকার বিস্কুটের জন্য মাখা ময়দার মণ্ডকে কোহল সন্ধানের জন্য ফেলে রাখা হয়। সন্ধান পদ্ধতিতে শর্করা ভেঙে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ময়দার তালকে ফাঁপিয়ে দেয়। ঈষ্ট নামক এককোষী ছত্রাক এই সন্ধান প্রক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পাঁউরুটি প্রস্তুতি ঃ

উপাদনা	শতকরা
ময়দা	১০০
জল	৬০-৬৫
গুঁড়ো দুধ (ফ্যাট বিহীন)	৪
ঈষ্ট	২
চিনি	৬-৮
নুন	২
স্নেহপদার্থ	৩-৪

পদ্ধতি ঃ সমস্ত উপাদনা একত্রে মিশিয়ে ২৭°C তাপমাত্রায় রাখা হল। সন্ধান প্রক্রিয়া শেষ হবার পর ৩৮-৪৮°C-এ ৪৫-৬০ মিনিট রাখা হল। এর পর ৩০ মিনিট সেঁকা হল।

পাঁউরুটির অনেক নাম আছে, যেমন হোয়াইট, হুইট-মিল, ফ্যান্সি, ফ্রুটি, বান, মশাল এবং দুধ পাঁউরুটি। অবশ্য-ব্যবহার্য দ্রব্য ছাড়াও এতে থাকতে পারে কন্ডেন্সড দুধ, দুধ পাউডার, ছানার জলের পাউডার, দই পাউডার, গ্লুটেন, চিনি গুড় বা জ্যাগারী, খান্দসারী, মধু, লিকুইড গ্লুকোজ, মল্ট পাউডার, খাবারের গুড়ো, বাদাম গুড়ো, সয়াবীন ফ্লাওয়ার, প্রোটিন কনসেন্ট্রেট ও আইসোলেইট, বনস্পতি মার্জারিন ও খাদ্য তেল বা চর্বি, লেসিথিন, গ্লিসারিন, গ্লিসারিল মনোষ্টিয়ারেট ও তদনুরূপ অন্য কিছু খাদ্য প্লাস্টিসাইজার, ভিটামিন, খাদ্যগাম, মশলা, ফল ও ফলজাত খাবার, ইত্যাদি এবং মোল্ড ইনহিবিটার যেমন প্রপিওনিক ও সর্বিক এ্যাসিড বা ওদের সল্ট। নানারকমের বিস্কুট, কেক ও প্যাষ্ট্রী বেকারী শিল্পের মধ্যে ধরা হয়। বলাবাহুল্য এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কম্পোজিশন আছে, অনেকটা কারুশিল্পের মত এবং দেশকাল ভেদে বিভিন্ন। তবে পাঁউরুটির মত ঈষ্ট ব্যবহার করতে হয় না।

নানারকম খাবার আজকাল বেক করে তৈরি করা হয়। পিৎজা ত বাণিজ্যিকভাবে সফল। তাছাড়া, মাছ, মাংস ও সব্জী বেক করে খাওয়ারও প্রবণতা বেড়েছে।

৫.৬ সারাংশ

খাদ্য প্রযুক্তি বিষয়ে আংশিক আলোচনা করা হয়েছে। খাদ্যবিজ্ঞান যার মধ্যে পুষ্টি ও জীবনবিদ্যা বিজ্ঞানও আছে এর ফলিত প্রয়োগ প্রযুক্তিতে। খাদ্য ত মানুষের কর্ম্মকাণ্ডের বড় অংশ; তাই খাদ্যপ্রযুক্তি সবচেয়ে বড় ইন্ডাষ্ট্রী। দরকার মত এই ইন্ডাষ্ট্রীর কোন কোনটি নিয়ে কাজ করা যেতেই পারে। খাদ্য সংরক্ষণের সব দিক নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, এমনকি তেজষ্ক্রিয় রশ্মির ব্যবহার এবং কন্ট্রোল ও পরিবর্তিত বায়ুর আবহাওয়াতে মিল করা প্যাকেজে টাটকা অবস্থায় সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে।

ফল, খাদ্যশস্য, বেকারী, এক্সট্রুডেড এক্সপান্ডেড খাবার, এবং মিষ্টান্ন এদের ইন্ডাষ্ট্রী সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি স্তরের শিল্প সংস্থাপনা করা সম্ভব এও বলা হয়েছে।

৫.৭ অনুশীলনী

(১) খাদ্য কি কি কারণে নষ্ট হতে পারে? নষ্টা হওয়ার প্রতিকার কি?

(২) আয়োনাইজিং রশ্মি কি? এতে খাদ্য ব্যাপারে কি কি সুবিধা হতে পারে?

(৩) আবহাওয়া কিভাবে করে কন্ট্রোল ও পরিবর্ত্তিত করে সংরক্ষণ হয়?

(৪) জেলির ষ্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন তৈরী করতে গেলে কি কি সম্ভাব্য প্যারামিটারের প্রয়োজন হতে পারে?

(৫) গ্রামে একটি বেকারীর চুল্লি তৈরী করালে এতে কি কি খাবার তৈরী করা যেতে পারে?

(৬) এক্সট্রুডেড খাবারের সুবিধা কি?

(৭) ট্রাডিশনাল খাবার কি? এই খাবারের সুবিধা কি হতে পারে?

একক 6 □ জলদূষণ (Water Pollution)

গঠন

6.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

6.1 জলের প্রাকৃতিক উৎস

6.1.1 জলদূষণের উৎসসমূহ

6.1.2 জলদূষণের শ্রেণীবিভাগ

6.2 জলদূষণের কয়েকটি ঘটনা

6.3 জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ

6.4 জলের দূষণ মুক্তকরণ

6.4.1 জলের প্রাথমিক পরিশোধন

6.4.2 জলের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

6.4.3 জলের তৃতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

6.5 পানীয় জলের আন্তর্জাতিক প্রমাণমাত্রা

6.6 জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন

6.7 রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা

6.8 জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা

6.9 জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ

6.10 জলের খরতা

6.11 সারাংশ

6.12 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

6.13 উত্তরমালা

6.0 প্রস্তাবনা

জীবনধারণের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। পৃথিবীর মোট জলসম্পদের 97% সমুদ্রে থাকে, 2% জল মেরু অঞ্চলে বরফ ও হিমবাহ হিসাবে থাকে এবং মাত্র 1% জল নদী, হ্রদ বা পুকুরে থাকে যা মানুষের ব্যবহারযোগ্য। পৃথিবীর মধ্যে জল হচ্ছে একমাত্র পদার্থ যা তরল, কঠিন ও বাষ্পীয় অবস্থায় অবস্থান করে। সূর্যের তাপে নদী/সমুদ্রের জল বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেঘের সৃষ্টি করে, যা বৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। এইভাবে পৃথিবীর মোট জল স্থির থাকে এবং জলচক্র নিয়ন্ত্রিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রতি মানুষের চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু মানুষের ব্যবহারযোগ্য এই জল প্রতিনিয়ত কোনো কৃত্রিম বা পরিবেশগত কারণে ভৌত, রাসায়নিক বা জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে ব্যবহারের অযোগ্যে পরিণত হচ্ছে। ইহাকেই জলদূষণ বলা হয়।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- জলদূষণ বলতে কি বোঝায়
- জলদূষণের কারণগুলি কি কি? এই কারণগুলির মধ্যে যেমন প্রাকৃতিক কারণ আছে তেমনি সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপর মানুষের হস্তক্ষেপে বিভিন্ন উৎসে জল দূষিত হচ্ছে। যেমন মানুষের তৈরী কলকারখানা থেকে বর্জ্য পদার্থ, ফলন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার প্রয়োগ অথবা পোকা বিনষ্ট করতে কীটনাশক পদার্থের ব্যবহার—এগুলি সবই বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদী এবং সমুদ্রে পতিত হয় এবং এর ফলে জল দূষিত হয়
- কিভাবে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- পানীয় জলের আন্তর্জাতিক প্রমাণমাত্রা বলতে কি বোঝায়
- রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা কি এবং কিভাবে নির্ণয় করা যায়
- জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ এবং জলের খরতা নির্ণয়ের পদ্ধতি

6.1 জলের প্রাকৃতিক উৎস

বৃষ্টির জল : প্রাকৃতিক উৎসগুলির মধ্যে একমাত্র বৃষ্টির জলই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু কলকারখানার নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত কার্বন, নাইট্রোজেন ও সালফার ডাইঅক্সাইডসমূহ বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে অম্লবৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসে।

নদীর জল : বৃষ্টির জল পৃথিবীর মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীতে প্রবেশ করে। মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় মাটির মধ্যে উপস্থিত Na, K, Mg প্রভৃতি ধাতুর সালফেট, ক্লোরাইড ইত্যাদি লবণ জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। জমিতে অতিরিক্ত সার, কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত অথবা প্রলম্বিত অবস্থায় নদীর জলে মিশে জল দূষিত করে। এছাড়া কলকারখানার বর্জ্য পদার্থও নদীর জলকে দূষিত করে।

ঝরনার জল : বৃষ্টির জল মাটির মধ্য দিয়ে ভূগর্ভস্থস্তরে জমা হয়। পাহাড়ের বৃষ্টির জল ঝরনার আকারে বের হয়ে আসে।

সমুদ্রের জল : নদীর জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সমুদ্রের জলে অধিক পরিমাণে খনিজ লবণ, জৈব পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থ মিশে থাকার জন্য মানুষ এই জল ব্যবহার করতে পারে না। এই জল লবণাক্ত। প্রাকৃতিক জলের মধ্যে সমুদ্রের জল সবচেয়ে দূষিত।

6.1.1 জলদূষণের উৎসসমূহ

প্রাকৃতিক উৎসসমূহ : জীবজন্তু ও গাছপালার মৃত্যুজনিত পদার্থ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে উদ্ভুত পদার্থ, পাহাড় ও ভূমির ক্ষয়ে উৎপন্ন পদার্থসমূহ জলাবহিত হয়ে নদীতে এসে পড়ে এবং নদীর জল দূষিত হয়। নদীর জল দূষিত হবার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ আগেই বলা হয়েছে।

কৃত্রিম উৎসসমূহ : কলকারখানা, শিল্পাঞ্চল থেকে নির্গত পদার্থ, মানুষের মলমূত্র, গৃহপালিত পশুর খাবার অবশেষ নদীর জলে মিশে ইহাকে দূষিত করে।

6.1.2 জলদূষণের শ্রেণীবিভাগ

(i) **জৈবদূষক পদার্থসমূহ** : জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 4–6 ppm হওয়া উচিত। গৃহস্থ বাড়ীর ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় পদার্থ, মানুষ ও গৃহপালিত পশুর মলমূত্র, কৃষিকাজে ব্যবহৃত পদার্থসমূহ জলে মিশে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এর ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জামাকাপড় ও শরীর পরিষ্কার করার জন্য যথাক্রমে

কৃত্রিম ডিটারজেন্ট ও সাবান ব্যবহার করা হয়। ডিটারজেন্টের মধ্যে নানারকমের উৎসেচক থাকে, যা অতি কম পরিমাণে থেকে ফেনার সৃষ্টি করে। এর ফলে জল বাতাস শোষণ করতে পারে না, তাই জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। গৃহপালিত পশু, মানুষের মলমূত্র পুকুর ও নদীর জলে মেশার ফলে, বিভিন্ন প্রকার রোজজীবাণু দ্বারা জল দূষিত হয়। জলবাহিত উল্লেখযোগ্য রোগসমূহ হল আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, জন্ডিস ইত্যাদি।

মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জৈব রাসায়নিক পদার্থ যেমন প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ, ডিটারজেন্ট, জীবাণুনাশক পদার্থ ইত্যাদি প্রস্তুতির সময় কিছুটা বিভিন্নভাবে মাটিতে পড়ে যায়, যাহার বেশীর ভাগই জলে মিশে উদ্ভিদ, জীব ও মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। এই সকল পদার্থের বেশীর ভাগই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সহজে বিয়োজিত হয় না। ইহারা জলের গুণ নষ্ট করে। ফলে জলে বসবাসকারী প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করে।

কৃষিকাজজনিত কাজের জন্য চাষীরা নানাধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। যেমন পোকা মারার জন্য প্যারাথায়ন, ইথায়ন প্রভৃতি, আগাছা এবং অপ্রয়োজনীয় গাছপালা ধ্বংস করার জন্য 2, 4-ডাইক্লোরোফিনক্সি অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। এই সকল কীটনাশক পদার্থসমূহ স্প্রে করার সময় বাতাসে মিশে যায় এবং কাছাকাছি কোনো পুকুর বা জলাশয়ে পড়ে। বৃষ্টির জল দ্বারাও এই সকল পদার্থ বিভিন্ন জলাশয়ে গিয়ে মেশে এবং জল দূষিত করে।

(ii) **অজৈবদূষক পদার্থসমূহ** : পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল দেশেই শিল্পের প্রসারণের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার হয় এবং এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে দূষিত পদার্থ জলের সঙ্গো মিশে জলকে দূষিত করে। বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি; উপাদানকারী কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ জলের মধ্যে মিশে জলের অম্লদূষণ করে। কস্টিক সোডা, চুন, কলিচুন উৎপাদনকারী কারখানা থেকেও প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ জলে মিশে জলের ক্ষার দূষণ করে। নাইট্রেট (NO_3^-), নাইট্রাইট (NO_2^-), সালফেট (SO_4^{2-}), প্রভৃতি অ্যানায়নযুক্ত এবং কপার (Cu), ম্যাঙ্গানীজ (Mn), মারকারী (Hg), সীসা (Pb) প্রভৃতির লবণ ক্ষতিকারক সীসার উপর থাকলে দীর্ঘস্থায়ী দূষণ সমস্যার সৃষ্টি করে।

সীসা দূষণের প্রধান উৎস হল ইস্পাত ও রঙ শিল্প। এছাড়া টেট্রাইথাইল লেড গাড়িতে অ্যান্টিনক যৌগ হিসাবে গ্যাসোলিনে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে জলে এবং বায়ুতে সীসার পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সীসা দূষিত জল গ্রহণ করলে শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটে।

ইদানীং আর্সেনিকজনিত দূষণ এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আর্সেনিক দূষিত জল গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক চর্মরোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

(iii) **পলি** : বন্যাপ্লবিত অঞ্চল, কৃষিকাজ, ভূমিক্ষয়, বুলডোজার চালানো শহর এলাকা থেকে ধুয়ে আসা মাটি ও খনিজ পদার্থের ক্ষুদ্র কণা থেকে পলি উৎপন্ন হয়। এই পলি নদীপথ এবং নদীগর্ভকে বুজিয়ে নদীর গভীরতা হ্রাস করে। ভাকরা, মাইথন প্রভৃতি জলাধারে পলি পড়ার ফলে এখানে বেশি জল ধরে রাখা যাচ্ছে না। এর ফলে বর্ষাকালে বন্যা বেশি হচ্ছে এবং গ্রীষ্মকালে সেচের জন্য পরিমাণমত জল পাওয়া যাচ্ছে না। নদীতে বেশী পরিমাণে পলি পড়ার ফলে নদীবন্দরগুলিতে জাহাজ চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। পাম্পিং এবং টারবাইন ব্যবস্থায় ক্ষয়ের ফলে জলে প্রয়োজনীয় সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারছে না, ফলে জলের নীচের উদ্ভিদসমূহের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বাধা পাচ্ছে।

(iv) **তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ** : নিউক্লিয় অস্ত্র, নিউক্লিয় ঔষধ, নিউক্লিয় গবেষণাগার থেকে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ জল দূষিত করে। খনি থেকে তেজস্ক্রিয় মৌলের নিষ্কাশনের সময়েও কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে মেশে। তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকসমূহ যেমন Ra^{226}, U^{236}, Pu^{239}, Ba^{140} প্রভৃতি জলের নীচে পলিতে জমা হয় এবং জৈবচক্রে প্রবেশ করে এবং শরীর ও স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। জলে উপস্থিত অতি সামান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্যান্সার সৃষ্টি করে এবং DNA ধ্বংস করে।

(v) **তাপীয় দূষকসমূহ** : বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় জলীয় বাষ্পকে শীতল ও ঘনীভূত করার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল লাগে। ফলে জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং এই উষ্ণ জল নদী বা হ্রদে নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলে নদী বা হ্রদের জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে, মাছের জীবনধারণ কঠিন হয়ে পড়ে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলের ঘনত্ব ও অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, ফলে জলজ প্রাণীর পরিপাকক্রিয়া নষ্ট হয়।

(vi) **অতি পৌষ্টিকতা (Eutrophication) ও জলদূষণ** : চিনিকল, কসাইখানা, কাগজের কল, দুগ্ধকেন্দ্র প্রভৃতি শিল্পের বর্জিত ময়লা জলে নানাধরনের পুষ্টিকর পদার্থ দ্রবীভূত অথবা প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে। এই জল উৎস থেকে নিকটবর্তী জলাশয়ে প্রবেশ করলে জলের পৌষ্টিকতা বৃদ্ধি পায়। সেই জলাশয়ের জলে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ (যেমন, নীলচে-সবুজ শ্যাওলা) দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। এই অবস্থাকেই 'অতিপৌষ্টিকতা' বলে। এর ফলে জলাশয়ের জলতল শ্যাওলায় আবৃত হয়ে যায়। একে 'শৈবাল বিকাশ' বলে। অবশেষে শ্যাওলায় মৃতাবশেষ পচে বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং বিয়োজনকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে জলের অক্সিজেনের পরিমাণ ভীষণভাবে কমে যায়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় বলে জলজপ্রাণী, যেমন মাছ, অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়।

জলের এই অতিপৌষ্টিকতাজনিত সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়গুলি হল—

(a) প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎসের বর্জির জল থেকে পুষ্টিকর পদার্থগুলির অপসারণ; এই পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষ

(b) পুষ্টিসমৃদ্ধ জল সেচের কাজে ব্যবহার করা

(c) জলাশয়ের শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ থেকে জৈব গ্যাস তৈরী করা

অনুশীলনী—1

(a) জলদূষণ বলতে কি বোঝায়?

(b) জলের প্রধান উৎসসমূহ কি কি?

(c) জলদূষণের গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলির নাম লিখুন।

(d) জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কত হওয়া উচিত?

(e) কৃত্রিম ডিটারজেন্ট কিভাবে জল দূষিত করে?

(f) জলবাহিত কয়েকটি রোগের নাম করুন।

6.2 জলদূষণের কয়েকটি ঘটনা

(i) জাপানের মিনিমাটা অঞ্চলে ভিনাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন করার কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে মার্কিউরিক ক্লোরাইড [$HgCl_2$] সমুদ্রে ফেলা হত। এই পারদ যৌগ সমুদ্রের তলার মাটির জীবাণুর দ্বারা ডাই-মিথাইল মার্কারী [$(CH_3)_2Hg$] যৌগ তৈরী করে যা মাছের শরীরে প্রবেশ করে। এই মাছ খাওয়ার ফলে 1953 সালে এই অঞ্চলের মানুষ স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়।

(ii) 1973 সালে আমেরিকার মিচিগান শহরে ভুলবশতঃ ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড [MgO] মনে করে পলিব্রোমিনেটেড বাই ফিনাইল (PBB) পশুর খাবারের সঙ্গে মেশানো হয়। ফলে প্রচুর গরু, কুকুর, মুরগী মারা যায়।

(iii) 1988 সালে ইংল্যান্ডের জলশোধন কেন্দ্রে 200 টন অ্যালুমিনিয়াম সালফেট [$Al_2(SO_4)_3$] জলের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে জলে Al-এর মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। এই জল গ্রহণের ফলে এই অঞ্চলের মানুষের মুখে ঘা, পাকস্থলীর প্রদাহ ইত্যাদির লক্ষণ দেখা দেয়।

6.3 জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ

জলদূষণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নত শিল্প প্রযুক্তির বিকাশ। জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতিগতভাবে এবং সরকারী ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। প্রত্যেক মানুষকে জলের প্রকৃতি এবং প্রাণীজগতে এর প্রভাব সম্ভবন্ধে জানার জন্য যথেষ্ট শিক্ষিত হতে হবে। জলের মধ্যে প্রাণীর বা মানুষের ব্যবহৃত নোংরা বর্জ্য পদার্থ ছোঁড়া থেকে নিজেকে সংযত রাখতে হবে। পৌরসংস্থাগুলিকে নর্দমার সুব্যবস্থা করতে হবে এবং জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কাজে সরকারকে নির্দিষ্ট তহবিল গড়তে হবে। 1974 সালে জলদূষণ আইন পাশ করে ভারত সরকার জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

6.4 জলের দূষণ মুক্তকরণ

জলের মধ্যে উপস্থিত জৈব বর্জ্য পদার্থ, অব্যবহার্য প্লাস্টিকের দ্রব্য, ধাতুর টুকরো, সংক্রামক জীবাণু, ধুলো, বালি মিশে থাকে। এই সকল ক্ষতিকারক দূষিত পদার্থসমূহ দূর করে বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করা যায়। নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে পৌর অঞ্চলের নর্দমার জল, শিল্প কারখানার বর্জ্য জল পরিশোধন করা হয়।

6.4.1 জলের প্রাথমিক পরিশোধন

থিতান : গৃহস্থালি ও কারখানার পরিত্যক্ত জলে প্লাস্টিকের দ্রব্য, ধাতুর টুকরো, কাচের টুকরো, কাঠ ইত্যাদি থাকে। এই সকল পদার্থ বাহিত নালার মুখে ধাতুনির্মিত ছাঁকনী লাগিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের কঠিন পদার্থ ছেঁকে পৃথক করা হয়। এরপর এই জল সরু ছাঁকনীর মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। এরপর ঐ জলকে বড় জলাধারে রেখে থিতানো হয়। এর ফলে বালি, মাটি, কাদা ও ভারী ধুলিকণা থিতিয়ে পড়ে।

তঞ্চন : অবিশুদ্ধ জলকে থিতান ট্যাঙ্কে কয়েকদিন রাখার পর, এর মধ্যে ফটকিরি [যেমন পটাশ অ্যালাম K_2SO_4, $Al_2(SO_4)_3$, $24H_2O$] যোগ করা হয়। এর ফলে ছোট ছোট কণাগুলি একত্রিত হয়ে বড় কণায় পরিণত হয় এবং থিতিয়ে পড়ে।

পরিস্রাবণ : থিতিয়ে পড়া কাদা, ময়লা থেকে উপরের জলকে পরিস্রাবণের মাধ্যমে পৃথক করা হয়। এরজন্য ঐ জলকে বালির স্তরের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়।

সংক্রামক জীবাণু দূরীকরণ : পরিস্রুত জলকে জীবাণুশূন্য করার জন্য ক্লোরিন কিংবা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সমস্ত জলকে আলোড়ন করা হয়। ক্লোরিনের পরিমাণ বেশী হলে জলে উপস্থিত জৈব যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন তৈরী হয়, যা ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করে। এইজন্য জলের জীবাণু দূর করার জন্য ক্লোরিন ব্যবহার না করে অতিবেগুনী রশ্মি বা ওজোন ব্যবহার করা হয়।

6.4.2 জলের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

এই পর্যায়ে জীবাণু, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি জীবন্ত আণবিক পদার্থের সাহায্যে জলে উপস্থিত দ্রবীভূত এবং কলয়ডীয় জৈব পদার্থসমূহকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অপসারিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় জীবন্ত আণবিক পদার্থ জলে উপস্থিত জৈব পদার্থগুলিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং উহাদের CO_2তে জারিত করে। নাইট্রোজেন যুক্ত জৈব পদার্থসমূহ অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রেট ও নাইট্রাইটে পরিণত হয়।

6.4.3 জলের তৃতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

রাসায়নিক পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে জলে ফেরাস সালফেট, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট মিশিয়ে জলে উপস্থিত কলয়ডীয় কণার অধঃক্ষেপ ফেলা হয় এবং বালির স্তরের ছাঁকনীর মধ্য দিয়ে পাঠান হয়। এরপর পরিস্রুত জলে কলিচুন যোগ করে জলে উপস্থিত ফসফেট ক্ষারকীয় ফসফেটরূপে অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। অবশিষ্ট জৈব পদার্থ অপসারণের জন্য সক্রিয় অঙ্গারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এরপর ঐ পরিস্রুত জলে ওজোন বা ক্লোরিন মিশিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

আয়ন বিনিময় পদ্ধতি : জলে অনেক সময় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সালফেট, ক্লোরাইড প্রভৃতি লবণ দ্রবীভূত হয়ে থাকে। পানীয় জলের ক্ষেত্রে ও লন্ড্রীর কাজের ক্ষেত্রে এই জল উপযুক্ত নয়। এইজন্য এই জলকে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন বিনিময়কারী রেজিনের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। ক্যাটায়ন বিনিময়কারী রেজিন হল উচ্চ আণবিক ওজোনযুক্ত পলিমার যৌগ যেখানে কার্বক্সিল (—COOH) বা সালফোনিক অ্যাসিড মূলক (—SO_3H) থাকে এবং অ্যানায়ন বিনিয়মকারী রেজিন হল উচ্চ আণবিক ওজনের অ্যামিন যৌগ। এই দুই প্রকার রেজিনের মধ্যে জল চালনা করলে জল আয়নমুক্ত হয়ে মৃদু জলে পরিণত হয়।

বাতান্বিতকরণ : উচ্চ চাপের বায়ুকে মৃদু জলের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে বুদবুদ আকারে বের করে দেওয়া হয়। এর ফলে মৃদু জলের মধ্যে উপস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি গ্যাস দূর হয় এবং জলে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

6.5 পানীয় জলের আন্তর্জাতিক প্রমাণমাত্রা

বিচার্য বিষয়ের ধ্রুবক	সর্বাধিক অনুমোদিত মান	WHO অনুমোদিত মান	ISI অনুমোদিত মান
pH	6-8.5	6.5-9.5	6-9
আপেক্ষিক পরিবাহিতা	300 μ mho cm^{-1}	—	—
রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা	4.0 মিগ্রা/লি	90 মিগ্রা/লি	—
জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা		5.0 মিগ্রা/লি	6.0 মিগ্রা/লি —
দ্রবীভূত অক্সিজেন	4-6 মিগ্রা/লি	—	—
মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ	500 মিগ্রা/লি	500 মিগ্রা/লি	—
লৌহ	0.3 মিগ্রা/লি	1 মিগ্রা/লি	—
ম্যাঙ্গানীজ	0.05 মিগ্রা/লি	0.5 মিগ্রা/লি	0.01 মিগ্রা/লি
সীসা	0.05 মিগ্রা/লি	0.1 মিগ্রা/লি	0.01 মিগ্রা/লি
আর্সেনিক	0.05 মিগ্রা/লি	0.05 মিগ্রা/লি	0.02 মিগ্রা/লি
নাইট্রেট ও নাইট্রাইট	10 মিগ্রা/লি	45 মিগ্রা/লি	—
ফ্লুওরাইড	1.5 মিগ্রা/লি	—	3 মিগ্রা/লি

অনুশীলনী—2

(a) জলদূষণের ফলে উদ্ভুত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করুন।

(b) দূষিত জলের প্রাথমিক পরিশোধনের ধাপগুলি উল্লেখ করুন।

(c) আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে জল কিভাবে আয়নমুক্ত করা হয়?

(d) পানীয় জলে সীসার সর্বোচ্চ অনুমোদিত মান কত?

6.6 জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন (D.O.)

জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 4–6 ppm হওয়া দরকার। জলের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক কার্যের উপর জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ভর করে। জৈব পদার্থের দূষণের ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। দূষিত জলের মধ্যে উপস্থিত ব্যাক্টেরিয়া দ্রবীভূত অক্সিজেনকে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত করে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণের উপর কোন্ জল কতটা দূষিত বলা যায়।

জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ আয়োডোমিতি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়। একটি বিশেষ ধরনের ছিপিযুক্ত কাঁচের বোতলে ভর্তি করে দূষিত জল নেওয়া হয়। এর মধ্যে ক্ষারীয় পটাসিয়াম আয়োডাইড এবং ম্যাঙ্গানাস সালফেট যোগ করা হয়, এতে ম্যাঙ্গানাস হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারা ম্যাঙ্গানাস হাইড্রক্সাইড ক্ষারকীয় ম্যাঙ্গানীক হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। এর মধ্যে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করলে ক্ষারকীয় ম্যাঙ্গানীক হাইড্রক্সাইড জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সমতূল্য আয়োডিন মুক্ত করে, যা প্রমাণ সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ দিয়ে স্টার্চ নির্দেশক ব্যবহার করে প্রশমিত করা হয়। ব্যবহৃত সোডিয়াম থায়োসালফেটের আয়তন থেকে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

6.7 রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা

যে পরিমাণ অক্সিজেন রাসায়নিকভাবে অ্যাসিডযুক্ত পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের সমতূল্য, তাকে রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বলে।

250 মিলিলিটার গোলতলা যুক্ত কাঁচের পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ নমুনা জলের সঙ্গে অতিরিক্ত প্রমাণমাত্রার পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণ, ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড, 1 গ্রাম সিলভার সালফেট এবং 1 গ্রাম মারকিউরিক সালফেট যোগ করা হয় এবং মিশ্রণটি 6 ঘণ্টা ধরে ফোটানো হয়। এরপর মিশ্রণটি ঠাণ্ডা করে মোরের লবণ (ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেট) দিয়ে ফেরোইন নির্দেশকের উপস্থিতিতে প্রশমিত করা হয়।

গণনা ঃ ধরা যাক, নমুনা জলের পরিমাণ = V মিলি, জলে যুক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রশমন করতে প্রয়োজনীয় মোর লবণ দ্রবণের পরিমাণ = V_1 মিলি, জারণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর উদ্বৃত্ত পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রশমন করতে প্রয়োজনীয় মোর লবণ দ্রবণের পরিমাণ = V_2 মিলি। সুতরাং শুধুমাত্র জৈব পদার্থ জারণের জন্য প্রয়োজনীয় মোর লবণ দ্রবণের পরিমাণ $(V_1 - V_2)$ মিলি।

$$\therefore \text{ রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা } = \frac{(V_1 - V_2)N \times 8000}{V} \text{ গ্রাম/লিটার।}$$

6.8 জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা

জলে উপস্থিত জৈব পদার্থের জীবাণু দ্বারা সবাত অবস্থায় বিভাজনের জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, তাকে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বলে। নির্দিষ্ট পরিমাণ নমুনা জল বায়ুনিরোধক

পাত্রে নিয়ে 20°C উষ্ণতায় 5 দিন ধরে রেখে দেওয়া হয়। প্রথমে এবং 5 দিন পরে জলে উপস্থিত অক্সিজেনের পরিমাণের পার্থক্য থেকে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা নির্ণয় করা হয়।

6.9 জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ

জলে উপস্থিত দ্রবীভূত, প্রলম্বিত ও থিতিযোগ্য সমস্ত কঠিন পদার্থকে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ বলা হয়। জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ নির্ণয়ের জন্য একটি পোর্সেলিন পাত্রের নির্দিষ্ট ওজন নেওয়া হয়। এই পাত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণমত জল নিয়ে ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত করা হয়। এইভাবে তরল অংশ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়ে গেলে, অবশেষকে আরও শুষ্ক করে নির্দিষ্ট ওজন নেওয়া হয়। দুইটি ওজনের পার্থক্য থেকে জলে দ্রবীভূত মোট কঠিন পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

6.10 জলের খরতা

জলের মধ্যে সাধারণত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ প্রভৃতির ক্লোরাইড, সালফেট, বাইকার্বনেট লবণ দ্রবীভূত হয়ে থাকে। এই সকল দ্রবীভূত লবণের পরিমাণের উপর জলের খরতার মাত্রা নির্ভর করে। জলের খরতা সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ প্রভৃতির বাইকার্বনেট লবণ জলে দ্রবীভূত থেকে অস্থায়ী খরতার সৃষ্টি করে। স্ফুটনের সাহায্যে জলের এই অস্থায়ী খরতা দূর করা হয়। জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতির ক্লোরাইড, সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকলে স্থায়ী খরতার সৃষ্টি করে। এই খরতা সাধারণ স্ফুটনের সাহায্যে দূর করা যায় না।

জলের খরতা প্রকাশ করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বনেটের তুল্য পরিমাণ ওজন হিসাবে। নমুনা জলের প্রতি দশ লক্ষ ভাগ ওজনে x ভাগ ওজনের ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা তার তুল্য পরিমাণে খরতা সৃষ্টিকারী পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে, জলের খরতা হয় x ppm. জলের মোট খরতাকে ইথিলিন ডাইঅ্যামিন টেট্রাঅ্যাসেটিক অ্যাসিড (EDTA) দ্বারা প্রশমন করে নির্ণয় করা হয়। 250 মিলি কনিক্যাল পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল নিয়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বাফার যোগ করে নমুনা জলের pH 10 এর কাছাকাছি রাখা হয়। এরপর ঐ জলে 2 ফোঁটা এরিওক্রোম ব্ল্যাক T নির্দেশক যোগ করে প্রমাণমাত্রার EDTA দ্রবণ দ্বারা প্রশমিত করা হয়। প্রশমন কালে দ্রবণের রঙ লাল থেকে নীল হয়। বিউরেট পাঠ থেকে খরতার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

1 মিলি 0.01 (N) EDTA ≡ 1.0 মিগ্রা $CaCO_3$

অনুশীলনী—3

(a) জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে?

(b) জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

(c) রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা কাকে বলে?

(d) জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা কাকে বলে?

(e) জলের খরতার মাত্রা কিসের উপর নির্ভর করে?

6.11 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জলদূষণ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য জানতে পেরেছেন তার সার-সংক্ষেপ নীচে দেওয়া হল :

- জলদূষণ কাকে বলে
- জলের প্রধান প্রাকৃতিক উৎসগুলি যেমন বৃষ্টির জল, নদীর জল, ঝরনার জল ও সমুদ্রের জল। এই উৎসগুলি থেকে প্রাপ্ত জল কোন্ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং সবচেয়ে দূষিত কেন
- জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলদূষণ মুক্তকরণ পদ্ধতি
- জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কত হওয়া উচিত এবং কেন দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে কি হয়
- জলে রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা ও জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা বলতে কি বোঝায় এবং কিভাবে নির্ণয় করা যায়
- জলের খরতা কিসের উপর নির্ভর করে এবং জলের এই খরতা কিভাবে নির্ণয় করা যায়

6.12 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. মনে করুন আপনার বাসস্থানের নিকটবর্তী এলাকায় (2 কি:মি: ব্যাসার্ধের মধ্যে) কলেরা রোগ দেখা দিয়েছে। এই রোগের প্রাদুর্ভাবকে তাৎক্ষণিক দমন এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

2. চাষের জমিতে ফসল বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত রাসায়নিক সার এবং পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত কীটনাশক পদার্থ যাতে ব্যবহার করা না হয় তার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

3. অতিপৌষ্টিকতা কাকে বলে? অতিপৌষ্টিকতাজনিত সমস্যা সমাধানের উপায়গুলি উল্লেখ করুন।

6.13 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

(a) জলে বর্জ্য পদার্থের সংযোগের ফলে জলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণাবলীর পরিবর্তন হয়। এর ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় এবং মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে জলদূষণ বলা হয়।

(b) জলের প্রধান উৎসগুলি হল, বৃষ্টির জল, নদীর জল, ঝরনার জল এবং সমুদ্রের জল।

(c) প্রাকৃতিক উৎসসমূহ যেমন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উদ্ভুত পদার্থ সমূহ, জীবজন্তু ও গাছপালার মৃত্যুজনিত পদার্থ, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি এবং কৃত্রিম উৎসসমূহ যেমন, কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চল থেকে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ, জমিতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক পদার্থ, সমুদ্রে জাহাজ বা অন্য জলযান চলাচলের ফলে জলের উপরিভাগে যে তেলের আবরণ পড়ে এবং মানুষের মলমূত্র ইত্যাদি।

(d) 4-6 ppm

(e) 2.1.2 দেখুন।

(f) 2.1.2 দেখুন।

অনুশীলনী—2

(a) 2.2 দেখুন।

(b) থিতান, তঞ্চন, পরিস্রাবণ ও সংক্রামক জীবাণু দূরীকরণ।

(c) 2.4.3 দেখুন।

(d) 0.05 মিগ্রা/লি

অনুশীলনী—3

(a) 2.6 দেখুন।

(b) 2.6 দেখুন।

(c) 2.7 দেখুন।

(d) 2.8 দেখুন।

(e) 2.10 দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি :

1. ইঙ্গিত—এই রোগ জলের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়;

(a) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা—যেমন ধরুন জল ফুটিয়ে পান করা, জনসাধারণের মধ্যে এ রোগের ভয়াবহতার রূপ ফুটিয়ে তোলা, চিকিৎসকের পরামর্শে প্রতিষেধক ওষুধ গ্রহণ করা, রোগীর মলমূত্র ও বমন ইত্যাদির আশেপাশের জলাশয়ে না ফেলা ইত্যাদি।

(b) সরকারী প্রচেষ্টা—পৌরসংস্থা/গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে হবে—ব্লিচিং পাউডার ছড়ান, গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাৎক্ষণিক কি কি করা উচিত তার পরামর্শ দেওয়া।

3. ইঙ্গিত—প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করলে সেগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নিকটবর্তী জলাশয়ে পড়লে জল দূষিত হবে। তাই বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে জলদূষণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্বাস্থ্য-বিপত্তি সম্বন্ধে চাষীদের সচেতন করতে হবে।

3. 2.1.2 এর (vi) দেখুন।

একক 7 □ বায়ুদূষণ (Air Pollution)

গঠন

7.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

7.1 বায়ুদূষণের উৎসসমূহ

7.2 প্রধান প্রধান বায়ুদূষক গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব

7.2.1 কার্বন মনোক্সাইড

7.2.2 কার্বন ডাইঅক্সাইড

7.2.3 সালফার ডাইঅক্সাইড

7.2.4 নাইট্রোজেন অক্সাইড

7.2.5 বস্তুকণা

7.2.6 বিষাক্ত ভারী উপাদান

7.3 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস প্রভাব

7.3.1 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস কী

7.3.2 সবুজঘরের প্রভাবগুলি কী কী

7.3.3 সবুজঘর গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস

7.3.4 সবুজঘর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ

7.4 অম্লবৃষ্টি

7.4.1 অম্লবৃষ্টির উৎস

7.4.2 অম্লবৃষ্টির প্রভাব

7.4.3 অম্লবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ

7.5 ধোঁয়াশা

7.5.1 কেন ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়

7.5.2 ধোঁয়াশার প্রকারভেদ

7.5.3 ধোঁয়াশার প্রভাব

7.6 ওজোন স্তর

7.6.1 বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের সৃষ্টি

7.6.2 ওজোন স্তরের বিনষ্টি

7.6.3 ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রভাব

7.6.4 ওজোন স্তর রক্ষা

7.7 বায়ুদূষণের কয়েকটি ঘটনা

7.8 বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

7.9 সারাংশ

7.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

7.11 উত্তরমালা

7.0 প্রস্তাবনা

মানুষ ও তার চারপাশের সমস্ত কিছু নিয়েই পরিবেশ গঠিত হয়। বাড়িঘর, গাছপালা, খালবিল, নদনদী, সাগর-মহাসাগর, কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক প্রকল্প ও গবেষণাগার ইত্যাদি সবকিছুই মানুষের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। Natural Environmental Research Council-এর মতে যে সকল পদার্থ ও শক্তি বর্জ্য পদার্থ হিসাবে মানুষ পরিত্যাগ করে এদের মধ্যে যেগুলি পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক পরিবর্তন সাধন করে তাকে দূষণ বলে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থের ঘন সমাবেশ যখন মানুষ ও তার পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় তখন তাকে বায়ুদূষণ বলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ বনভূমি বিলুপ্ত করে, উচ্চভূমিকে সমতল করে, নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করে গ্রাম, শহর, নগর গড়ে তুলছে। সবুজ তৃণভূমি ও শস্যক্ষেত্রের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বড় বড় জাতীয় সড়ক, রেলপথ, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। নিজের প্রয়োজনে বনাঞ্চল বিলুপ্ত করার জন্য পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে।

শিল্পের ব্যাপক প্রসারের ফলেও বায়ু দূষিত হচ্ছে। স্বচ্ছ বায়ু মানুষ ও জীবকুলের জীবনের অন্যতম উপাদান। বাতাসের মধ্যে যে সকল পদার্থ থাকে, তাদের হঠাৎ বৃদ্ধি বায়ুদূষণের সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনারা জানতে পারবেন—

- বায়ুদূষণ কী, আর কারা কীভাবে বায়ুকে দূষিত করছে
- বহুশ্রুত সবুজঘর প্রভাব প্রকৃতপক্ষে কী, সবুজঘর গ্যাসসমূহ কী, এদের উৎসই বা কী। এই প্রভাব নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহও জানতে পারবেন
- অম্লবৃষ্টি কী ও কেন
- ওজোন স্তর কী, কীভাবে সৃষ্ট হয়েছে, কীভাবে এদের বিনষ্টি ঘটছে এবং এই বিনষ্টি পরিবেশকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে
- ইতিহাসে বিধৃত বায়ুদূষণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা
- বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ

7.1 বায়ুদূষণের উৎসসমূহ

প্রাকৃতিক উৎস : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উদ্ভূত ছাই, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসসমূহ; ছত্রাক থেকে ভাইরাস ও সূক্ষ্ম কণা; ভূমিপৃষ্ঠ থেকে দাবানল, ধূলা ও মাটির কণা ইত্যাদি।

অপ্রাকৃতিক উৎস : কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চল থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস; গাড়ি, এরোপ্লেন ও অন্যান্য ইঞ্জিনের ধোঁয়া ও গ্যাস; পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় কণা ও রশ্মি; পৌর আবর্জনা ইত্যাদি।

7.2 প্রধান প্রধান বায়ুদূষক গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব

7.2.1 কার্বন মনোক্সাইড (CO)

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়, বজ্রবিদ্যুৎপাতের সময় কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এছাড়া মোটরগাড়ি থেকে, জ্বলন্ত সিগারেট থেকে, জৈব পদার্থের দহনের ফলে নির্গত ধোঁয়ায় প্রচুর কার্বন মনোক্সাইড থাকে। বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত চুল্লী যেমন, লৌহ-ইস্পাত শিল্প, কয়লা শিল্প থেকে কার্বন মনোক্সাইড বায়ুমণ্ডলে আসে। প্রধানতঃ শহরাঞ্চল এবং

শিল্পাঞ্চলে এই গ্যাসের প্রভাব বেশী দেখা যায়। বাতাসে মোট দূষণকারী পদার্থের 60 শতাংশই হল কার্বন মনোক্সাইড।

ক্ষতিকারক প্রভাব : প্রশ্বাসের সময় কার্বন মনোক্সাইড মানবদেহে প্রবেশ করে এবং রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুস্থিত যৌগ কার্বক্সি-হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে। ফলে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ও বহন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বিপাকীয় বৈকল্য দেখা যায়। এতে কোষের কার্যক্ষমতা কমে যায়। সাধারণতঃ বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ 10-250 ppm হলে মাথা ধরা, দৃষ্টিশক্তিহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ যদি 500 ppm এর বেশী হয়, তাহলে সেই বাতাস গ্রহণ করলে মানুষ ও জীবজন্তুর মৃত্যু হতে পারে।

7.2.2 কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)

কয়লা ও খনিজ তেলের সম্পূর্ণ দহনের ফলে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎপত্তি হয়। সবুজ গাছপালা সালোকসংশ্লেষের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে নিজেদের খাদ্য তৈরী করে। কিন্তু বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে গাছপালা কমে যাওয়ায় বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

ক্ষতিকারক প্রভাব : বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে, তা সৌরশক্তি শোষণ করে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে। একে গ্রীনহাউস এফেক্ট বা সবুজঘর প্রভাব বলে। বাতাসে CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে গেলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমার এবং মাটির আর্দ্রতা লুপ্ত হবার সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়া বাতাসে CO_2 এর পরিমাণ বাড়লে সমুদ্রের জলের অম্লতা বেড়ে যায়, ফলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের ক্ষতি হয়।

7.2.3 সালফার ডাইঅক্সাইড

জীবাশ্ম জ্বালানী ও উচ্চ সালফারযুক্ত কয়লার দহনে, ধাতু নিষ্কাশনে, মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড আসে। এছাড়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচুর সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।

ক্ষতিকারক প্রভাব : শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় মানুষের শরীরে সালফার ডাইঅক্সাইড প্রবেশ করলে হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

বায়ুতে সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে শ্বাসনালীতে জ্বালার সৃষ্টি করে এবং ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া গাছপালা ও উদ্ভিদের পক্ষে অল্প পরিমাণে সালফার ডাইঅক্সাইড সহনযোগ্য কিন্তু বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ বাড়লে জলের অম্লতা বৃদ্ধি পায়, ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। বেশীদিন ধরে সালফার ডাইঅক্সাইড পরিমণ্ডলে থাকলে উদ্ভিদের

ক্লোরোফিল নষ্ট হয়, ফলে উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী ছাড়া সালফার ডাইঅক্সাইড ইট, কাঠ, লোহা, সিমেন্টের কাঠামো, মূর্তি এবং প্রাকৃতিক তন্তুর ক্ষতি করে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বহু ঐতিহ্যবাহী অমূল্য মূর্তি, নিদর্শন যেমন ভারতের তাজমহল এই গ্যাসের ক্ষতিকারক প্রভাবের ফলে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

7.2.4 নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x)

নাইট্রোজেনের নানা অক্সাইড যেমন নাইট্রিক অক্সাইড (NO), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) প্রভৃতি অন্যতম দূষণকারী পদার্থ। এইগুলির মধ্যে নাইট্রিক অক্সাইডই হল প্রধান দূষক। কয়লা, তেল, গ্যাসোলিন প্রভৃতির দহনের ফলে নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি সৃষ্টি হয়। এছাড়া বায়ুমণ্ডলের উচ্চ অংশে তড়িৎ মোক্ষণে, নাইট্রোজেন যৌগ দহনে, আগ্নেয়গিরি থেকে, নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন শিল্প থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

ক্ষতিকারক প্রভাব : বাতাসে নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে ক্যান্সার প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হয়। নাইট্রিক অক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা হ্রাস করে।

বেশী গাঢ়ত্বের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড পাতার কোষ ধ্বংস করে, সালোকসংশ্লেষের হার কমায় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি রোধ করে।

7.2.5 বস্তুকণা

প্রাকৃতিক উৎস যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, টর্নেডো, সাইক্লোন দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বাতাসে আসে। এছাড়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, ধাতু পরিশোধন কেন্দ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে এরূপ কণিকা উৎপন্ন হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ফসলের বর্জ্য পদার্থ দহনের ফলেও প্রচুর কণিকা বায়ুতে আসে। গ্যাসোলিনের দহনে উৎপন্ন টেট্রাইথাইল লেড, কয়লার দহনে উৎপন্ন সিলিকা, অ্যালুমিনা, কার্বন প্রভৃতি কণা বাতাসে দূষণ সৃষ্টি করে।

ক্ষতিকারক প্রভাব : বাতাসে উপস্থিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে ফুসফুস কোষের ক্ষতিসাধন করে। মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে নির্গত সীসার কণা শ্বাসনালীর মাধ্যমে মানুষের

শরীরে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে ব্যাপক ক্ষতি করে এবং স্নায়বিক বৈকল্য দেখা যায়। সীসার কণা রক্তের লোহিত কণিকার উৎপাদন কমায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় সিলিকা মানবদেহে প্রবেশ করলে দীর্ঘস্থায়ী সিলিকোসিস রোগ হয়।

নানাপ্রকার ধাতব কণা বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে জমা হয় এবং মাটির উর্বরতা নষ্ট করে। ধুলি, ধোঁয়াশা প্রভৃতি কণা পাতার পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে উদ্ভিদের CO_2 গ্রহণ ক্ষমতা হ্রাস করে ফলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়।

7.2.6 বিষাক্ত ভারী উপাদান

জীবের পক্ষে ক্ষতিকারক ভারী উপাদানগুলি হল পারদ, সীসা, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি। খননকার্যের মাধ্যমে বা অন্যান্য উপাদান পরিশোধনের মাধ্যমে এগুলির সৃষ্টি হয়।

ক্ষতিকারক প্রভাব : সামান্য পরিমাণে পারদবাষ্প প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হয়। আর্সেনিক গ্রহণ দীর্ঘস্থায়ী ক্যান্সার ও নানাধরনের চর্মরোগের সৃষ্টি করে।

অনুশীলনী—1

(a) বায়ুর তিনটি দূষণকারী উপাদানের নাম করুন।

(b) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে বায়ুদূষণের সংজ্ঞা দিন।

(c) কার্বন মনোক্সাইড কীভাবে মানুষের ক্ষতি করে?

(d) নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড থেকে বৃষ্টিতে কী গ্যাস সঞ্চারিত হয়? বিক্রিয়া দিন।

(e) বাতাসে থাকতে পারে ও ক্যান্সার ঘটায়, এমন বস্তুকণার নাম করুন।

(f) সিলিকোসিস্ রোগ কীসের থেকে ঘটে?

7.3 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস প্রভাব

7.3.1 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস কী?

সবুজঘর হল কাচের তৈরী একটি আবদ্ধ ঘর যার মধ্যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সবুজ গাছপালার চাষ করা হয়। এই ঘরের কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যের দৃশ্য আলোকরশ্মি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে উদ্ভিদ ও মাটিকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত মাটি দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে, কিন্তু এই রশ্মি কাচ ভেদ করে বাইরে আসতে পারে না। ফলে ঘরের মধ্যের তাপমাত্রা বাইরের

তাপমাত্রা থেকে বেশী থাকে। এই সবুজঘরের সাথে প্রকৃতির সবুজ ঘরের তুলনা করা হয়।

সবুজঘর প্রভাব বা প্রকৃতির সবুজ কাকে বলে? বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত CO_2, CO, N_2 প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণের উপর পৃথিবীর তাপমাত্রার ভারসাম্য নির্ভর করে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে CO_2, জলীয় বাষ্পের স্তর আছে তা গ্রীনহাউসের কাঁচের মতো আচরণ করে। মহাশূন্য থেকে আগত সূর্যরশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠে এসে পড়ে কিন্তু পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত রশ্মি বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত CO_2, জলীয় বাষ্প দ্বারা শোষিত হয় ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ে। এই ঘটনাকে সবুজঘর প্রভাব বলে।

7.3.2 সবুজঘরের প্রভাবগুলি কী কী?

তাপমাত্রা বৃদ্ধি : কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাসসমূহ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত সূর্যের অবলোহিত রশ্মি মহাশূন্যে বিকীর্ণ হতে দেয় না। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি : পৃথিবীর তাপমাত্রা 2-4°C বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে। ফলে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং সমুদ্রতীরবর্তী দেশ জলমগ্ন হবে।

জলচক্রের পরিবর্তন : পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের বাষ্পীভবন বৃদ্ধি পাবে এবং পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে যাবে। এর ফলে গরমকালে গরম বাড়বে এবং বর্ষাকালে বৃষ্টি ও বন্যা বেশী হবে। এইভাবে পৃথিবীর জলচক্রের পরিবর্তন হবে।

স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব : পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়লে বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রকৃতির প্রাদুর্ভাব বাড়বে। হাঁপানি ও অ্যালার্জি জাতীয় রোগ বাড়বে।

বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব : উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের জীবনধারণের জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সবুজঘরের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন হ্রাস পাবে, জৈবিক উপাদানও হ্রাস পাবে।

7.3.3 সবুজঘর গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস

কার্বন ডাইঅক্সাইড : সবুজঘর প্রভাবের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভূমিকা সর্বাধিক। বনাঞ্চল

ধ্বংস হওয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির দহনের ফলে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়। মোটারগাড়ি, রেলগাড়ি প্রভৃতিতে ডিজেল এবং গ্যাসোলিনের দহনের ফলেও প্রচুর পরিমাণে CO_2 তৈরী হয়।

মিথেন : পৃথিবী-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য CO_2-এর পর মিথেন (CH_4)-এর স্থান। মিথেন গ্যাসের প্রধান উৎস হল গবাদি পশুপালন কেন্দ্র। ধানক্ষেত, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর বর্জ্যপদার্থ থেকে বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাস আসে। তেল এবং কয়লাখনি থেকেও মিথেন গ্যাস নির্গত হয়।

নাইট্রাস অক্সাইড : নাইট্রোজেন ঘটিত সার, দূষিত জল বিশুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়া থেকে, গাছপালার দহনে, কলকারখানার ধোঁয়া থেকে বাতাসে নাইট্রাস অক্সাইড আসে।

উদ্বায়ী জৈব রাসায়নিক পদার্থ : রঙশিল্প, শুষ্ক ধৌতায়ন প্রক্রিয়া, প্রসাধনী শিল্প থেকে প্রচুর পরিমাণে জৈব রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হয়।

7.3.4 সবুজঘর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ

কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানীর ব্যবহার কমিয়ে সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে সবুজঘর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভভব। ব্যাপক পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ প্রয়োজন কারণ সবুজ গাছপালা সালোকসংশ্লেষের সময় CO_2 গ্যাস গ্রহণ করে, ফলে CO_2-এর সবুজঘর প্রভাব অনেকটা কমে।

7.4 অম্লবৃষ্টি

বৃষ্টির জলে সালফিউরিক, নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক প্রভৃতি অ্যাসিড মিশ্রিত থাকলে তাকে অম্লবৃষ্টি বলে। বাতাসে উপস্থিত SO_2, NO_2 প্রভৃতি গ্যাস জলের সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরাস অ্যাসিড (H_2SO_3), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), নাইট্রাস অ্যাসিড (HNO_2) প্রভৃতি তৈরী করে। এই সকল অ্যাসিড বৃষ্টির সাথে মাটিতে এসে পড়ে।

7.4.1 অম্লবৃষ্টির উৎস

সালফার ডাইঅক্সাইড : সালফার ঘটিত আকরিকের বায়ুতে তাপ জারণের ফলে, সালফার ঘটিত খনিজ তেলের দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণে SO_2 উৎপন্ন হয়। বাতাসের O_2-এর সাথে

SO_2-এর বিক্রিয়ায় SO_3 উৎপন্ন হয়, যাহা বৃষ্টির জলের সাথে মিশে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

$$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$$

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$$

নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড : বিদ্যুৎক্ষরণের সময় বায়ুতে উপস্থিত N_2 এবং O_2 পরস্পর যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড NO উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন NO বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তৈরী করে।

$$N_2 + O_2 \xrightarrow{\text{বিদ্যুৎক্ষরণ}} 2NO$$

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$

নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন শিল্পেও প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং বাতাসে মেশে। বৃষ্টির জলের সাথে এর বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রাস অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং তা বৃষ্টির জলের সাথে মাটিতে এসে পড়ে।

$$2NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3 + HNO_2$$

7.4.2 অম্লবৃষ্টির প্রভাব

জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব : জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জলের নির্দিষ্ট pH মানের (এই pH-এর মান 5.6) উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। অম্লবৃষ্টির ফলে পুকুর, নদী প্রভৃতি জলের pH-এর মান কমে যায়। এর ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের উৎপাদন কমে। অম্লবৃষ্টির প্রভাবে মাটির আম্লিকতা বাড়ে ফলে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যাঘাত ঘটে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়। অম্লবৃষ্টির ফলে নদী তীরবর্তী মাটিতে উপস্থিত অ্যালুমিনিয়াম, তামা, পারদ, সীসাঘটিত যৌগ দ্রবীভূত হয়ে নদীতে এসে পড়ে এবং নদীর জলকে বিষাক্ত করে। এই বিষাক্ত জল গ্রহণ করে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনহানি ঘটে। নদীর জলের অম্লত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের জৈব রাসায়নিক বিভাজন কমে যায় ফলে মাছের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন, ফসফরাস প্রভৃতির পরিমাণ কমে যায়।

মাটির উপর প্রভাব : মাটিতে অম্লের পরিমাণ বাড়ার ফলে উদ্ভিদের শিকড়ে উপস্থিত নাইট্রোজেন আত্তীকারক জীবাণুসমূহের কর্মক্ষমতা কমে যায় ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়, মাটির মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণী ও জীবাণুরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অম্লবৃষ্টির ফলে মাটি থেকে প্রয়োজনীয়

ধাতু Mg, K প্রভৃতি দূরীভূত হয় ও দূষণকারী ধাতু Al, Pb, Cu জমা হয়, ফলে উদ্ভিদের মৃত্যুও ঘটে থাকে।

মানুষের উপর প্রভাব : অম্লবৃষ্টির ফলে মাটিতে উপস্থিত দূষিত কণিকা জলবাহিত হয়ে নদীর জলে মেশে। এই বিষাক্ত জল গ্রহণ করে পেটের অসুখ (বিশেষ করে আন্ত্রিক ক্ষত), মানসিক ভারসাম্যহীনতা, হৃৎপিণ্ড সম্বন্ধীয় নানা জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। অম্লবৃষ্টির ফলে মানুষের ত্বক ও চুলের ক্ষতি হয়।

7.4.3 অম্লবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ

অম্লবৃষ্টি সৃষ্টির প্রধান উৎস যেমন SO_2, NO_2 প্রভৃতি গ্যাসের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কম সালফারযুক্ত জ্বালানী তেল ব্যবহার করে বা বিকল্প শক্তি যেমন সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতি ব্যবহার করে SO_2-এর পরিমাণ কমানো যায়। যে সকল শিল্পে প্রচুর পরিমাণে SO_2, NO_2 প্রভৃতি গ্যাস উৎপন্ন হয়, সেখানে উৎপন্ন গ্যাস ক্ষারীয় দ্রবণ বা প্রলম্ভবন যেমন KOH, CaO, MgO প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করালে আম্লিক গ্যাসগুলি শোষিত হয়ে যায়। ফলে বায়ুতে SO_2, NO_2-এর পরিমাণ কমে।

7.5 ধোঁয়াশা

জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনের ফলে, গাড়ির ধোঁয়া ও অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন নাইট্রোজেন অক্সাইড, CO, অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনসমূহ প্রভৃতি সূর্যালোকের প্রভাবে আলোক-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। ধোঁয়াশার সঙ্গে সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ওজোন প্রভৃতি বায়ুদূষণকারী গ্যাস এবং সীসা, তামার গুঁড়ো, ধুলিকণা প্রভৃতি কঠিন ও তরল কণিকা মিশ্রিত থাকলে ধোঁয়াশা বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

7.5.1 কেন ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 10 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুতে CO_2, SO_2, NO_2 প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বেশী থাকলে সূর্যের আলো ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়ার আগেই এই সকল গ্যাস দ্বারা শোষিত হয়। ফলে উষ্ণতার বিপরীতক্রম হয় অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ ঠাণ্ডা থাকে এবং উপরের বায়ুস্তর গরম থাকে। এইজন্য ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্ট ধোঁয়া, ধুলিকণা প্রভৃতি উপরে উঠতে পারে না। এই ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুতে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়।

7.5.2 ধোঁয়াশার প্রকারভেদ

দূষিত গ্যাস ও অন্যান্য ভাসমান কণার উপস্থিতির উপর ধোঁয়াশাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা : বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে NO_2, হাইড্রোকার্বন উপস্থিত থাকলে সূর্যের আলোর প্রভাবে ওজোন এবং জৈব পার-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই ওজোন, জৈব পার-অক্সাইড, ধূলিকণা প্রভৃতি বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলে।

সালফিউরাস ধোঁয়াশা : বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফিউরিক অ্যাসিডকণা প্রভৃতির সঙ্গে স্থির বাতাস, তাপমাত্রার বিপরীতক্রম ও ঘন কুয়াশা থাকলে সালফিউরাস ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়।

ধূলিকণা ধোঁয়াশা : খনিজ তেলের দহন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন 0.1 মাইক্রন ব্যাসের ছোট ছোট ধূলিকণা যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে, তাকে ধূলিকণা ধোঁয়াশা বলে। সাধারণতঃ শীতকালে এরকম ধোঁয়াশা দেখা যায়।

7.5.3 ধোঁয়াশার প্রভাব

মানুষের উপর : ধোঁয়াশার উপস্থিত O_3 গ্যাস সর্দিকাশি ও ব্রঙ্কাইটিস্ বাড়ায়। ফুসফুসের কর্মদক্ষতা নষ্ট করে। ধোঁয়াশার জারক পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকলে মানুষের বুকের অসুখ দেখা যায়।

উদ্ভিদের উপর : ধোঁয়াশা গাছের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যাহত করে, পাতার উপর সাদা দাগের সৃষ্টি করে, শস্য বিনষ্ট করে।

7.6 ওজোন স্তর

ওজোন হল আঁশটে গন্ধযুক্ত হালকা নীল বর্ণের একটি গ্যাস। এটি অক্সিজেনের একটি রূপভেদ। বাতাসের সকল উচ্চতায় কমবেশি পরিমাণ ওজোন বর্তমান। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের 90 শতাংশ ওজোন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিম্নাঞ্চল অর্থাৎ 20-35 কিলোমিটারের মধ্যে থাকে। এই স্তরকে ওজোনোস্ফিয়ার বলে।

7.6.1 বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের সৃষ্টি

আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে ওজোন উৎপন্ন হয়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে বায়ুর অক্সিজেন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হয়।

$$O_2 \xrightarrow[\text{অতিবেগুনি রশ্মি}]{\text{সূর্যের}} 2O \quad ....(1)$$

এই অক্সিজেন পরমাণু আণবিক অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে ওজোনে পরিণত হয়।

$$O_2 + O \xrightarrow{O_2^* \text{ বা } N_2^*} O_3 + (O_2 \text{ বা } N_2) ....(2)$$

শোষিত শক্তি সম্পন্ন অণু

2 নং বিক্রিয়ায় O_2 বা N_2 থাকা প্রয়োজন, এটি বিক্রিয়াজাত শক্তি শোষণ করে এবং ওজোনকে স্থায়ী করে। এভাবে উৎপন্ন ওজোন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে ধ্বংস হয়ে যায়।

$$O_3 \xrightarrow[\text{অতিবেগুনি রশ্মি}]{\text{সূর্যের}} O_2 + O \quad ....(3)$$

$$O_3 + O \rightarrow 2O_2 \quad .... \quad (4)$$

বায়ুমণ্ডলে এইভাবে ওজোন সর্বক্ষণ তৈরী হচ্ছে এবং বিযোজিত হচ্ছে, ফলে ওজোনের সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। এই ওজোন স্তরের প্রধান ভূমিকা হল মহাশূন্য থেকে আগত ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করা। এখন সাম্যাবস্থায় থাকা ওজোনের পরিমাণ কমে গেলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি ভূ-পৃষ্ঠে চলে আসবে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন নষ্ট হবে।

7.6.2 ওজোন স্তরের বিনষ্টি

ক্লোরিন তত্ত্ব : ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন শীতলকারক বস্তু হিসাবে রেফ্রিজারেটারে, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রে এবং এরোসোল তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। কার্বন, ফ্লুওরিন এবং ক্লোরিন-ঘটিত যৌগগুলিকে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন বলে। এই যৌগসমূহ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির দ্বারা বিনষ্ট হয়ে ক্লোরিন পরমাণু (মুক্ত মূলক) উৎপন্ন করে। এই ক্লোরিন পরমাণু ওজোন অণুকে ভাঙতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

$$CFCl_3\ (g) \xrightarrow[\text{অতিবেগুনি রশ্মি}]{\text{সূর্যের}} CFCl_2 + Cl(g)$$

$$O_3 + Cl \rightarrow ClO + O_2$$

$$ClO + O \rightarrow Cl + O_2$$

মুক্ত Cl পরমাণু পুনরায় ওজোনকে অক্সিজেন অণুতে পরিবর্তিত করে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং একটি ক্লোরিন পরমাণু নিষ্ক্রিয় হওয়ার আগে হাজার হাজার ওজোন অণুকে ধ্বংস করে।

নাইট্রোজেন অক্সাইড তত্ত্ব : কৃষিকাজে রাসায়নিক সার হিসাবে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ ব্যবহৃত হয়। প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে, জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন নাইট্রাস অক্সাইড বাতাসে নাইট্রোজেন এবং নাইট্রিক অক্সাইডে বিশ্লিষ্ট হয়। সার ব্যতীত বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহের উৎস হল অতিস্রব বিমানসমূহ, এই বিমানে জ্বালানীর দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণ NO_x স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ছড়িয়ে পড়ে। এই নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ ওজোনকে ধ্বংস করে।

$$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$$

$$NO + O_2 \rightarrow NO_2 + O$$

$$NO_2 + O_3 \rightarrow NO_3 + O_2$$

$$NO_2 + O \rightarrow NO + O_2$$

NO_3, NO_2 প্রভৃতি মূলক অত্যন্ত সক্রিয় এবং এদের অর্ধায়ুকাল দীর্ঘ হওয়ার ফলে ওজোন বিশ্লিষ্ট হওয়ার হার বৃদ্ধি পায়। এই ক্রিয়া অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকে এবং ওজোন অণুর সংখ্যা কমতে থাকে।

7.6.3 ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রভাব

মানুষের উপর : ওজোন স্তরে ওজোনের পরিমাণ কমে গেলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি ভূপৃষ্ঠে আপতিত হবে, ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়বে এবং ত্বকের ক্যানসারও বাড়বে।

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিতে শরীর বেশীদিন উন্মুক্ত থাকলে মানুষের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে, শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে।

উদ্ভিদের উপর : সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ভূপৃষ্ঠে আপতিত হওয়ার জন্য উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া কমবে এবং শস্যের উৎপাদন কম হবে। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মাটির আর্দ্রতা কমবে, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কমবে।

7.6.4 ওজোন স্তর রক্ষা

ওজোন স্তর ধ্বংসকারী ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের ব্যবহার কমিয়ে ওজোন স্তর রক্ষা করা যায়। বর্তমানে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের পরিবর্তে ফ্লুওরোকার্বন ব্যবহৃত হচ্ছে কারণ এদের থেকে ক্লোরিন মূলক নির্গত হবার সম্ভাবনা নেই, আর তাই ওজোন স্তরের বিনষ্টিও হ্রাস পাবে।

7.7 বায়ুদূষণের কয়েকটি ঘটনা

1930 সালের ডিসেম্বর মাসে বেলজিয়ামের মিউস্ উপত্যকায় বিষাক্ত সালফিউরাস ধোঁয়াশায় 63 জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং প্রায় 600 মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

1952 সালের ডিসেম্বর মাসে লন্ডনে ধোঁয়াশার প্রভাবে প্রায় 4000 লোকের মৃত্যু হয়।

1984 সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরে ইউনিয়ন কার্বাইডের কীটনাশক তৈরীর কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস মিথাইল আইসোসায়ানেটের নির্গমনের ফলে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশী লোকের মৃত্যু হয়।

1995 সালে গরমকালে চিকাগো শহরে সবুজঘরের প্রভাবে প্রায় 465 জন মানুষ প্রাণ হারান।

1986 সালে অম্লবৃষ্টির ফলে ইউরোপের প্রায় 30 হাজার মিলিয়ন হেক্টর বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

7.8 বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রধান উপায় হল দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থগুলির ব্যবহার কমানো এবং তাদের উৎপাদন রোধ করা। বড় বড় শহরে যেখানে অসংখ্য যানবাহন চলাচল করে এবং প্রচুর কলকারখানা আছে সেখানে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে জরুরী। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার কয়েকটি পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হল।

যানবাহন থেকে নির্গত দূষিত গ্যাসসমূহকে প্রথমে উঁচু তাপমাত্রায় প্লাটিনাম, প্যালাডিয়াম প্রভৃতি অনুঘটকের মধ্য দিয়ে পাঠাতে হবে। এর ফলে গ্যাস মিশ্রণে উপস্থিত কার্বন মনোক্সাইডের দ্বারা নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ বিজারিত হয়ে নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। এরপর গ্যাসসমূহকে অতিরিক্ত বাতাসের উপস্থিতিতে নিকেল, আয়রণ বা ম্যাঙ্গানীজ-এর অক্সাইডের মধ্য দিয়ে পাঠাতে হবে। এর ফলে গ্যাস মিশ্রণে উপস্থিত কার্বন মনোক্সাইড এবং অন্যান্য হাইড্রোকার্বনগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে বাতাসে মিশে যাবে।

সালফার ডাইঅক্সাইডের দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান উপায় হল সালফারমুক্ত জ্বালানী ব্যবহার করা। এছাড়া জ্বালানীর দহনের ফলে উৎপন্ন গ্যাসকে সক্রিয় চারকোল, তরল অ্যামোনিয়া, চুনজলের দ্রবণের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়েও সালফার ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস শোষণ করা যায়।

গৃহস্থালী ও কলকারখানায় কয়লা, কাঠ প্রভৃতি জ্বালানীর ব্যবহারের পরিবর্তে তড়িৎশক্তি, সৌরশক্তি ইত্যাদির ব্যবহার বাড়িয়ে দূষণ রোধ করা যায়।

প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করেও বায়ুদূষণ রোধ করা যায়। কারণ উদ্ভিদ বায়ুতে উপস্থিত হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রিক অ্যাসিডবাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং বাতাসে অক্সিজেন সরবরাহ করে।

প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে পরমাণু চুল্লীর আবর্জনা নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হয়েছে। এর ফলে বাতাসে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব কমবে।

প্রতিবছর 4ঠা জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। বেতার, দূরদর্শন এবং সংবাদপত্রে পরিবেশদূষণ সম্পর্কে সতর্কবার্তা প্রচারিত হচ্ছে। মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনধারাকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করতে হলে দূষণ মুক্তির কোনো বিকল্প নেই। এই কথাটি তুললে পৃথিবী একদিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে।

আবার এটাও ঠিক যে দূষণ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, তাই একে সম্পূর্ণ বন্ধ করা অসম্ভভব। তবে হ্যাঁ, একে ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনার চেষ্টা করা প্রয়োজন। পৃথিবী জুড়ে সে চেষ্টা হচ্ছে, এবং আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থে সে চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

অনুশীলনী—2

(a) তিনটি গ্রীনহাউস গ্যাসের নাম করুন।

(b) ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের পরিবর্তে আজকাল কোন্ রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়? কেন?

(c) PAN-এর পুরো নাম কী?

(d) তাজমহলের বাইরের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হচ্ছে কীভাবে?

(e) বায়ুমণ্ডলে ওজোন কীভাবে উৎপন্ন হয়?

7.9 সারাংশ

- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থসমূহের ঘন-সন্নিবেশ যখন মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিকের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে, তখন তাকে বায়ুদূষণ বলে

- সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গো দূষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই দূষণ একেবারে বন্ধ করা সম্ভভব নয়, তবে একে ন্যূনতম মানে রাখার চেষ্টা জীবমণ্ডলের অস্তিত্বের স্বার্থেই প্রয়োজন
- বায়ুদূষণের উৎসসমূহ হল : (i) প্রাকৃতিক—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ছত্রাকসমূহ, দাবানল, ধূলা ও মাটির কণা; (ii) অপ্রাকৃতিক—কলকারখানা, ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাসসমূহ, তেজস্ক্রিয় কণা ও রশ্মি, পৌর আবর্জনা ইত্যাদি
- বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় দূষণকারী পদার্থের 60%ই কার্বন মনোক্সাইড। এটি রক্তের সঙ্গো সুস্থিত জটিল যৌগ উৎপন্ন করে। তাই রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ও পরিবহণ ক্ষমতা কমে যায়
- কার্বন ডাইঅক্সাইড আসে প্রধানতঃ দহন ও শ্বসনের ফলে। এর জন্য সবুজঘর প্রভাবে পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়ে ও জলের অম্লতা বাড়ে
- সালফার ডাইঅক্সাইড আসে সালফারযুক্ত জ্বালানীর দহনে ও অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। এর প্রভাবে ফুসফুসের রোগ এমন কি ক্যান্সারও হতে পারে। অম্লবৃষ্টি সৃষ্টিতেও এর ভূমিকা আছে
- নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ আসে বিভিন্ন জ্বালানীর দহনে, শিল্পক্ষেত্র থেকে বায়ুতে তড়িৎ মোক্ষণের ফলে। এর প্রভাবে ফুসফুসের রোগ ও অম্লবৃষ্টি ঘটে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়
- ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত, শিল্পক্ষেত্র, খনি ইত্যাদি থেকে বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে আসে। এতে চর্মরোগ, স্নায়বিক রোগ ও ফুসফুসের ক্ষতি হয়, অনেক সময় এই ক্ষতি প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে
- সবুজঘর প্রভাব প্রাকৃতিক বায়ুদূষণের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাতাসে CO_2, CO, N_2, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি অন্তরক পদার্থের ঘটিত বেষ্টনী এর জন্য দায়ী। এর প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, জলচক্রের পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে জীবমণ্ডলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে এ সমস্যার নিয়ন্ত্রণ সম্ভভব
- অম্লবৃষ্টি ঘটে বৃষ্টির জলে অম্ল (H_2SO_4, HNO_3, HCl ইত্যাদি)-র উপস্থিতিতে। এর প্রভাবে শস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে, সৌধাবলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বাস্তুতন্ত্রের ধর্মের পরিবর্তন হয়, মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়
- জীবাশ্ম জ্বালানী, গাড়ির ধোঁয়া ও বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে সূর্যালোকের প্রভাবে আলোক-

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়। ধূলিকণা ও সালফার যৌগসমূহও এতে অংশগ্রহণ করে। এর প্রভাবে প্রাণীদের নানারকম রোগ হয়, উদ্ভিদও রোগগ্রস্থ হয় এবং শস্যহানি ঘটে

- বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে সূর্যের থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে অক্সিজেন তার রূপভেদ ওজোনে পরিণত হয়। এই ওজোন স্তর অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিহত করে। শীতক গ্যাস বা এরোসোলের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের বিয়োজন থেকে উদ্ভুত ক্লোরিন মুক্ত মূলক ওজোনকে ক্ষয় করে ওজোন স্তরে গর্ত করে ফেলে। এর মধ্য দিয়ে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীপৃষ্ঠে অবাধে প্রবেশ করে বাস্তুতন্ত্রের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ক্লোরিনঘটিত যৌগের ব্যবহার বন্ধ করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভভব
- বায়ুদূষণের ফলে একাধিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকালয়ের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। 1930 সালে বেলজিয়ামের মিউস্ উপত্যকায়, 1952 সালে লন্ডনে, 1984-তে ভারতবর্ষের ভোপালে, 1986-তে ইউরোপের বনাঞ্চলে ও 1995-এ আমেরিকার চিকাগো শহরে উল্লেখ্য ব্যাপক ক্ষতির ইতিহাস হয়ে আছে
- সারা পৃথিবী জুড়ে বায়ুদূষণ কমাতে প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছেন বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদ্‌রা। ভারতবর্ষও পিছিয়ে নেই।

7.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. বায়ুদূষণ কাকে বলে?
2. বায়ুর প্রধান প্রধান দূষণকারী পদার্থগুলির নাম করুন।
3. বায়ুমণ্ডলে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ কত?
4. বায়ুমণ্ডলে কার্বন মনোক্সাইডের উৎস কী কী?
5. কার্বন মনোক্সাইড কীভাবে জীবের ক্ষতি করে?
6. ধূমপায়ীদের রক্তে কার্বক্সিহিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বেশি কেন?
7. মহিলাদের ধূমপান করা উচিত নয় কেন?
8. বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎস কী কী?
9. বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাইঅক্সাইডের উৎস কী কী?
10. সালফার ডাইঅক্সাইড কীভাবে জীবের ক্ষতি করে?

11. বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের উৎস কী কী?

12. জীবদেহের উপর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের ক্ষতিকারক প্রভাব আলোচনা করুন।

13. বায়ুমণ্ডলে ধুলিকণার উৎস ও তার ক্ষতিকারক প্রভাব আলোচনা করুন।

14. গ্রীনহাউস গ্যাসগুলো কী কী?

15. অম্লবৃষ্টি কীভাবে ঘটে?

16. অম্লবৃষ্টির ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি আলোচনা করুন।

17. আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা বলতে কী বুঝায়?

18. জীবদেহের উপর আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

19. বায়ুমণ্ডলে কীভাবে ওজোন স্তর সৃষ্ট হয়?

20. বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের প্রধান ভূমিকা কী?

21. ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

7.11 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

(a) কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, বালুকা কণা।

(b) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থের ঘন সমাবেশ যখন জীবমণ্ডলের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, তখন তাকে বায়ুদূষণ বলা হয়।

(c) কার্বন মনোক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে সুস্থিত জটিল উৎপন্ন করে, তার ফলে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ও পরিবহণ ক্ষমতা কমে যায়।

(d) নাইট্রিক অ্যাসিড, $3NO_2 + H_2O = 2HNO_3 + NO$

(e) অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ গুঁড়া।

(f) সূক্ষ্ম বালুকা কণা।

অনুশীলনী—2

(a) কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড

(b) ফ্লুওরোকার্বন। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন থেকে যে ক্লোরিন মুক্তমূলক উৎপন্ন হয় তাই ওজোনের বিয়োজনে অনুঘটকের কাজ করে। ফ্লুওরোকার্বন ব্যবহার করলে এই ক্লোরিন মুক্তমূলক গঠনের অবকাশ থাকে না। C—F বন্ধ সুস্থিততর হওয়ায় ফ্লুওরোকার্বন সহজে বিশ্লিষ্ট হয় না।

(c) পারক্সি অ্যাসিটাইল নাইট্রেট।

(d) অম্লবৃষ্টির ফলে ও জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ায় মার্বেল (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ফলে এর ঔজ্জ্বল্য ও মসৃণতা হ্রাস পায়।

(e) সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মি বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের উপর পড়ে। তখন অক্সিজেনের একাংশ ওজোন রূপভেদে রূপান্তরিত হয়।

$$3O_2 \overset{h\nu}{\rightleftharpoons} 2O_3$$

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. যে সকল পদার্থ ও শক্তি বর্জ্য পদার্থ হিসাবে মানুষ পরিত্যাগ করে যারা পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক পরিবর্তন সাধন করে তাহাকে দূষণ বলে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থের ঘন সমাবেশ যখন মানুষ ও তার পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় তখন তাকে বায়ুদূষণ বলে।

2. বায়ুদূষণকারী প্রধান প্রধান পদার্থগুলি হল (i) বিভিন্ন গ্যাস যেমন সালফার ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি; (ii) তেজস্ক্রিয় গ্যাস যেমন র‍্যাডন; (iii) ধূলিকণা, সীসার কণা, ধোঁয়াশা ইত্যাদি।

3. বায়ুমণ্ডল কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ 0.1-0.12 ppm.

4. প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যথা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়, বজ্রবিদ্যুৎপাতের সময় কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এছাড়া মোটরগাড়ি থেকে, জৈব পদার্থের দহনের ফলে, বিভিন্ন শিল্প যেমন লৌহ-ইস্পাত শিল্প, কয়লাশিল্প প্রভৃতিতে ব্যবহৃত চুল্লী থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়।

5. প্রশ্বাসের সময় কার্বন মনোক্সাইড জীবদেহে প্রবেশ করলে, রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে, ফলে রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অক্সিজেনের অভাবে জীবের মৃত্যু ঘটে।

6. সিগারেটের ধোঁয়ায় 400-500 ppm কার্বন মনোক্সাইড থাকে। ধূমপানের সময় ধূমপায়ীদের শরীরে কার্বন মনোক্সাইড প্রবেশ করে এবং রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরী করে।

7. ধূমপানের ফলে মহিলাদের গর্ভধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়, গর্ভবতী মহিলার অসময়ে সন্তান প্রসব এবং বিকলাঙ্গ শিশু প্রসবের সম্ভাবনা থাকে।

8. কয়লা ও খনিজ তেলের দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎপত্তি হয়।

9. অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্রায় 67 শতাংশ সালফার ডাইঅক্সাইড বায়ুতে উন্মুক্ত হয়। এছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনে, ধাতু নিষ্কাশনে, গাড়ির ধোঁয়া থেকে, সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরীর কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে আসে।

10. সালফার ডাইঅক্সাইডের প্রভাবে শ্বাসনালীতে অস্বস্তি ও বায়ু চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি হয়। এর ফলে হাঁপানী, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি রোগের উপসর্গ দেখা যায়। বায়ুতে সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

11. যানবাহন নির্গত বর্জ্য ধোঁয়া, নাইট্রোজেনঘটিত যৌগের দহন, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের প্রধান উৎস।

12. বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট ফুসফুসে ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে।

বেশী গাঢ়ত্বের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের হার কমায়, উদ্ভিদের বৃদ্ধি রোধ করে।

13. প্রাকৃতিক উপায়ে যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সাইক্লোন, টর্নেডো প্রভৃতি থেকে প্রচুর পরিমাণে ধুলিকণা বায়ুতে আসে। এছাড়া ধাতু পরিশোধন কেন্দ্র, জ্বালানীর দহন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে ধুলিকণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আসে।

ক্ষতিকারক প্রভাব ঃ শ্বাসনালীর মাধ্যমে সীসার কণা শরীরে প্রবেশ করলে স্নায়বিক বৈকল্য দেখা যায়, রক্তে লোহিত রক্তকণিকার উৎপাদন হ্রাস করে। এছাড়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় সিলিকা শরীরে প্রবেশ করলে দীর্ঘস্থায়ী সিলিকোসিস্ রোগ দেখা যায়।

14. যে সমস্ত গ্যাসের উপস্থিতির জন্য বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাদের গ্রীনহাউস গ্যাস বলা হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রধান গ্রীনহাউস গ্যাস। এছাড়া জলীয় বাষ্প, মিথেন, ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন (CFC), নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রীনহাউস গ্যাসসমূহ।

15. জীবাশ্ম ঘটিত জ্বালানীর দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে SO_2 গ্যাস নির্গত হয়। ইহা বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) উৎপন্ন

করে। এছাড়া বায়ুতে উপস্থিত নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড জলের সহিত বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। বায়ুতে উৎপন্ন H_2SO_4 অ্যাসিড ও HNO_3 অ্যাসিড বৃষ্টির জলের সহিত মিশে অম্লবৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে আপতিত হয়।

16. অম্লবৃষ্টির ফলে মৃত্তিকার pH হ্রাস পায়, ফলে মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বাস্তুতান্ত্রিক অসাম্যের সৃষ্টি হয়। এছাড়া অম্লবৃষ্টির ফলে স্থাপত্যশিল্প, মনুমেন্ট প্রভৃতির ব্যাপক ক্ষয়ীভবন ঘটে।

17. সূর্যের আলোর প্রভাবে বায়ুতে উপস্থিত নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ এবং হাইড্রোকার্বনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন, অ্যালডিহাইড, কিটোন, PAN এবং জৈব পারক্সাইড প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এইসকল দূষিত পদার্থসমূহ বায়ুমণ্ডলে মিশে আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে।

18. ধোঁয়াশার উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত যৌগ যেমন অ্যালডিহাইড, অ্যাক্রোলীন, পারঅক্সাইল নাইট্রেট চোখের অস্বস্তি বা জ্বালার সৃষ্টি করে। এছাড়া পারক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN) নাকে, গলায় জ্বালা ও বুকে চাপের অনুভূতি সৃষ্টি করে। বায়ুমণ্ডলে ওজোনের সামান্য উপস্থিতি শ্বাসযন্ত্রের সমস্যার সৃষ্টি করে।

19. আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে বায়ুর অক্সিজেন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হয়।

$$O_2 \xrightarrow[\text{অতিবেগুনি রশ্মি}]{\text{সূর্যের}} 2O$$

এই অক্সিজেন পরমাণু আণবিক অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওজোনে পরিণত হয়।

$$O_2 + O \rightarrow O_3 + (O_2 \text{ বা } N_2)$$

20. মহাশূন্য থেকে আগত ক্ষতিকারক রশ্মি শোষণ করা ওজোন স্তরের প্রধান কাজ। বায়ুমণ্ডলে ওজোনের পরিমাণ হ্রাস পেলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠে আপতিত হবে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন ধ্বংস হবে।

21. ওজোন স্তরে ওজোনের পরিমাণ হ্রাস পেলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠে আপতিত হবে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ফলে মানবদেহে ত্বকের ক্যান্সার দেখা যাবে। এছাড়া সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিতে শরীর বেশীদিন উন্মুক্ত রাখলে মানুষের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাবে। শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে।

একক 8 ❑ জ্বালানী (Fuels)

গঠন

8.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

8.1 জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ

8.2 তাপন মূল্য

8.3 কঠিন জ্বালানী

8.3.1 কয়লা—উৎপত্তি ও রাসায়নিক প্রকৃতি

8.3.2 কয়লার শ্রেণীবিভাগ

8.3.3 চূর্ণীকৃত কয়লা

8.3.4 কয়লার অঙ্গারীকরণ

8.4 তরল জ্বালানী

8.4.1 পেট্রোলিয়াম

8.4.2 কঠিন জ্বালানী অপেক্ষা তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধা

8.5 গ্যাসীয় জ্বালানী

8.5.1 প্রোডিউসার গ্যাস

8.5.2 ওয়াটার গ্যাস

8.6 শক্তির বিকল্প উৎস

8.6.1 জৈব গ্যাস

8.6.2 এল্.পি.জি. বা তরলীকৃত খনিজ তেল

8.6.3 গোবর গ্যাস

8.6.4 বায়ুশক্তি

8.6.5 সৌরশক্তি

8.6.5.1 সৌরজল উত্তাপক

8.6.5.2 সৌরপাচক

8.7 সারাংশ

8.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

8.9 উত্তরমালা

8.0 প্রস্তাবনা

সভ্যতার প্রথম সোপান হল মানুষের আগুন জ্বালাতে শেখা। প্রস্তর যুগের (stone age) মানুষ কিভাবে প্রথম আগুন জ্বালতে শিখল তা অবশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায় না। আদিম যুগের মানুষ তিন ভাবে আগুনকে ব্যবহার করত; জল গরম করা, মাংস ঝলসান ও বন্য জীবজন্তুকে ভয় দেখান।

এই আগুন মানুষকে প্রথমে দেয় অন্ধকারে আলো। সেই আলোই হয়ে ওঠে জ্ঞানের আলো। এই আগুন হল শক্তির প্রতীক এবং এর উৎস হল জ্বালানী। যে সমস্ত পদার্থ বাতাসের অক্সিজেনের সম্পূর্ণ দহনের ফলে প্রচুর তাপ ও আলো দেয়, যা গৃহস্থালী ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তাদেরকে জ্বালানী বলে। সাধারণতঃ এই সমস্ত পদার্থে কার্বন প্রধান উপাদান হিসাবে থাকে। যেমন—কাঠ, কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, কোল গ্যাস, গোবর গ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জ্বালানীর উদাহরণ। নিউক্লিয় শক্তিও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে জ্বালানী সম্বন্ধে আপনার স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে। আপনি জানতে পারবেন—

- জ্বালানী তিন প্রকার যেমন—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়
- তাপন মূল্যের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাপন মূল্যের একক
- কঠিন জ্বালানী কয়লার শ্রেণীবিভাগ ও অঙ্গারীকরণ প্রক্রিয়া
- তরল জ্বালানী প্রাকৃতিক পেট্রোলিয়াম কিভাবে শোধন করা হয় এবং বিভিন্ন তাপমাত্রায় প্রাপ্ত পাতিত অংশের ব্যবহার
- প্রডিউসার গ্যাস হল কার্বন মনোক্সাইড (CO) ও নাইট্রোজেনের (N_2) মিশ্রণ এবং ওয়াটার গ্যাস হল কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের (H_2) মিশ্রণ। কঠিন জ্বালানী

উত্তপ্ত কোকের সঙ্গে বায়ুর বিক্রিয়ায় প্রডিউসার গ্যাস এবং উত্তপ্ত কোকের সঙ্গে জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায় ওয়াটার গ্যাস প্রস্তুত করা হয়

- তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধা
- অচিরাচরিত শক্তির উৎস যেমন—সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, গোবর গ্যাস ইত্যাদি
- সৌরশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ যেমন—সৌর জল উত্তাপক ও সৌরপাচক

8.1 জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ

জ্বালানী প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাইমারী বা প্রাকৃতিক জ্বালানী ও সেকেন্ডারী বা কৃত্রিম জ্বালানী। যে সমস্ত জ্বালানী প্রকৃতিতে সরাসরি পাওয়া যায় তাদের প্রাকৃতিক ও যে সমস্ত জ্বালানী প্রাকৃতিক জ্বালানী থেকে প্রস্তুত করে নেওয়া হয় তাদের কৃত্রিম জ্বালানী বলে। ভৌত অবস্থা অনুসারে এদের প্রত্যেককে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। নিম্নে উদাহরণ সহকারে জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হল।

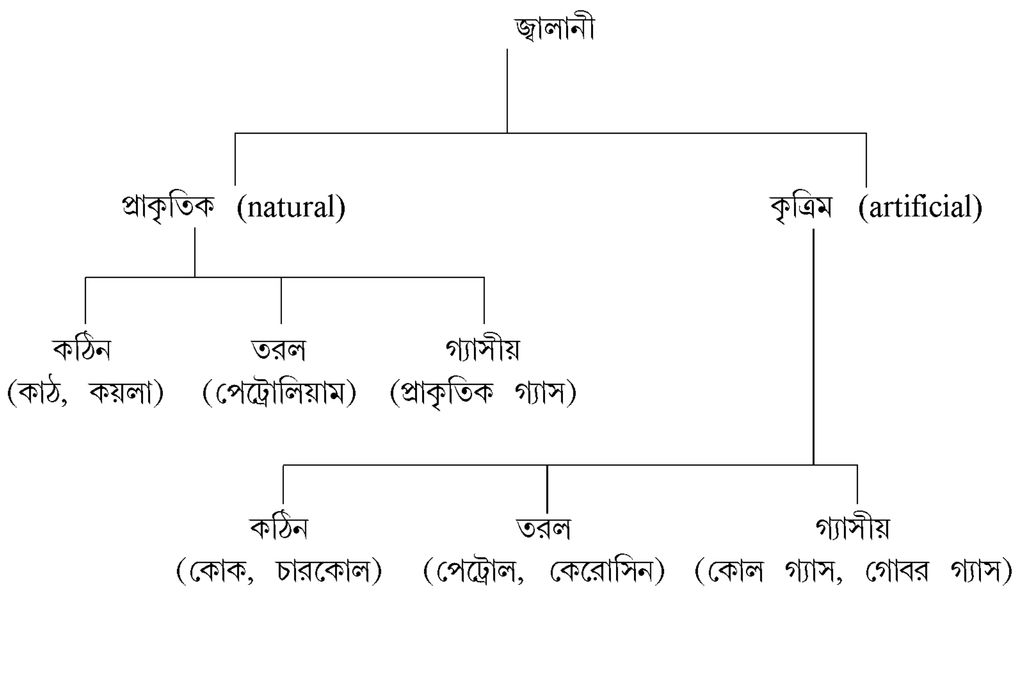

8.2 তাপন মূল্য

জ্বালানীর উৎকর্ষতাকে তাপন মূল্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

কঠিন ও তরল জ্বালানীর ক্ষেত্রে একক ভর এবং গ্যাসীয় জ্বালানীর ক্ষেত্রে একক আয়তন কোন জ্বালানীর বাতাসের অক্সিজেনে সম্পূর্ণ দহনের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাকে ওই জ্বালানীর তাপন মূল্য বলে।

তাপন মূল্যের এককগুলি হল :

(a) কঠিন ও তরল জ্বালানীর ক্ষেত্রে :

ক্যালরি / গ্রাম, কিলো ক্যালরি / কি.গ্রা. এবং বি. টিএইচ. ইউ. / পাউন্ড (B.Th.U./1b) এরা যথাক্রমে 1 গ্রাম বা 1 কি.গ্রা. বা 1 পাউন্ড জ্বালানীর সম্পূর্ণ দহনের ফলে যত ক্যালরি বা কিলো ক্যালরি বা ব্রিটিশ থার্মাল একক তাপ উৎপন্ন হয় সেগুলোকে বোঝায়।

(b) গ্যাসীয় জ্বালানীর তাপন মূল্যের একক :

কিলো ক্যালরি / ঘন মিটার বা বি. টিএইচ. ইউ. / ঘন ফুট। এরা যথাক্রমে 1 ঘন মিটার বা 1 ঘন ফুট জ্বালানীর সম্পূর্ণ দহনের ফলে যত কিলো ক্যালরি বা ব্রিটিশ থার্মাল একক তাপ উৎপন্ন হয় সেগুলোকে বোঝায়। [1B.Th.U. = এক পাউণ্ড জলকে 1 উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপ। এটি তাপের F.P.S. একক। ক্যালরি হল তাপের C.G.S. একক।]

8.3 কঠিন জ্বালানী

প্রাকৃতিক কঠিন জ্বালানী বিভিন্ন ধরণের হতে পারে, যেমন—কাঠ, কয়লা ইত্যাদি। এছাড়া গাছের শুকনো পাতা, আখের ছিবড়েও (চিনির কারখানা থেকে পাওয়া যায়) জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে কয়লা সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব।

8.3.1 কয়লা—উৎপত্তি ও রাসায়নিক প্রকৃতি

উৎপত্তি : কোটি কোটি বছর পূর্বে ফার্ণ, বড় গাছ, গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাত ও মৃত্যুর পর জলাভূমির তলদেশে বিভিন্ন স্তরে জমে থাকত, বাতাস বা অক্সিজেন নির্ভরশীল ব্যাকটেরিয়া

দ্বারা গাছের পচনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন এবং অন্যান্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন যৌগে পরিবর্তিত হয়, যতক্ষণ বাতাসের সংস্পর্শে গাছপালা থাকে। তার ওপর মাটি, বালি ঢাকা পড়ার পর বাতাসের সংযোগ না থাকায় ব্যাকটেরিয়ার কাজ বন্ধ হত। এভাবে বহু বছর থাকার ফলে আংশিক বিযোজিত কাঠ, যা সিক্ত, খুব শক্ত নয়, এমন পদার্থে পরিবর্তিত হল—যাকে পিট (peat) বলে। একটি স্তরের উপর আরেকটি গাছের স্তর, মাটির স্তর ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে থাকার ফলে আরো অনেক বছর পরে পিট আরো শক্ত, কালো পদার্থে পরিণত হয়, যাকে কয়লা বলে।

কয়লা কঠিন জ্বালানীর অন্যতম। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে প্রতি বছরে 4×10^9 টন কয়লা খরচ হয়। তার মধ্যে শুধু ইউ.এস.এ. খরচ করে বছরে 7×10^8 টন।

রাসায়নিক প্রকৃতি : কয়লা অনিয়তাকার মৌল কার্বন, বিভিন্ন পরিমাণ হাইড্রোকার্বন, জটিল জৈব যৌগ এবং অজৈব যৌগ সমন্বিত প্রাকৃতিক দাহ্য পদার্থ।

8.3.2 কয়লার শ্রেণীবিভাগ

রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও তাপন মূল্যের (calorific value) ওপর ভিত্তি করে কয়লার মান নির্ধারণ করে বিভিন্ন ধাপকে চিহ্নিত করা হয়। নিম্নমান থেকে উচ্চমানের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ :

(i) পিট কয়লা

(ii) লিগনাইট কয়লা

(iii) বিটুমিনাস কয়লা

(iv) অ্যানথ্রাসাইট কয়লা

(i) **পিট কয়লা** : এতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ = 80–90% এর উপাদানগুলির ওজন অনুপাত (শুষ্ক অবস্থায়) : কার্বন (C) = 57%, হাইড্রোজেন (H) = 5.7%, নাইট্রোজেন (N) = 2%, অক্সিজেন (O) = 35.3% এর তাপন মূল্য = 5400 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.।

ভারতবর্ষে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানী নয়, ইংল্যান্ড, ইউ. এস. এ. এবং রাশিয়া যেখানে সাধারণ কয়লা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, সেখানে পিট সাধারণ কাজে ব্যবহৃত জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ তৈরীর কাজে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(ii) **লিগনাইট কয়লা** : এতে 20–60% জলীয় বাষ্প থাকে। শুষ্ক অবস্থায় এর উপাদানগুলির ওজন অনুপাত : কার্বন (C) = 67%, হাইড্রোজেন (H) = 5%, নাইট্রোজেন (N) = 1.5% ও অক্সিজেন (O) = 26.5% এর তাপন মূল্য = 6500–7100 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.।

এটি গৃহস্থালীর জ্বালানী এবং শিল্পক্ষেত্রে বয়লারে স্টীম উৎপাদনে ও প্রোডিউসার গ্যাসের শিল্পোৎপাদনে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(iii) **বিটুমিনাস কয়লা** : এর তিনটি বিভাগ।

(a) সাব-বিটুমিনাস কয়লা :

এতে জলীয় বাষ্প ও উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ খুব বেশী। শুষ্ক অবস্থায় উপাদানগুলির ওজন অনুপাত : কার্বন (C) = 77%, হাইড্রোজেন (H) = 5%, নাইট্রোজেন (N) = 1.8% ও অক্সিজেন (O) = 16.2% এর তাপন মূল্য = 7000 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.। এটি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(b) বিটুমিনাস কয়লা :

এতে উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ = 20–45%। শুষ্ক অবস্থায় উপাদানগুলির ওজন অনুপাত : কার্বন (C) = 83%, হাইড্রোজেন (H) = 5%, নাইট্রোজেন (N) = 2% ও অক্সিজেন (O) = 10% এর তাপন মূল্য = 8000–8500 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.। এটি ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত কোক তৈরীতে, কোল গ্যাসের শিল্পোৎপাদনে এবং গৃহস্থালীতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(c) সেমি-বিটুমিনাস কয়লা :

এতে পদার্থের পরিমাণ কম। শুষ্ক অবস্থায় এর উপাদানগুলির ওজন অনুপাত : কার্বন (C) = 90%, হাইড্রোজেন (H) = 4.5%, নাইট্রোজেন (N) = 1.5% ও অক্সিজেন (O) = 4% এর তাপন মূল্য = 8500–8600 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.। এটি কোকের শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

(iv) **অ্যানথ্রাসাইট কয়লা** : এটি সমস্ত প্রকার কয়লার মধ্যে কঠিনতম। উদ্বায়ী পদার্থ 8% থেকে কম। শুষ্ক অবস্থায় এর উপাদানগুলির ওজন অনুপাত : কার্বন (C) = 93.3%, হাইড্রোজেন (H) = 3%, নাইট্রোজেন (N) = 0.7% ও অক্সিজেন (O) = 3% এর তাপন মূল্য = 8650–8700 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.। এটি গৃহস্থালীতে, বয়লারে স্টীম উৎপাদনে এবং ধাতু নিষ্কাশনে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

8.3.3 চূর্ণীকৃত কয়লা

অক্সিজেনের সঙ্গে সার্বিক সংস্পর্শের অভাবে কয়লা তথা যে কোন কঠিন জ্বালানীর দহনের গতি কম হয়। দহনের গতি বাড়ানোর জন্য কয়লাকে সূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত করা হয়, সূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত করলে কয়লার মুক্ত তলের পরিমাণ বেড়ে যায়, কয়লার গুঁড়ো সহজেই বাতাসের সংস্পর্শে

আসে, কয়লাতে উপস্থিত উদ্বায়ী পদার্থগুলি দ্রুত নির্গত হয় এবং স্থিরীকৃত (fixed) কার্বনের দহন দ্রুত হয়। এই সূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত কয়লাকে চূর্ণীকৃত (pulverised) কয়লা বলে।

কয়লা চূর্ণীকরণের সুবিধাগুলি হল :

(a) একে সহজেই স্ক্রু কনভেয়র বা বাতাসের প্রবাহের সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়।

(b) কয়লা গুঁড়োর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে দহনের গতি নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

(c) চূর্ণীকৃত কয়লার দহন প্রয়োজন অনুযায়ী শুরু বা বন্ধ করা যায়।

(d) উচ্চ ছাইযুক্ত নিম্নমানের কয়লাও সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা যায়।

(e) উচ্চ উষ্ণতার সৃষ্টি হয়।

কয়লা চূর্ণীকরণে অসুবিধা :

(a) চূর্ণীকরণের জন্য অতিরিক্ত খরচ হয়।

(b) চূর্ণীকৃত কয়লার দহনের ফলে যে ছাই তৈরী হয় তা খুবই সূক্ষ্ম গুঁড়োর আকারের হয় এবং এর অধিকাংশই নির্গত গ্যাসের সঙ্গো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে পারিপার্শ্বিক অঞ্চল নোংরা ও দূষিত হয়।

8.3.4 কয়লার অঙ্গারীকরণ (Carbonisation of Coal)

বাতাসের অনুপস্থিতিতে বিচূর্ণ কয়লাকে, আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করার ফলে তার অন্তর্ধূম পাতন (destructive distillation) হয় অর্থাৎ উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী অংশে বিভক্ত হয়—এই পদ্ধতিকে অঙ্গারীকরণ বলে। উচ্চ তাপমাত্রায় (1200–1400°C) বা নিম্ন তাপমাত্রায় (600–650°C) অঙ্গারীকরণ ঘটানো যায়, যার ফলে অনুদ্বায়ী পদার্থ হিসাবে কোক এবং উদ্বায়ী অংশ হিসাবে কোল গ্যাস, আলকাতরা, অ্যামোনিয়াযুক্ত জলীয় দ্রবণ উৎপন্ন হয়।

কোকের ব্যবহার : এটি বাড়ীতে জ্বালানী হিসাবে এবং শিল্পে ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয়।

অ্যামোনিয়াযুক্ত জলীয় দ্রবণের ব্যবহার : এটি অ্যামোনিয়া প্রস্তুতিতে বা অ্যামোনিয়াম সালফেট $[(NH_4)_2SO_4]$ নামক সার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

আলকাতরার ব্যবহার : আলকাতরায় বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় জৈব যৌগ দ্রবীভূত থাকে। আংশিক পাতনের সাহায্যে আলকাতরা থেকে এদের পৃথক করা হয়। এই জৈব যৌগগুলির মধ্যে থাকে—বেঞ্জিন, টলুইন, জাইলিন, ফেনল, ন্যাপথ্যালিন ইত্যাদি। পাতনের অবশেষ পিচ রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ্যাস কার্বনের ব্যবহার : শিল্পে তড়িৎদ্বার (electrode) নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

কোল গ্যাস :

কোল গ্যাস হাইড্রোজেন, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড, ইথিলিন, অ্যাসিটিলিন, বেঞ্জিন বাষ্প, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন ইত্যাদি গ্যাসের মিশ্রণ। ইহা প্রধানতঃ জ্বালানীরূপে ও আলোক উৎপাদকরূপে ব্যবহৃত হয়। কয়লার অন্তর্ধূম পাতন করলে এটি উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী দুই প্রকারের পদার্থ সৃষ্টি করে। শৈত্য প্রয়োগে উদ্বায়ী পদার্থের এক অংশ তরলরূপে পৃথক হয়। অবশিষ্ট গ্যাসীয় অংশ কোল গ্যাস নামে পরিচিত। কোল গ্যাসের উৎপাদন খনিজ কয়লার প্রকৃতি ও অন্তর্ধূম পাতনের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

প্রধানতঃ কার্বন মনোক্সাইডের উপস্থিতির জন্য কোল গ্যাস বিষাক্ত হয়।

8.4 তরল জ্বালানী

বিভিন্ন ধরনের তরল জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। যেমন, অ্যালকোহল (power alcohol) পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। এখানে আমরা পেট্রোলিয়াম সম্ভবন্ধে আলোচনা করব।

8.4.1 পেট্রোলিয়াম

পেট্রোলিয়াম হল অশুদ্ধ খনিজ তেল। প্রাণীজ তেল ও চর্বি দীর্ঘদিন মাটির তলায় চাপা পড়ে থেকে উচ্চ চাপ ও তাপের প্রভাবে নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এর সৃষ্টি হয়। এটি গাঢ় সবুজাভ বাদামী বর্ণের উচ্চ সান্দ্রতা বিশিষ্ট (viscous) তরল। এতে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন (কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ) এবং কিছু পরিমাণে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার যুক্ত জৈব যৌগ, যেমন পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান বর্তমান। এতে খুব

সামান্য পরিমাণে ভ্যানাডিয়াম (V), ক্যালসিয়াম (Ca), নিকেল (Ni), আয়রণ (Fe) ইত্যাদি ধাতুর জৈব ধাতব যৌগও (Organometallic) বর্তমান থাকে। এর গড় শতকরা সংযুতি হল :

C = 79.5–87.1, H = 11.5–14.8, S = 0.1–3.5, N + O = 0.1–0.5

পেট্রোলিয়াম থেকে বিভিন্ন নোংরা অপদ্রব্য ও জল অপসারিত করার পর এর আংশিক পাতন করা হয়। বিভিন্ন উষ্মতা রেঞ্জে আংশিক পাতনে প্রাপ্ত উপাদানগুলির নাম ও ব্যবহার নীচে দেওয়া হল :

উষ্ণতা	রেঞ্জ	পাতিত পদার্থ	ব্যবহার
1.	25–30°C	সাইমোজেন গ্যাস	L.P.G. নামে গৃহস্থালী ও শিল্প ক্ষেত্রে জ্বালানী হিসাবে
2.	30–70°C	পেট্রোলিয়াম ইথার	তেল ও চর্বির দ্রাবক হিসাবে
3.	70–120°C	পেট্রোল বা গ্যাসোলিন বা মোটর স্পিরিট	মোটরগাড়ী ও বিমানের জ্বালানী হিসাবে, দ্রাবক ও শুষ্ক ধোলাই কাজে
4.	120–150°C	ন্যাপথা বা সলভেন্ট স্পিরিট	দ্রাবক হিসাবে ও শুষ্ক ধোলাই কাজে
5.	150–300°C	কেরোসিন	জ্বালানী ও আলোকদায়ী পদার্থ হিসাবে
6.	300–350°C	ভারী তেল বা ডিজেল বা গ্যাস তেল	ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানী হিসাবে
7.	350–400°C	তরল প্যারাফিন বা লুব্রিকেটিং তেল	মেশিনের অংশ বিশেষে প্রযুক্ত পিচ্ছিলকারী তেল হিসাবে
8.	> 400°C	ভেসলিন, গ্রীজ ও কঠিন প্যারাফিন বা মোম	মেশিনের ঘর্ষণ নিবারক পদার্থ হিসাবে, প্রসাধনী দ্রব্য ও ওষুধ তৈরীতে
9.	অবশেষ	পেট্রোলিয়াম পিচ এবং অ্যাসফল্ট	রাস্তা তৈরীতে ও জল নিরোধক পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়

8.4.2 কঠিন জ্বালানী অপেক্ষা তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধা

(i) তরল জ্বালানীর তাপন মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী।

(ii) তরল জ্বালানী দহনের সময় কোন ছাই গঠন করে না।

(iii) এর প্রজ্জ্বলন ও নির্বাপণ অনেক সহজ এবং দহন অনেক দ্রুত গতি সম্পন্ন।

(iv) জ্বালানীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে প্রজ্জ্বলিত শিখাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(v) পাইপের মাধ্যমে এর পরিবহণ অনেক সহজ।

(vi) এটি ব্যবহারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সহজ।

(vii) তরল জ্বালানীর দহনের জন্য অনেক কম পরিমাণ বাতাস প্রয়োজন।

(viii) এটি ব্যবহারে শ্রমিক খরচ অনেক কম হয়।

8.5 গ্যাসীয় জ্বালানী

কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের সাহায্যে কোল গ্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোল গ্যাস শিল্পে, পরীক্ষাগারে এবং গৃহস্থালীতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আলোক উৎপাদকরূপেও এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

8.5.1 প্রোডিউসার গ্যাস

শ্বেত-তপ্ত কোকের মধ্যে 1000°C উষ্মতায় পরিমিত পরিমাণে বাতাস চালনা করা হলে তাপ উৎপাদক বিক্রিয়ায় প্রোডিউসার গ্যাস উৎপন্ন হয়।

এর সংযুতি হল (শতকরা হিসাবে)—কার্বন মনোক্সাইড = 20-22, নাইট্রোজেন = 60-65, হাইড্রোজেন = 10-12, মিথেন = 2-3 ও কার্বন ডাইঅক্সাইড = 3-4।

প্রোডিউসার গ্যাসে উৎপন্ন কার্বন মনোক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুপাত উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এর তাপন মূল্য 150 B.Th.U,/1b (বি.টিএইচ.ইউ.,/পাউণ্ড)। এটি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

8.5.2 ওয়াটার গ্যাস

শ্বেত-তপ্ত (1000°C) কোকের মধ্যে দিয়ে স্টীম পাঠালে, তাপশোষক বিক্রিয়ায়, হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইডের মিশ্রণ উৎপন্ন হয় যাকে ওয়াটার গ্যাস বলে।

এর সংযুতি হল (শতকরা হিসাবে) : হাইড্রোজেন = 48, কার্বন মনোক্সাইড = 42, নাইট্রোজেন = 6, কার্বন ডাইঅক্সাইড = 3, মিথেন = 1 এর ক্যালরি-মান (তাপন মূল্য) 300 B.Th.U./ 1b (বি.টিএইচ.ইউ/পাউন্ড)। জ্বালানী হিসাবে, হাইড্রোজেনের উৎস হিসাবে এবং ধাতু শিল্পে বিজারক হিসাবে ওয়াটার গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

8.6 শক্তির বিকল্প উৎস

(i) জৈব দাহ্য পদার্থ (Biomass) : কাঠ, আখের ছিবড়ে এই ধরণের জৈব দাহ্য পদার্থ সেই পুরাকাল থেকে গার্হস্থ্য জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। কিছু কিছু শিল্প প্রক্রিয়ায় কাঠ এবং কাঠের বর্জ্য পদার্থ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই জ্বালানীর মূল অসুবিধা হল দহনজনিত দূষণ।

(ii) জ্বালানী কোষ (Fuel Cell) : কোন যন্ত্র অনড় অবস্থায় বিদ্যুৎ সৃষ্টি করলে সেটি শক্তি উৎপাদনের একটি সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হবে। জ্বালানী কোষ এরকম একটি যন্ত্র। হাইড্রোজেন, প্রাকৃতিক গ্যাস, মিথানল, প্রোপেন ইত্যাদি শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে এই কোষে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। কোষের তাত্ত্বিক দক্ষতা 82.9%.

(iii) কঠিন আবর্জনা (Solid Waste) : বর্তমানে বহু শহরে কঠিন আবর্জনা পুড়িয়ে স্টীম এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। অবশ্য এক্ষেত্রে বায়ুদূষণের ওপর সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(iv) সৌরশক্তি (Solar Energy) : দক্ষিণমুখী জানালার দ্বারা সৌরতাপ দক্ষভাবে সংগ্রহ করে কাজে লাগানো যায়। সৌরতাপ দ্বারা বয়লার চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। দর্পণ ব্যবহার করে বৃহৎ সৌরচুল্লী তৈরী করে তার দ্বারা উচ্চ উষ্ণতা পাওয়া সম্ভব। সৌরউনান গ্রীষ্ম প্রধান দেশে লাভজনক হলেও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়নি।

8.6.1 জৈব গ্যাস (Bio gas)

দূষিত জল বা দূষিত জল বিশোধনের সময়ে প্রাপ্ত আবর্জনার অবায়বীয় জীর্ণকরণ উদ্ভূত গ্যাসকে জৈব গ্যাস বা বায়োগ্যাস বলা যায়। এটা সম্পূর্ণ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মূলতঃ অবায়বীয় জীর্ণকরণ বিক্রিয়ায় CH_4 উৎপন্ন হয় বলে ঘটনাটিকে জৈব মিথেন উৎপাদন নামে অভিহিত করা হয়।

8.6.2 এল. পি. জি. বা তরলীকৃত খনিজ তেল

এর পুরো নাম লিক্যুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস। এল.পি.জি.-তে এমন কিছু উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন থাকে যে উহারা স্বাভাবিক বায়ুমন্ডলীয় চাপে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে, কিন্তু উপযুক্ত চাপের প্রভাবে উহারা তরলে পরিণত হয়। ইহার প্রধান উপাদানগুলি হল : *n*-বিউটেন, আইসোবিউটেন, বিউটেন ও প্রোপেন।

ইহাকে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে বা ভারী তেলের ভাঙ্গানের সময় উপজাত পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায়।

কোন ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ইহার নিঃসরণ (leak) সনাক্ত করার জন্য এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য ইহার সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত জৈব সালফাইড (বিটা-মারক্যাপটান) যুক্ত করা হয়।

এই গ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক নয়, কারণ ইহাতে কোন কার্বন মনোক্সাইড থাকে না।

ইহা গৃহস্থালীতে ও অন্যান্য কিছু যানবাহনের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

8.6.3 গোবর গ্যাস

এই গ্যাসের উপাদানগুলির গড় আয়তনিক সংযুতি হল : মিথেন = 55%, হাইড্রোজেন = 7.4%, কার্বন ডাইঅক্সাইড = 35%, নাইট্রোজেন = 2.6% এবং খুব সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন সালফাইড।

ইহাকে রান্না করার কাজে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

যদি শুষ্ক গোবর (ঘুঁটে) কে সরাসরি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় তবে আবহাওয়া দূষিত হয় এবং উহার দহনের ফলে উত্তাপও অনেক কম পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু গোবর থেকে যদি গ্যাস তৈরী করা যায় তবে উহা থেকে অনেক বেশী পরিমাণে তাপ পাওয়া যায় এবং একই সঙ্গে উপজাত পদার্থ হিসাবে নাইট্রোজেন যুক্ত সার তৈরী হয়।

8.6.4 বায়ুশক্তি

বায়ুশক্তি একটি নবীভবনযোগ্য উৎস। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সমুদ্রতট ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে দিনে বাতাসের বার্ষিক গড় ঘনত্ব 3 kWh/m^2 অর্থাৎ 3 কিলোওয়াট ঘন্টা প্রতি বর্গমিটার প্রতিদিন। কোন কোন স্থানে এই গড় 10$kWh/m^2/day$ এবং বছরের 5-7 মাস অন্ততঃ 4 $kWh/m^2/day$ এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে ভূগর্ভ থেকে জল তোলা হয় এবং টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটর দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। লাদাখে বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ

উৎপাদন হয়। যে সমস্ত স্থানের বায়ুর গতিশক্তি সন্তোষজনক সেখানে ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় অনেক বায়ুকল লাগানো হচ্ছে। আশা করা যায় এই শতাব্দীতে 20% শক্তির ভাণ্ডার পূর্ণ হবে বায়ুশক্তির উৎস থেকে।

প্রাচীনকালে যখন বিদ্যুৎ অধরা ছিল তখন বায়ুশক্তির ব্যবহার ছিল। সমুদ্রে বাণিজ্য ও রণতরীর সঞ্চালন, কাঠ-চেরাই এবং শস্য ভাঙ্গানোর কাজে এই শক্তির ব্যবহার ছিল। বর্তমানে যখন অন্যান্য শক্তি অপ্রতুল হয়ে উঠছে তখন বায়ুকল আবার ব্যবহার হচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের তিন শাখা বিশিষ্ট বায়ুকল সেকেণ্ডে 10 মিটার হওয়ার গতিবেগে 5000 ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে।

আমেরিকায় সাইকেল চাকার টারবাইন বেশী ব্যবহার হয়। বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশ এবং বিকাশশীল দেশগুলি বায়ুকলের গবেষণায় রত।

ভারতের দক্ষিণে এবং উড়িষ্যায় উইণ্ড ফার্ম আছে এবং প্রায় 600 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এগুলি থেকে উৎপাদন হয়। ভারতে এই শক্তি থেকে 2000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভভব।

8.6.5 সৌরশক্তি

শক্তির সংকট আসলে সভ্যতার সংকট। তাই সভ্যতা যখন বিপন্ন তখন বিকল্পশক্তি বা অপ্রচলিত শক্তির দিকে আমরা তাকাই। বিকল্পশক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের বিপুল শক্তির ভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়াতেই হয়। সূর্যরশ্মির সাহায্যে সরাসরি পৃথিবীতে যে বিপুল আলো ও তাপ আসে তার প্রত্যক্ষ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই। পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটার স্থানে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পাওয়া যায় তার পরিমাণ প্রায় 1.3 কিলোওয়াট বিদ্যুতের সমান। যদি আমরা পতিত সূর্যরশ্মির একটা বড় অংশ চিরাচরিত শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি তবে শক্তির সংকট থাকবে না। যেহেতু সৌর বিকিরণে পাওয়া সৌরশক্তিকে ব্যবহারের উপযুক্ত করার সঠিক প্রযুক্তি নেই এবং এই শক্তিকে সরাসরি অন্য শক্তি যেমন বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় না, তা না হলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট প্রয়োজনীয় শক্তি 32 মিনিটের সৌর বিকিরণেই পাওয়া যেত।

সৌরশক্তি অনিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন নয় ফলে রাতের বেলা বা মেঘলা আকাশে একে পাওয়া যায় না। যদিও শক্তির উৎস হিসাবে সূর্যরশ্মির ক্ষমতা অসীম কিন্তু এর ব্যবহার ও প্রয়োগের সীমাবদ্ধতাই সৌরশক্তি উৎসের প্রধান অন্তরায়। অতএব আধুনিক বিজ্ঞানের একমাত্র চিন্তা সৌরশক্তির ব্যবহারে নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার। এ পথেই মিলবে শক্তির সংকটের থেকে উদ্ধার হওয়ার চাবিকাঠি। তাছাড়া সৌরশক্তি পরিবেশমিত্র বলে পরিবেশ দূষণের কোনও সম্ভভাবনা নেই।

8.6.5.1 সৌরজল উত্তাপক (Solar Water Heater)

তাপশোষককারী চ্যাপ্টা ধাতুর পাত সৌরশক্তি সংগ্রাহক হিসাবে কাজ করে। এই ধাতুর একপ্রান্ত তাপের কুপরিবাহী পদার্থ দিয়ে মোড়া থাকে, ফলে সম্মুখের অংশ সৌরতাপ শোষণ ও বিকিরণ করে। তাপ নিরোধক প্রাচীরে মোড়া জলাশয়ের সঞ্চিত জলে তাপ সংরক্ষিত থাকে। জলাধার থেকে জল একটি নল দিয়ে সংগ্রাহকে যায় এবং আবার জলাশয়ে ফিরে আসে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে জলের পরিমাণ, গতি এবং সংগ্রাহকের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে। 2.3 বর্গমিটার সংগ্রাহকে প্রতিদিন 100 লিটার গরম জল (60-80°C) পাওয়া যেতে পারে।

8.6.5.2 সৌরপাচক (Solar Cooker)

সৌরপাচক এক প্রকার বাক্স। যার মধ্যে সূর্যকিরণ থেকে সংগৃহীত তাপ ব্যবহার করে রান্না করা হয়। ফলে কোন প্রচলিত জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না। সৌরপাচকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিম্নলিখিত :

সুবিধা :

(i) জ্বালানী সাশ্রয় ও দূষণ প্রতিরোধ

(ii) কম তাপমাত্রার ফলে খাদ্যগুণ বজায় থাকা

(iii) শ্রমের সাশ্রয় হয়

(iv) দুর্ঘটনার সম্ভভাবনা নেই

(v) রান্না 4-5 ঘণ্টা গরম থাকে

অসুবিধা :

(i) রাত্রে, মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে রান্না সম্ভভব নয়

(ii) রুটি বা ভাজা করা যায় না

(iii) আর্থিক দিক দিয়ে সৌরপাচক দামী

8.7 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি যা যা জানতে পেরেছেন সেগুলি হল—

● জ্বালানীর সংজ্ঞা ও জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ

- কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানীর উদাহরণ
- তাপনমূল্যের সংজ্ঞা এবং তাপনমূল্যের বিভিন্ন একক
- প্রকৃতিতে কয়লা কিভাবে উৎপন্ন হয়; বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার মধ্যে কোনটির তাপনমূল্য সবচেয়ে বেশি এবং কেন
- পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলের মধ্যে পার্থক্য
- তরল জ্বালানীর সুবিধা
- কোল গ্যাস, প্রোডিউসার গ্যাস ও ওয়াটার গ্যাস কি কি গ্যাসের মিশ্রণে তৈরী
- অচিরাচরিত শক্তির কয়েকটি উৎস
- সৌরশক্তির ব্যবহার

8.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

(i) জ্বালানীর প্রধান ভাগগুলি উল্লেখ করুন।

(ii) তাপনমূল্য কাকে বলে?

(iii) বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার নাম লিখুন।

(iv) অ্যানথ্রাসাইট কি? এর মূল ব্যবহার কি?

(v) কয়লার অঙ্গারীকরণ প্রক্রিয়া বলতে কি বোঝেন?

(vi) আলকাতরা ও গ্যাসকার্বনের ব্যবহার উল্লেখ করুন।

(vii) প্রোডিউসার গ্যাস ও ওয়াটার গ্যাস কিভাবে প্রস্তুত করা হয়? এই গ্যাস দুটিতে কি কি গ্যাসের মিশ্রণ থাকে?

(viii) অপরিশুদ্ধ পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে উদ্ভূত মূল পদার্থগুলির নাম, তাপমাত্রা উল্লেখ করে লিখুন। যে কোন দুটির ব্যবহার উল্লেখ করুন।

(ix) কঠিন জ্বালানী অপেক্ষা তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

(x) জ্বালানী কোষ কি?

(xi) জৈব গ্যাস বলতে কি বোঝেন?

(xii) এল. পি. জি.-এর পুরো নাম কি? এই গ্যাসে সামান্য পরিমাণ জৈব সালফাইড মেশান হয় কেন?

(xiii) সৌর জল উত্তাপক কি? সৌরপাচকের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

2. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

(i) নীচের মৌলগুলির মধ্যে কোনটি কয়লার তাপনমূল্য কমিয়ে দেয়?

(a) কার্বন

(b) অক্সিজেন

(c) হাইড্রোজেন

(d) সালফার

(ii) কার্বনের সর্বাধিক শতকরা পরিমাণ কোন্ কয়লাতে পাওয়া যায়?

(a) অ্যানথ্রাসাইট কোল

(b) বিটুনিমাস কোল

(c) পিট

(d) লিগনাইট

(iii) একটি নমুনা কয়লার তাপনমূল্য বেশি হবে যদি উহার—

(a) জলীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে

(b) উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে

(c) কার্বনের পরিমাণ বেশি থাকে

(iv) যে জ্বালানী হাইড্রোজেনের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে তা হল—

(a) প্রোডিউসার গ্যাস

(b) প্রাকৃতিক গ্যাস

(c) কোল গ্যাস

3. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

   (a) ওয়াটার গ্যাসের তাপনমূল্য প্রোডিউসার গ্যাসের তাপনমূল্য অপেক্ষা ———।

   (b) ——— শিল্পের উপজাত পদার্থ হল নিঃশোষিত চুন।

8.9 উত্তরমালা

1. (i) 1.3 দেখুন।

   (ii) 1.2 দেখুন।

   (iii) 1.3.2 দেখুন।

   (iv) 1.3.2 দেখুন।

   (v) এবং

   (vi) 1.3.4 দেখুন।

   (vii) 1.5.1 এবং 1.5.2 দেখুন।

   (viii) 1.4.1 দেখুন।

   (ix) 1.4.2 দেখুন।

   (x) 1.6 এর (ii) দেখুন।

   (xi) 1.6.1 দেখুন।

   (xii) 1.6.2 দেখুন।

   (xiii) 1.6.5.1 এবং 1.6.5.2 দেখুন।

2. (i) (খ)

   (ii) (ক)

   (iii) (গ)

   (iv) (খ)

3. (a) বেশি

   (b) কোল গ্যাস।

একক 9 □ সাবান ও পরিষ্কারক (Soaps and Detergents)

গঠন

9.0 উদ্দেশ্য

9.1 প্রস্তাবনা

9.2 উৎপাদন

9.3 সাবানের শ্রেণীবিভাগ

9.4 সাবান প্রস্তুতি

9.4.1 সাবান প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি

9.4.2 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

9.4.3 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

9.5 সাবানের ধর্ম

9.6 প্রসাধনী সাবান

9.7 তরল সাবান

9.8 সাবানের কার্যকারিতা

9.9 পরিষ্কারক

9.10 পরিষ্কারকের কার্যকারিতা

9.11 পরিষ্কারক ও সাবানের মধ্যে পার্থক্য

9.12 সারাংশ

9.13 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

9.14 উত্তরমালা

9.0 উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য ঃ

আমাদের শরীর ও পরিধেয়সামগ্রী পরিষ্কার রাখার জন্য সাবান, পরিষ্কারক ও জল ব্যবহার করি। এই এককটি পাঠ করলে আপনি এদের রসায়ন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। যেসব তথ্য আপনি জানতে পারবেন সেগুলি হল ঃ

- সাবানের রাসায়নিক সংকেত
- সাবানীভবন বিক্রিয়া কাকে বলে
- সাবান প্রস্তুতির জন্য কি কি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের প্রয়োজন
- সাবান শিল্পে রঞ্জক ও সুগন্ধি দ্রব্যের প্রয়োজন হয় কেন
- তরল সাবানের উল্লেখযোগ্য কাঁচামালগুলি কি কি
- সাবানের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা
- পরিষ্কারক প্রস্তুতিতে কি কি রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়
- পরিষ্কারক ও সাবানের মধ্যে পার্থক্য
- মৃদু জল ও খর জল বলতে কি বোঝায়
- খর জলে সাবান ব্যবহার করলে সহজে ফেনা হয় না এবং সাবানের অপচয় হয়; কিন্তু পরিষ্কারক খর জলে ব্যবহার করা যায়। এর কারণ কি
- খর জল মৃদু জলে পরিণত করার পদ্ধতিগুলি কি কি
- গৃহস্থালী কার্যে বা শিল্পে খর জল ব্যবহার করলে কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হয়
- জলের খরতার মাত্রা প্রকাশের এককগুলি কি কি

9.1 প্রস্তাবনা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিধেয় ও অন্যান্য বস্ত্র পরিষ্কারের কাজে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা ও শরীরের ময়লা দূর করতে যা আমরা সব সময় ব্যবহার করি তাহা হল সাবান। সাবান শিল্প একটি অতি প্রাচীন শিল্প। ইহার ব্যবহার 2500 বৎসর পূর্ব হতে চলে আসছে। মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমান নাম ইরাক) সাবান ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আধুনিক সাবান প্রস্তুতির কাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু হলেও রোমান রাজাদের রাজত্বকালেও ইহার ব্যবহার জানা ছিল। তখন জন্তু-জানোয়ারের চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কাঠের ভস্ম মিশিয়ে সাবান প্রস্তুত করা হত যাহা পরিধেয় বস্ত্র কাচা ও পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্য মানুষ তাদের আরাম ও স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে ও পরিধেয়সামগ্রী পরিষ্কারের জন্য এই শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছে।

9.1 উৎপাদন

সাবান এক প্রকার জৈব লবণ যা উদ্ভিজ্জ তেল অথবা প্রাণীজ চর্বির সঙ্গে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশের (ক্ষার) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। তেল ও চর্বি থেকে প্রাপ্ত গ্লিসারাইডসমূহকে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম ঘটিত লবণ (সাবান) পাওয়া যায় এবং গ্লিসারল (প্রোপেন-1,2,3-ট্রাইঅল) উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিজ্জ তেল বা প্রাণীজ চর্বি + কস্টিক সোডা $\xrightarrow{\text{উত্তপ্ত}}$ সিলটিং
ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ (সাবান) + গ্লিসারল

উদ্ভিজ্জ তেল অথবা জীবজন্তুর চর্বির (গ্লিসারাইড) সঙ্গে ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তেল বা চর্বির অণুগুলি সাবানে রূপান্তরিত হয় এবং গ্লিসারল মুক্ত হয়। এই বিক্রিয়ায় কিছুটা তাপের উৎপত্তি হয়। তেল বা চর্বির সঙ্গে ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তেল বা চর্বি যে পদ্ধতিতে সাবানে রূপান্তরিত হয় সেই পদ্ধতিকে সাবানীকরণ (saponification) বলে। ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে সোডা সাবান ও পটাশিয়াম লবণকে পটাশ সাবান বলে অবহিত করা হয়।

সাবান উৎপাদনের জন্য সাবানীভবন বিক্রিয়াকে তিনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা—

1. প্রশম তেল সাবানীভবন—স্টীল নির্মিত পাত্রে তেল ও কস্টিক সোডা স্টীম-এর উপস্থিতিতে 3-4 ঘণ্টা ধরে আর্দ্রবিশ্লেষিত করা হয় এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে সাবান পৃথক করা হয়।

   গ্লিসারাইল স্টিয়ারেট + কস্টিক সোডা ⟶ সোডিয়াম স্টিয়ারেট + গ্লিসারল
   (উদ্ভিজ্জ তেল) (সোডা সাবান)

2. আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় চর্বিকে বিয়োজিত করে ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপাদন ও উদ্ভুত ফ্যাটি অ্যাসিডের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষার মিশ্রিত করে প্রশমিত করলে সাবান উৎপন্ন হয়।

   গ্লিসারাইল স্টিয়ারেট + জল $\xrightarrow{\text{উত্তাপ}}$ ফ্যাটি অ্যাসিড + গ্লিসারল
   (চর্বি)

   ফ্যাটি অ্যাসিড + কস্টিক সোডা ⟶ সোডিয়াম স্টিয়ারেট + জল
   (সাবান)

3. মিথাইল এস্টারের সাবানীভবন—বিক্রিয়ার প্রথমে মিথাইল এস্টার তৈরি করা হয় এবং পরে সাবানীভবন প্রক্রিয়ায় সাবান উৎপাদন করা হয়।

   গ্লিসারাইল স্টিয়ারেট + মিথানল ⟶ মিথাইল এস্টার + গ্লিসারল
   (চর্বি বা তেল)

   মিথাইল এস্টার + কস্টিক সোডা ⟶ সোডিয়াম স্টিয়ারেট + মিথানল
   (সাবান)

9.3 সাবানের শ্রেণীবিভাগ

ব্যবহারিক দিক দিয়ে সাবানকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায় ঃ

1. প্রসাধনী সাবান (toilet soap)
2. কাপড়কাচা সাবান (washing soap)
3. তরল সাবান (liquid soap)
4. দাড়ি কামানোর সাবান (shaving soap)

সাবানকে উপাদানগতভাবে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

1. কঠিন সাবান (hard soap)—সাবানের মধ্যে যদি সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের (যেমন পামিটিক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড) সোডিয়াম লবণ বেশি মাত্রায় থাকে তবে ঐ সাবানকে কঠিন সাবান বলে।
2. কোমল সাবান (soft soap)—সাবানের মধ্যে যদি অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের (যেমন ওলেয়িক অ্যাসিড, লিনোলেনিক অ্যাসিড) পটাশিয়াম বেশি মাত্রায় থাকে তবে ঐ সাবানকে কোমল সাবান বলে।

9.4 সাবান প্রস্তুতি

সাবান প্রস্তুতির দুইটি মূল বিষয় 1. সাবানীকরণ প্রক্রিয়া এবং 2. উৎপন্ন সাবানের সঙ্গো বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সমসত্ত্বভাবে মেশানো।

9.4.1 সাবান প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি

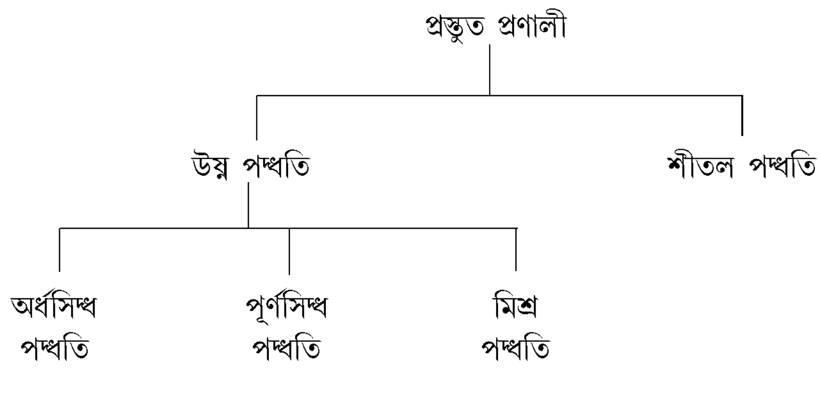

1. উষ্ন পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সাধারণত প্রসাধন সাবান ও কাপড় কাচার সাবান প্রস্তুত করা হয়। উষ্ন পদ্ধতিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা (a) অর্ধসিদ্ধ পদ্ধতি, (b) পূর্ণসিদ্ধ পদ্ধতি, (c) মিশ্র পদ্ধতি।
2. শীতল পদ্ধতি—স্বচ্ছ বা বিশেষ ধরণের সাবানের জন্য সাধারণত শীতল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

9.4.2 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

সাবান প্রস্তুতির জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় ঃ

1. কড়াই বা বর্তমানে স্টীলনির্মিত সাবান-কেটলী (পনের-তিরিশ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট, আট-দশ ফুট গভীর পাত্র)
2. আলোড়ক খুন্তি বা কাঠের তাড়ু বা বর্তমানে স্বছিদ্র স্টীম কুণ্ডলী
3. উনান তৎসহ জ্বালানী
4. বালতি
5. মগ
6. হাইড্রোমিটার যন্ত্র
7. মাপক চোঙ
8. স্টেনলেশ স্টীলের ছুরি
9. তুলাদণ্ড ও বাটখারা
10. সাবান জমাইবার পাত্র
11. কস্টিক সোডা রাখিবার পাত্র
12. সাবানে ছাপ লাগানোর যন্ত্র
13. কাঠের ট্রে
14. ডাইস
15. মোড়ক দ্রব্য ইত্যাদি

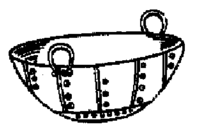

ফুটাইবার যন্ত্র
চিত্র 1

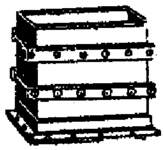

জমাইবার পাত্র
চিত্র 2

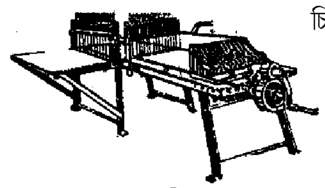

সাবান কাটিবার যন্ত্র
চিত্র 3

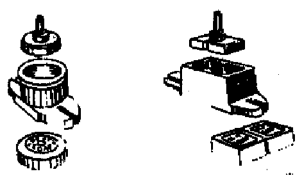

গোল সাবানের ছাঁচ কেক সাবানের ছাঁচ
চিত্র 4

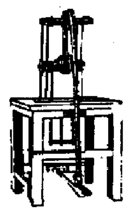

ছাপ লাগাইবার যন্ত্র
চিত্র 5

9.4.3 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

সাবান প্রস্তুতির জন্য দুইটি প্রধান উপাদান নিম্নে দেওয়া হল ঃ

1. উদ্ভিজ্জ তেল অথবা প্রাণীজ চর্বি (ত্রি-গ্লিসারাইড)। এদের প্রধান উৎস—
   (a) গো-চর্বি (শতকরা 75-80 ভাগ)
   (b) ভেড়ার চর্বি
   (c) শূকরের চর্বি ইত্যাদি এবং
   (d) নারকেল তেল (শতকরা 15-25 ভাগ)
   (e) মহুয়া তেল
   (f) বাদাম তেল
   (g) পাম, কার্ণাল তেল প্রভৃতি নন্-ডাইং অয়েল

2. ক্ষারজাতীয় পদার্থ—যেমন কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ। কস্টিক সোডার উৎস ক্লোরিন শিল্প। সাবান-শিল্পে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাঁচামালগুলি যথাক্রমে—
   (a) জল একটি মূল্যবান উপাদান। ইহা তেল এবং ক্ষারের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে।
   (b) ধারক হিসাবে সোডিয়াম সিলিকেট, সোডা অ্যাশ, ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট, সাইট্রেট লবণ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
   (c) ফিলার হিসাবে ট্যালক্, স্টার্চ ইত্যাদি।
   (d) সুগন্ধি দ্রব্য হিসাবে পাইন তেল, ল্যাভেন্ডার তেল, লেমনগ্রাস তেল, সিট্রেনিলা তেল, স্যান্ডেল তেল, ক্লোভ তেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
   (e) লবণ—তেল ও ক্ষারের মিশ্রণ থেকে গ্রেন সোপ প্রস্তুত করার জন্য লবণের ব্যবহার করা হয়। লবণ তেলের মধ্যস্থ গ্লিসারিন ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় জিনিস আলাদা করতে সাহায্য করে।
   (f) রঞ্জক দ্রব্য—সাবানকে দৃষ্টি আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ যেমন, ইয়োসিন (বেগুণী রং), আলট্রামেরিন ব্লু (নীল রং), টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড (সাদা রং) যোগ করা হয়। সোপস্টোন পাউডার সাবানের ওজন বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

9.5 সাবানের ধর্ম

1. উন্নতমানের সাবান শক্ত এবং সুগন্ধযুক্ত হয়। 2. সাবান জলে সহজে দ্রবীভূত হয়। 3. সাবান জৈব দ্রাবকেও দ্রাব্য কিন্তু কেরোসিন বা পেট্রোলে দ্রবীভূত হয় না। 4. জলের সঙ্গে প্রচুর ফেনা উৎপন্ন করে।

বিভিন্ন প্রকার তেল থেকে উৎপন্ন সাবান বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। নারকেল তেল, বাদাম তেল থেকে উৎপন্ন সাবান সহজে দ্রবীভূত হয় কিন্তু মহুয়া তেলের সাবান সহজে দ্রবীভূত হয় না।

9.6 প্রসাধনী সাবান

প্রসাধনী সাবান প্রস্তুতির জন্য সাধারণত—

(i) নারকেল তেল/বাদাম তেল/ক্যাস্টর তেল

(ii) কস্টিক সোডা

(iii) অ্যালকোহল

(iv) রঞ্জক পদার্থ

(v) সুগন্ধি পদার্থ

নেওয়া হয়।

সাবান-কেটলীতে চর্বি ও তেলকে বিগলিত করার পর কস্টিক সোডা যোগ করা হয় এবং স্টীমের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। আর্দ্রবিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হলে রঞ্জক পদার্থ যোগ করা হয় এবং পুনরায় উত্তপ্ত করা হয়। অবশেষে সুগন্ধি পদার্থ যোগ করে জমাবার পাত্রে ঢেলে সাবানের কেক তৈরি করা হয়।

9.7 তরল সাবান (Liquid Soap)

ফ্যাটি অ্যাসিডের পটাশিয়াম লবণসমূহ স্বাভাবিক উষ্ণতায় তরল অবস্থায় থাকে বলে এই লবণসমূহকে তরল সাবান বলা হয়।

তরল সাবান তৈরি করার জন্য নীচে উল্লিখিত কাঁচামালের প্রয়োজন ঃ

(i) নারকেল তেল

(ii) কস্টিক পটাশ

(iii) চিনি

(iv) বোরাক্স

(v) গ্লিসারিন

(vi) জল

(vii) সুগন্ধি দ্রব্য

(viii) রঞ্জক পদার্থ

প্রণালী ঃ সাবান-কেটলীতে নারকেল তেল ও পটাশ লেই (25%) 50° সে. উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা হয় এবং ভালভাবে মিশ্রিত করা হয়। উত্তপ্ত অবস্থায় নারকেল তেল কস্টিক পটাশ দ্রবণ দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় এবং প্রচুর ফেনা উৎপন্ন হয়। সাবানীভবন সম্পূর্ণ হলে চিনি, বোরাক্স, গ্লিসারিন এবং পরিমাণ মত জল মেশান হয়। এরপর এই মিশ্রণকে ভালভাবে আলোড়িত করে সমসত্ত্ব মিশ্রণে পরিণত করা হয়। এবার মিশ্রণের মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্য ও রঞ্জক পদার্থ যোগ করা হয় এবং ভালভাবে মিশিয়ে পরিস্রাবণ করা হয়। প্রাপ্ত পরিস্রুত তরলকে বোতলে সংগ্রহ করা হয়।

বর্তমানে প্রসাধনে ও কাপড় কাচার কাজে তরল সাবান ব্যবহার করা হয়।

9.8 সাবানের কার্যকারিতা

সাবান সাধারণত জামাকাপড়ে আটকে থাকা তেল ও চর্বিকে এবং মানুষের দেহের ত্বকে সেঁটে থাকা ময়লা অপসারণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই ময়লা বা তেল, চর্বি অপসারণের জন্য জলের প্রয়োজন হয়। সাবানের গঠনাকৃতিতে দুটি প্রধান অংশ বর্তমান—একটি জল আকর্ষী বা জল সন্ধানী ধ্রুবীয় অংশ এবং অন্যটি জল বিকর্ষী বা জলাতঙ্কী অধ্রুবীয় হাইড্রোকার্বন অংশ। ধ্রুবীয় প্রান্ত জলে দ্রবণীয় এবং অধ্রুবীয় প্রান্ত তেলে দ্রবণীয়। সাবানের অধ্রুবীয় প্রান্ত সরল কার্বন শৃঙ্খল ঘটিত হাইড্রোকার্বন বা বেঞ্জিন প্রতিস্থাপিত হাইড্রোকার্বন দ্বারা গঠিত। এবং ধ্রুবীয় অংশ অপরাধর্মী আয়ন, পরাধর্মী আয়ন বা পরা বা উভয়ধর্মী আয়ন দ্বারা গঠিত হতে পারে। সুতরাং সাবান একইসঙ্গে পরিধেয় সামগ্রী থেকে বা শরীর থেকে তেল জাতীয় পদার্থ ও জল উভয়কেই গ্রহণ করে এবং বৃহদাকার অনুসমষ্টি মিসেলি (micelle) গঠন করে। যার

আকার কলয়েড কণার মত (সূক্ষ্ম কণা যা ছেঁকে পৃথক করা যায় না)। সুতরাং সাবান একটি উত্তম ইমালসন সৃষ্টিকারী পদার্থ। সাবান জলে দ্রবীভূত হলে আয়নীয় অংশ জলের সঙ্গে থাকে এবং হাইড্রোকার্বন বা অধ্রুবীয় অংশ জলের স্তরে বিপরীত দিকে থাকে। জলের মধ্যে সাবানের যে অণুগুলি থাকে সেইগুলি একত্রিত হয়ে একটি বিশেষ আকার গ্রহণ করে যার বাইরের দিকে আয়নীয় অংশ এবং ভিতরের দিকে হাইড্রোকার্বন অংশ থাকে। এই বিশেষ আকারবিশিষ্ট অণুসমূহকে মিসেলি বলে। এই মিসেলিগুলি জলের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে। পরিধেয় সামগ্রী বা শরীরের অংশ থেকে তেল জাতীয় ময়লা এই মিসেলির সংস্পর্শে এলে সাবানের হাইড্রোকার্বন অংশ ঐ তেলকে দ্রবীভূত করে পরিধেয় সামগ্রী হইতে অপসারিত করে দেয় এবং পরিধেয় জামাকাপড় পরিষ্কার হয়।

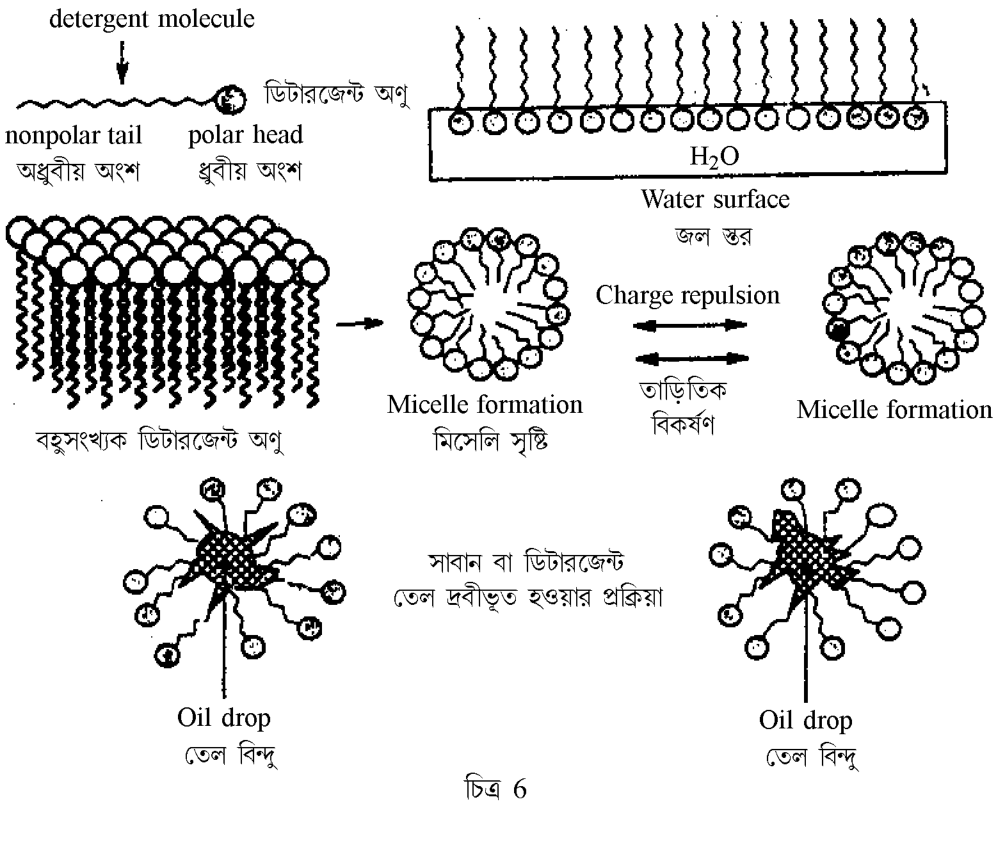

চিত্র 6

9.9 পরিষ্কারক (Detergents)

পরিষ্কারক কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ যাহা পরিধেয় সামগ্রীকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। পরিষ্কারক সাধারণত অ্যালকিল সালফোনিক অ্যাসিড ও অ্যালকিল বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ। পরিষ্কারকের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য আরও কিছু রাসায়নিক সামগ্রী মিশ্রিত করা হয়। এইসব রাসায়নিক সামগ্রীকে এক কথায় বিল্ডার্স বলে। এদের কার্যকারিতা নিম্নরূপ ঃ

1. অপঘর্ষক হিসাবে ক্যালসাইট, সূক্ষ্ম বালি মিশ্রিত করা হয়। ইহারা ময়লাকে ঘষে তুলে দিতে সাহায্য করে।
2. পরিষ্কারক হিসাবে অম্লজাতীয় পদার্থ সাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড এবং ক্ষারজাতীয় পদার্থ যেমন সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সিলিকেট মিশ্রিত করা হয়। এরা জামা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।
3. জীবাণুনাশকরূপে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট, পাইন তেল ব্যবহার করা হয়। এরা পরিধেয় সামগ্রীর জীবাণুকে ধ্বংস করে।
4. পুনঃস্থাপক রোধক রূপে পলিকার্বনেট ব্যবহার করা হয়। ইহা অপসৃত ময়লাকে পুনরায় জমতে বাধা দেয়।
5. পরিষ্কারককে সুদৃশ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন সংশ্লেষিত জৈব ও অজৈব রং ব্যবহার করা হয়। সুগন্ধি হিসাবে নানাপ্রকার জৈব সুগন্ধির মিশ্রণ এবং সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন জৈব যৌগ যেমন বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি টলুইন, গ্লুটার্যালডিহাইড যোগ করা হয়। এগুলি পরিষ্কারককে জারণ, ব্যাকটেরিয়া, পচন প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং পরিষ্কারকে দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

9.10 পরিষ্কারকের কার্যকারিতা

সাবানের ন্যায় পরিষ্কারক অণুতে একটি জলাকর্ষী আয়নীয় অংশ এবং একটি জল বিকর্ষী হাইড্রোকার্বন অংশ থাকে। ইহারা জলের সঙ্গে মিসেলি (ময়লা ও পরিষ্কারকের বিক্রিয়ায় উদ্ভুত) উৎপন্ন করে এবং ময়লা অপসারণ করে। পরিষ্কারকের ক্ষারকীয়তা সাবান অপেক্ষা কম। সুতরাং এরা সাবান অপেক্ষা প্রসাধন সামগ্রীর কম ক্ষতি করে। পরিষ্কারকের ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম লবণ জলে দ্রবীভূত হয় বলে এরা খর জলে সাবান অপেক্ষা অধিক কার্যকরী হয়। সাবান ব্যবহারের জন্য মৃদু জল আদর্শ কিন্তু পরিষ্কারক মৃদু বা খর যে কোন জলই ব্যবহার করা যায়।

9.11 পরিষ্কারক ও সাবানের মধ্যে পার্থক্য

পরিষ্কারক ও সাবান উভয়ের মধ্যেই জল বিকর্ষী বা জলাতঙ্কী হাইড্রোকার্বন অংশ এবং জলাকর্ষী আয়নীয় অংশ থাকে। পরিষ্কারক এমন একটি রাসায়নিক মিশ্রণ যার উপরিতল সক্রিয় পদার্থ এবং ফিলার বা উজ্জ্বল কারক বিল্ডার থাকে। বিল্ডারের উপস্থিতির জন্য পরিষ্করণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। পরিষ্কারকে জীবাণুনাশক পদার্থ যোগ করা হয়। পক্ষান্তরে সাবান একটি উচ্চ আণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট জৈব অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ। খর জলের মধ্যে দ্রাব্য ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম লবণ সাবানের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের অদ্রাব্য লবণ গঠন করে। ফলে ফেনা তৈরি ও পরিষ্কার করায় বাধা সৃষ্টি হয় এবং সাবানের অহেতুক অপচয় হয়। কিন্তু পরিষ্কারক খর জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করলেও উৎপন্ন পদার্থ হয় দ্রাব্য না হয় কলয়েড হিসাবে জলে দ্রবীভূত হয়। পরিষ্কারক জলীয় ও অজলীয় দ্রাবকে দ্রবীভূত করা যায় কিন্তু সাবান শুধুমাত্র জলে দ্রবীভূত হয়। পরিষ্কারকের ক্ষারকীয়তা সাবান অপেক্ষা কম সুতরাং ইহা পরিধেয়সামগ্রীর কম ক্ষতি করে। পরিষ্কারক অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে নর্দমার জলে পরিষ্কারক সঞ্চিত হয়ে জল দূষিত করতে পারে সেই জন্য বর্তমানে কিছু বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ (সহজে জীবাণু দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়) যোগ করা হয়। শর্করা সমন্বিত ধূলো-বালি দূর করার জন্য উৎসেচক অ্যামাইলেজ এবং তৈলাক্ত পদার্থ অপসারণের জন্য লিপিড ভাঙন উৎসেচক লাইপেজ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং পরিষ্কারক সাবান অপেক্ষা অধিক কার্যকরী।

পরিষ্কারক কিভাবে জল দূষণে সাহায্য করে তা নীচে খুব সংক্ষেপে বলা হল ঃ

দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত অ্যালকিল বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ পরিষ্কারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অ্যালকিল মূলকে যদি শাখা না থাকে (unbranched alkyl group) তবে ঐ পরিষ্কারক (linear alkyl sulphonates অথবা LAS) ব্যবহার করার পর প্রাকৃতিক অবনমন বা বিয়োজন ঘটে। সুতরাং এই পরিষ্কারক জল দূষণ করে না। কিন্তু অ্যালকিল মূলকে যদি শাখা থাকে (branched alkyl group) তবে ঐ পরিষ্কারক (alkyl benzene sulphonates অথবা ABS) দীর্ঘদিন অবিকৃত অবস্থায় বিরাজ করে এবং জল দূষণে সাহায্য করে।

তাছাড়া প্রস্তুতকারীরা এখন পরিষ্কারকের সঙ্গে নীচের অজৈব পদার্থগুলিও মিশিয়ে দেন। এগুলি হল—

(i) সোডিয়াম সালফেট 20%

(ii) অজৈব ফসফেট 30-50%

(iii) সোডিয়াম পারবোরেট ফ্লুওরিসিন এবং ফেনা উৎপাদনকারী কিছু পদার্থ

পরিষ্কারক ব্যবহার করার পর নর্দমা দিয়ে যখন এগুলি জলাশয়ে গিয়ে মেশে তখন অতিরিক্ত 'ফসফেট' থাকার ফলে ঐ জলাশয়ের জল অতিপৌষ্টিকতার (eutrophication) জন্য দূষিত হয়। ফসফেট পুষ্টিকর খাদ্যের উপস্থিতিতে নীলচে-সবুজ শ্যাওলা প্রচুর পরিমাণে বাড়তে থাকে। পরে এগুলি পচে গেলে বিয়োজনকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে জলজ প্রাণী ও মাছ অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়।

9.12 সারাংশ

এই এককের আলোচনা থেকে আপনি যা শিখেছেন তার সারসংক্ষেপ হল ঃ

- সাবান আসলে কি ধরণের রাসায়নিক পদার্থ
- উদ্ভিজ্জ তেল বা প্রাণীজ চর্বি থেকে কি পদ্ধতিতে সাবান প্রস্তুত করা হয়
- সাবান শিল্পে উপজাত হিসাবে গ্লিসারিন পাওয়া যায়
- প্রসাধনী সাবান ও তরল সাবান প্রস্তুতির জন্য কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হয় এবং কিভাবে এগুলি প্রস্তুত করা হয়
- সাবানের গঠনাকৃতিতে দুটি প্রধান অংশ থাকে—জল আকর্ষী ধ্রুবীয় অংশ এবং জলাতঙ্কী অধ্রুবীয় অংশ—এরা কিভাবে কাজ করে
- পরিষ্কারক সাধারণত অ্যালকিল সালফোনিক অ্যাসিড ও অ্যালকিল বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ
- মৃদু ও খর জলে সাবান ও পরিষ্কারক কিভাবে কাজ করে এবং কোন্ জল সাবানের ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক এবং কেন
- মৃদু জল ও খর জল কাদের বলে। জলের খরতা কয় প্রকার ও কি কি? কিভাবে জলের খরতা দূর করা যায়
- খর জল ব্যবহারের অসুবিধাগুলি কি কি
- জলের খরতার মাত্রা মি. গ্রা./লি. বা ppm এককে প্রকাশ করা হয়

9.13 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ
   (a) সাবান তৈরির মূল বিক্রিয়াকে বলে ———।
   (b) সাবান শিল্পের মূল উপজাত পদার্থ ———।
   (c) শুধুমাত্র স্ফুটনের সাহায্যে জলের ——— দূর করা যায়।
   (d) পরিষ্কারকের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ যোগ করা হয় তাদের ——— বলে।
   (e) কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেটকে ——— বলে।
   (f) কাপড় পরিষ্কার করার জন্য ——— মৃদু বা খর উভয় জলেই ব্যবহার করা যায়।
2. সঠিক উত্তরটি বেছে নিন ঃ
   (a) সাবান শিল্পের মূল উপজাত পদার্থ গ্লিসারল/কষ্টিক সোডা/গ্লিসারাইল।
   (b) ময়লা কাপড় পরিষ্কার করার জন্য সাবান অপেক্ষা পরিষ্কারক অধিক কার্যকর/একই রকম কার্যকর/কম কার্যকর।
   (c) পারমুটিট পদ্ধতিতে জলের অস্থায়ী খরতা/স্থায়ী খরতা/স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় খরতা দূর করা যায়।
3. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ
   (a) বর্তমানে ব্যবহৃত সাবানগুলির একটি শ্রেণীবিভাগ করুন।
   (b) প্রসাধনী সাবান প্রস্তুতির জন্য কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন সেগুলি উল্লেখ করুন।
   (c) তরল সাবান কিভাবে প্রস্তুত করা হয় তা বর্ণনা করুন।
   (d) বিল্ডার্সের কার্যকারিতা উল্লেখ করুন।
   (e) পরিষ্কারক ও সাবানের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।
   (f) সাবানের কার্যকারিতা উল্লেখ করুন।
   (g) পরিষ্কারকে কি কি উৎসেচক ব্যবহার করা হয় তার উল্লেখ করুন।

(h) মৃদু জল ও খর জল বলতে কি বোঝেন?

(i) অস্থায়ী খর জলের মৃদুকরণ কিভাবে করা হয় তা বর্ণনা করুন।

(j) খর জলের ব্যবহারিক অসুবিধাগুলি কি কি তা বুঝিয়ে বলুন।

(k) জলের খরতার মাত্রা কিভাবে প্রকাশ করা হয়।

4. একটি পরিষ্কারকের সংযুতি শতাংশের উল্লেখ করুন।

9.14 উত্তরমালা

1. (a) সাবানীভবন

(b) গ্লিসারিন

(c) অস্থায়ী খরতা

(d) বিল্ডার্স

(e) পারমুটিট

(f) পরিষ্কারক

2. (a) গ্লিসারল

(b) অধিক কার্যকর

(c) স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় খরতা

3. (a) প্রসাধনী সাবান, কাপড় কাচার সাবান, দাড়ি কামানোর সাবান এবং তরল সাবান

(b) 5.5 দেখুন।

(c) 5.6 দেখুন।

(d) 5.8 দেখুন।

(e) 5.10 দেখুন।

(f) 5.7 দেখুন।

(g) 5.10 দেখুন।

(h) 5.12.1 এবং 5.12.2 দেখুন।

(i) 5.14.1 এবং 5.14.2 দেখুন।

(j) 5.15 দেখুন।

(k) 5.16 দেখুন।

4.	(i)	বোরাইল বেঞ্জিন সোডিয়াম সালফোনেট	7%
	(ii)	সোডিয়াম লরাইল সালফেট (সক্রিয় পদার্থ)	5%
	(iii)	সোডিয়াম সালফেট (বিল্ডার্স)	20%
	(iv)	সোডিয়াম ট্রাইপলিফসফেট (বিল্ডার্স)	40%
	(v)	টেট্রাসোডিয়াম পাইরোফসফেট (বিল্ডার্স)	10%
	(vi)	সোডিয়াম সিলিকেট (ফিলার)	3%
	(vii)	সোডিয়াম কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ	3%
	(viii)	সোডিয়াম পারবোরেট (বিরঞ্জক)	3-5%
	(ix)	জল	অবশিষ্ট

একক 10 □ প্রসাধন সামগ্রী এবং রঞ্জকপদার্থ (Cosmetics and Dyes)

গঠন

10.0 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
10.1 প্রসাধনী দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ
10.2 প্রসাধনী সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা
10.2.1 ট্যালকম্ পাউডার
10.2.2 ট্যালকম্ পাউডারের উপাদানিক গঠন
10.3 ক্রীম
10.3.1 উপাদানিক গঠন
10.4 চুলরঙিনকারক পদার্থ
10.4.1 অস্থায়ী রঞ্জক
10.4.2 অর্ধস্থায়ী রঞ্জক
10.4.3 স্থায়ী রঞ্জক
10.4.4 স্থায়ী চুলরঞ্জক উপাদান
10.5 হেয়ার স্প্রে
10.5.1 উপাদানসমূহ
10.5.2 হেয়ার স্প্রে-র বিষক্রিয়া
10.5.3 মূল্যায়ন
10.6 ওষ্ঠরঞ্জক
10.6.1 ওষ্ঠরঞ্জকের গুণাবলী
10.6.2 ওষ্ঠরঞ্জক তৈরীর উপাদানসমূহ
10.6.3 ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি
10.7 সারাংশ
10.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি
10.9 উত্তরমালা

10.0 প্রস্তাবনা

কসমেটিকস্ কথাটির উৎপত্তিতে Greek শব্দ 'Kosmetikos' থেকে। যার অভিধানগত অর্থ 'সাজসজ্জায় দক্ষ'। মানবসভ্যতার সৃষ্টির সময় থেকেই মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনে নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু সেগুলির প্রকৃতি ও উপকরণ সম্ভবন্ধে তাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। প্রসাধন সামগ্রীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের গুণাগুণ সম্ভবন্ধে একটি প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রসাধন দ্রব্যের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্ভবন্ধে ধারণা থাকিলে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে মিশরের রমণীরা চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চোখের পাতায় নানারকম অলংকরণ করতেন। পারস্য এবং রোমানরাও নিজেদের দেহের রং ফর্সা করিবার জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে (যেমন হলুদ, চন্দন) প্রাপ্ত নির্যাস মাখতেন এবং চোখ কালো করার জন্য ভূযাকালি ব্যবহার করতেন। প্রাচীনকালে চীন ও গ্রীসের মেয়েরাও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের কৌশল জানতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে হিন্দু রমণীরাও সিঁদুর ও মোম মিশ্রিত করিয়া মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতেন। ত্বক পরিষ্কারের জন্য এখনও দুধের সর, ময়দা, ব্যসন ইত্যাদি নানা উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে সাম্প্রতিককালে সাবান আর জলের সাহায্যে ত্বক পরিষ্কার করাটা সবচেয়ে জনপ্রিয় পন্থা।

বস্তুতপক্ষে আমরা আমাদের দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এবং স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে আকর্ষণ করার জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে যে সমস্ত পদার্থ ত্বক চর্চায় ব্যবহার করে থাকি তাদের প্রসাধনী দ্রব্য বা কসমেটিক্স বলা হয়।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি যে বিষয়গুলি সম্ভবন্ধে অবহিত হবেন এবং নিজের হাতে কিছু করার জন্য চেষ্টা করতে পারবেন সেগুলি হল—

- প্রসাধন সামগ্রী বলতে কি বোঝায় এবং এগুলির শ্রেণীবিভাগ
- ট্যালকম্ পাউডারের উপাদানগুলি কি কি হতে পারে
- আমরা যে ক্রীম ব্যবহার করি সেগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি কেমন এবং কি কি পদার্থ ব্যবহার করা হয়
- চুলরঙীনকারক পদার্থ কতরকম হতে পারে। স্থায়ী চুলরঞ্জক প্রস্তুতির সময় কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে
- ওষ্ঠরঞ্জক পদার্থের গুণাবলী কি কি, এদের তৈরি করার জন্য কি ধরনের উপাদান প্রয়োজন এবং সংযুতি সম্ভবন্ধে ধারণা

10.1 প্রসাধনী দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

ব্যবহারের ভিত্তিতে প্রসাধনী দ্রব্যসমূহকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন—

1. ইমালসন হিসাবে—ক্রীম বা লোশন
2. পাউডার হিসাবে—ফেস পাউডার, ট্যালকম্ পাউডার
3. প্রলম্বিত মিশ্রণ হিসাবে—পাউডারকে কোন উপযুক্ত তরলে মিশ্রিত করে
4. কাঠ বা স্টীক হিসাবে—লিপিস্টিক, কাজল

10.2 প্রসাধন সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

10.2.1 ট্যালকম্ পাউডার

ট্যালকম্ পাউডারের প্রধান কাজ হল ত্বকের মধ্যে অবশিষ্ট জল বা ঘাম শোষণ করা। যাদের ত্বক খুব তৈলাক্ত বা রুক্ষ্ম তাদের পক্ষে ট্যালকম্ পাউডার ব্যবহার করলে ত্বকের মসৃণতা ফিরে আসে এবং ত্বক স্বাভাবিক হয়ে উঠে। ট্যালকম্ পাউডারে সুগন্ধি (এসেনসিয়াল তেল) মিশ্রিত করা থাকে বলে দেহমনে সতেজ ভাব নিয়ে আসে, ইহার ব্যবহারে শরীরে স্নিগ্ধ ও শীতল অনুভূতির সৃষ্টি হয়, কারণ ট্যালকমের সূক্ষ্মকণাগুলির পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বেশী হওয়ার জন্য পৃষ্ঠতল থেকে তাপ বিকিরিত হয় বলে মনে করা হয়।

10.2.2 ট্যালকম্ পাউডারের উপাদানিক গঠন

ট্যালকম্ পাউডারের মূল উপাদান ট্যালকের খুব সূক্ষ্মকণা, ইহা মূলতঃ ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট, ট্যালক্ খুব নরম ও সাবানের মত পিচ্ছিল বলে ইহাকে ‘সোপস্টোন’ বলে। ত্বকে আটকে রাখার জন্য পাউডারের সহিত ধাতব স্টিয়ারেট মেশানো হয়। ট্যালকম্ পাউডারের নমুনা উপাদানিক গঠন নিম্নরূপ।

1. ট্যালক্—অতিরিক্ত জল বা ঘাম শোষণ করে।
2. বোরিক অ্যাসিড—ত্বকের উপর অ্যাসিড বা ক্ষারের সমতা বজায় রাখে।
3. জিঙ্ক অক্সাইড—সাদা আভা সৃষ্টির জন্য।
4. ক্যালসিয়াম কার্বনেট—ঘাম শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
5. ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট—ঘাম শোষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

6. স্টার্চ—তৈলাক্ত পদার্থ শোষণ করে।

7. সুগন্ধি—উপাদানিক গন্ধ চাপা দেওয়ার জন্য এবং মনোরম গন্ধ সৃষ্টির জন্য।

উপাদানগুলিকে অনুভূমিক মিশ্রণের মধ্যে ভালোভাবে মিশ্রিত করে পাউডারে পরিণত করা হয় ও প্যাকেটে ভর্তি করা হয়। ট্যালকম্ পাউডারে সাধারণত কোন রঞ্জক পদার্থ যোগ করা হয় না। প্রতিটি উপাদান ব্যাকটেরিয়া মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

নীচে ট্যালকম্ পাউডারের আরও উপাদান সংযুক্তি দেওয়া হল :

(a) 1. ট্যালক্—অতিরিক্ত জল ও ঘাম শোষণ করার জন্য—60%

2. কেওলিন—জল শোষণ করার জন্য—20%

3. জিঙ্ক-অক্সাইড—সাদা আভা সৃষ্টির জন্য—15%

4. জিঙ্ক স্টিয়ারেট—ত্বকে আটকে থাকার জন্য—5%

5. সুগন্ধি—উপাদানিক গন্ধ চাপা দেওয়ার জন্য এবং মনোরম গন্ধ সৃষ্টির জন্য—পরিমাণ মত

প্রতিটি উপাদান ব্যাকটেরিয়া মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

(b) 1. ট্যালক্—অতিরিক্ত জল ও ঘাম শোষণের জন্য—75%

2. কেওলিন—জলশোষণ করার জন্য—10%

3. সিলিকা—ত্বকে আটকে থাকার জন্য—2%

4. ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট—ঘাম ও শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য—6%

5. জিংক স্টিয়ারেট—ত্বকে আটকে থাকার জন্য—6%

6. সুগন্ধি—উপাদানিক গন্ধ চাপা দেওয়ার জন্য ও সুগন্ধ সৃষ্টির জন্য—1%

প্রতিটি উপাদান ব্যাকটেরিয়া মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

10.3 ক্রীম

আমাদের ত্বককে সুস্থ ও সতেজ রাখার জন্য ত্বকের পরিচর্যার প্রয়োজন। ত্বক পরিচর্যার জন্য ক্রীম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্রীম ত্বকের উপর একটা পাতলা আবরণ সৃষ্টি করে যার ফলে ত্বকে সরাসরি সূর্যকিরণ লাগতে পারে না এবং ত্বককে শুষ্ক হতে দেয় না। ত্বকে আস্তরণ থাকায়

সহজে বাহির হতে ধূলাবালি, ময়লা সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ক্রীম ত্বকের কোলাজেন তন্তুকে রক্ষা করে ত্বকের দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে। ক্রীমের বিভিন্ন উপাদান জলের সাথে মিশ্রিত করা হয়, যা ত্বককে শুষ্ক হতে বাধা দেয় এবং ত্বকের সিক্তভাব বজায় রাখে। ত্বকের কোলাজেন তন্তু নষ্ট হলে ত্বক শিথিল হয়ে যায়। আমাদের ত্বকে প্রধানতঃ তিনটি স্তর থাকে, যথা—এপিডারমিস, ডারমিস ও হাইপোডারমিস। এই স্তরগুলির আবার নানা উপস্তর আছে। যেখানে অসংখ্য গ্রন্থি বর্তমান। এই গ্রন্থিগুলি থেকে অসংখ্য নালিকা বের হয়ে একেবারে উপরের স্তরে এসে শেষ হয়েছে।

বয়স হলে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা, উজ্জ্বলতা, নমনীয়তা হ্রাস পায়। এর ফলে ত্বক শিথিল হয়ে পড়ে এবং ত্বকে অনেক ভাঁজ বা বলিরেখা দেখা দেয়। বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন গ্রন্থির তৈলাক্ত নিঃসরণ বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে, তাই ত্বক হারায় তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও নমনীয়তা। এসময় ত্বকের কোলাজেন ও ইলাস্টিন প্রোটিন ফাইবার (যা ধরে রাখে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা) ভীষণভাবে কমে যায়। তাই এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রীম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্রীম ব্যবহার করার আগে ত্বককে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া একান্ত জরুরী এবং পরিষ্কার করে ক্রীম ব্যবহার করা উচিত।

10.3.1 উপাদানিক গঠন

একটি আধুনিক ক্রীমের উপাদানিক গঠন নিম্নরূপ—

1. ভেসলিন, তরল প্যারাফিন ও ল্যানোলিনের আনুপাতিক মিশ্রণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

2. স্টিয়ারিক অ্যাসিড বা অলেয়িক অ্যাসিড এবং সিটাইল অ্যালকোহল—ত্বকের উপর ভেজা ভাবের সৃষ্টি করে।

3. ট্রাইসোডিয়াম ইডিটেট—সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে।

4. ডি. এম. ডি. এম. হাইড্যোনটয়েন এবং অ্যালকিল প্যারাবেনসমূহ—জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

5. ডিমিথিকোন—ফেনা উৎপাদনে বাধা সৃষ্টির জন্য।

6. জেরানিয়ল বা ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল, জৈব সুগন্ধি পদার্থ—সুগন্ধের জন্য ব্যবহার করা হয়।

7. ট্রাইইথানল অ্যামিন—ত্বকের অ্যাসিড ও ক্ষারের সমতা নিয়ন্ত্রণে (বাফার) ব্যবহার করা হয়।

8. জল—প্রয়োজনমত।

অন্য একটি ক্রীমের উপাদানিক গঠন নীচে দেওয়া হল—

1. গ্লিসারল মনো এবং ডাই-স্টিয়ারেট—ত্বকের উপর ময়লা দূর করে ত্বককে পরিষ্কার করে।

2. স্টিয়ারিক অ্যাসিড—ত্বকের উপর ভেজাভাবের সৃষ্টি করে।

3. সিটাইল অ্যালকোহল—ত্বকের উপর ভেজাভাবের সৃষ্টি করে।

4. আইসোপ্রোপাইল-মিরিসটেট—সুগন্ধের জন্য ব্যবহার করা হয়।

5. প্রোপিলিন গ্লাইকল ও সরবিটল সিরাপ—ত্বককে শুষ্ক হতে দেয় না।

6. ট্রাইসোডিয়াম ইডিটেট, প্যারাবিন—সংরক্ষকরূপে যাহাতে কোন ক্ষতিকারক জীবাণু ক্রীমকে নষ্ট করতে না পারে।

7. ট্রাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড, জিংক-অক্সাইড—সূর্যকিরণ থেকে ত্বককে রক্ষা করে।

8. ট্যালক্—পিচ্ছলকারী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

9. রঞ্জকপদার্থ—সুদৃশ্য করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

10. জল—প্রয়োজন মত।

10.4 চুলরঙীনকারক পদার্থ (Hair Dyes)

আমাদের দেশে নারী পুরুষ প্রায় সকলেই চুল সাজানোর জন্য বিভিন্ন রঞ্জকপদার্থ ব্যবহার করে থাকেন। এইসব পদার্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল চুলকে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং আবহাওয়ার ভিন্নতা যেমন—বায়ু, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, শৈত্যতা, তাপ, সূর্যালোক প্রভৃতি থেকে চুলকে রক্ষা করা এবং চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো। চুলের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও সাদা চুল কালো ও রঙীন করার জন্য চুলে বিভিন্নরকম প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম রঞ্জকপদার্থ ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক রং-এর মধ্যে প্রধান হল হেনা। এটি মেহেন্দি গাছের পাতায় পাওয়া যায়। হেনার মধ্যে যে রঞ্জকটি থাকে তার নাম 'লাইসোন'। হেনা ব্যবহারের সুবিধা হল এটি ত্বকে জ্বালার সৃষ্টি করে না এবং স্থায়ীভাবে ত্বকে কোন বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ইহা হইতে প্রাপ্ত বর্ণ তুলনামূলকভাবে স্থায়ী এবং ইহা কেশরন্ধ্রে জমা হয় না।

আর চুলের কৃত্রিম রং হিসাবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন অ্যামিনোফেনল (জৈব যৌগ)। ইহার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ অন্যান্য পদার্থ মিশিয়ে রং প্রস্তুত করা হয়।

এইসব রঞ্জকপদার্থের কার্যকারিতা অনুযায়ী এদের মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

1. অস্থায়ী রঞ্জক
2. অর্ধস্থায়ী রঞ্জক
3. স্থায়ী রঞ্জক

10.4.1 অস্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জকপদার্থগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির। দু-একবার সাবান বা শ্যাম্পু করলেই রঞ্জকপদার্থটি চুল হতে অপসারিত হয়। এই পদার্থগুলি চুলের উপরে একটি অস্থায়ী রঙীন আস্তরণ সৃষ্টি করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন—অ্যাজোডাই, অ্যানথ্রাকুইনোন, ট্রাইফিনাইল মিথেন ইত্যাদি।

10.4.2 অর্ধস্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জকপদার্থগুলি ফেনা সৃষ্টিকারী সাবান বা শ্যাম্পুর উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহারাও চুলের উপর একটি পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করে। যেমন—নাইট্রোফেনিলিন ডাই-অ্যামিন।

10.4.3 স্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। এইসব স্থায়ী রঞ্জক যখন চুলে প্রয়োগ করা হয় তখন রঞ্জকটি বর্ণহীন থাকে। কিন্তু প্রয়োগের পর সূর্যালোক ও বাতাসের উপস্থিতিতে জারণের ফলে অভিষ্ট রং-এ রঞ্জিত হয়।

(a) চুলের স্থায়ী রং সৃষ্টির জন্য প্রধানতঃ তিন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। যেমন—

1. **ক্ষারক জাতীয় পদার্থ** : ইহারা সাধারণত অ্যারোমেটিক জৈব ক্ষারক, যাহারা সহজেই জারিত হয়। যেমন—প্যারা-অ্যামিনোফেনল, প্যারাডাই-অ্যামিনো অ্যানিসোল, প্যারাটলুইন ডাই-অ্যামিন ইত্যাদি। ইহাদের বিষক্রিয়া আছে এবং ত্বকে জ্বালা সৃষ্টি করে।

2. **সংযোজক বা পরিবর্তক পদার্থ** : ইহারাও সাধারণত অ্যারোমেটিক জৈব ক্ষারক কিন্তু সহজেই জারিত হয় না। যেমন—রেসরসিনল (সবুজাভ), মেটা-অ্যামাইনোফেনল (ম্যাজেন্টা-বাদামী) ইত্যাদি।

3. **জারক পদার্থ** : ইহারা রঞ্জকপদার্থকে জারিত করে অভীষ্ট রং-এ রঞ্জিত করে। যেমন—হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, ইউরিয়া পারঅক্সাইড ইত্যাদি।

(b) স্থায়ী চুলরঞ্জক প্রস্তুতির সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

1. **রঞ্জক বনিয়াদ** : স্থায়ী রঞ্জক প্রস্তুতির সময় কি ধরনের বনিয়াদ হবে অর্থাৎ বনিয়াদের প্রকৃতি যেমন— দ্রবণ, ইমালসন, জেল, শ্যাম্পু বা পাউডার কি হবে, তা আগে ঠিক করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচন করতে হবে।

2. **রং উৎপাদক উপাদান** : জারণযোগ্য জৈব ক্ষারক এবং উপযুক্ত সংযোজক।

3. **ক্ষার নির্বাচন** : সাধারণত জৈব ক্ষার বা অ্যামোনিয়ার দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

4. **জারণ রোধক** : রঞ্জকটি ব্যবহারের আগে যাতে সূর্যালোক ও বায়ুর দ্বারা জারিত না হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য ইহাতে সালফাইট বা অ্যামোনিয়াথায়োগ্লাইকোলেট যোগ করা হয়।

10.4.4 স্থায়ী চুলরঞ্জক উপাদান

1. প্যারা-অ্যামিনোফেনল, অর্থো-অ্যামিনোফেনল, প্যারা-টলুইন ডাই-অ্যামিন—ক্ষারক রূপে।

2. রেসরসিনল, মেটা-অ্যামিনোফেনল—সংযোজক ও পরিবর্তক রূপে।

3. সোডিয়াম সালফাইড, মেটালিনিক অ্যাসিড—বিজারক রূপে।

4. আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল—দ্রাবক রূপে।

রং উৎপাদনের উপাদানসমূহ শ্যাম্পুতে দ্রবীভূত করে রাখা হয় এবং ব্যবহারের সময় হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া সঙ্গো সঙ্গো চুলে প্রয়োগ করা হয় এবং 20-30 মিনিট অপেক্ষা করার পর রং ফুটে উঠলে জল দিয়ে চুল ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। লেড, সিলভার ও কপারের যৌগ ব্যবহার করলে রং-এর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে আলো, বাতাসের উপস্থিতিতে অদ্রাব্য অক্সাইড ও সালফাইড উৎপন্ন হয় এবং জারণের ফলে কুইনোনিমিন যৌগ উৎপন্ন হওয়ার ফলে চুলে রং ধরে যায়।

10.5 হেয়ার স্প্রে

চুলের স্প্রে এমন একটি উদ্বায়ী তরল পদার্থ যা চুলে স্প্রে করলে সহজেই দ্রুত বাষ্পীভূত

হয়ে যায় এবং চুলকে সহজেই নিয়ন্ত্রিত করা যায় ও চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখে। চুলের স্প্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল চুলের উপর অদৃশ্য একধরনের পলিমারের পাতলা আবরণের প্রলেপ দেওয়া, যা বাইরের কোন বস্তু থেকে চুলকে রক্ষা করে। উদ্বায়ী তরল দ্রুত বাষ্পীভূত হলে চুল সঠিক স্থানে থাকিয়া যায়।

10.5.1 উপাদানসমূহ

চুলের স্প্রে-এর প্রধান উপাদানগুলি হল পলিমার, দ্রাবক, প্লাস্টিসাইজার, নিউট্রালাইজার সুগন্ধি দ্রব্য ও অন্যান্য অ্যাডিটিভ দ্রব্য।

পলিমার হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৃত্রিম পলিমারগুলি হল—পলিভিনাইল, পাইরোলিডোন বা পলিভিনাইল অ্যাসিটেট।

দ্রাবক হিসাবে বিশুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়।

প্লাস্টিসাইজার হিসাবে বিভিন্ন ইথার, ফিনাইল মিথাইল সিলিকোন, সিলিকোন-গ্লাইকল, কো-পলিমারের যে আস্তরণের সৃষ্টি হয় তাকে নমনীয় করা এবং সঠিক স্থানে চুলকে বিন্যস্ত রাখা। রেজিনের অ্যাসিডমাত্রার উপর নির্ভর করে নিউট্রালাইজার যোগ করা হয়। বর্তমানে হেয়ার স্প্রে-এর মান উন্নত করতে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, প্রোভিটামিন ও সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়।

একটি সাধারণ হেয়ার স্প্রে-এর মধ্যে মোটামুটি রেজিন (প্রধানতঃ, করায়াগাম, অ্যাকাসিয়াগাম, ট্রাগাকান্‌ঙগাম), অনার্দ্র ইথাইল অ্যালকোহল (স্প্রে সৃষ্টিকারী পদার্থের আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রতিহত করার জন্য) 40%, ভিনাইল-অ্যাসিটেট, ক্রোটানিক অ্যাসিড কো-পলিমার 1.2%, সুগন্ধি দ্রব্য 0.05%, পান্থানল 0.2%, বাকি অংশে জল থাকে।

পূর্বে হেয়ার স্প্রে-এর দ্রাবক হিসাবে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন ব্যবহার করা হত কিন্তু দূষণগত কারণে বর্তমানে ইহার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন-এর বিকল্প দ্রাবক হিসাবে হাইড্রোকার্বন (বিউটেন, আইসো-বিউটেন) ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু হাইড্রোকার্বন ব্যবহারের ফলেও নিম্নলিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

1. এই হাইড্রোকার্বনসমূহ উন্নতমানের দ্রাবক নয়। সাহায্যকারী দ্রাবক হিসাবে মিথিলিন ক্লোরাইড ও জল মিশানো হয়।

2. এই হাইড্রোকার্বনসমূহ খুব বেশী পরিমাণে দাহ্য।

10.5.2 হেয়ার স্প্রে এর বিষক্রিয়া

1. অসাবধানতাবশতঃ হেয়ার স্প্রে ফুসফুসে প্রবেশ করলে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগের সৃষ্টি হয়।

2. ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনযুক্ত অ্যারোসল, অ্যারোসল স্প্রে অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহারের ফলে হৃদরোগের সম্ভভাবনা দেখা যায়।

10.5.3 মূল্যায়ন

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন—আস্তরণের কাঠিন্য, উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, দ্রাব্যতা, চুলে আটকে থাকা, প্রয়োজনে সহজেই দূরীভূত করা ইত্যাদি নির্ধারণ করে কোন্ রেজিন ব্যবহৃত হবে।

10.6 ওষ্ঠরঞ্জক (Lipstick)

ঠোঁটের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য এই জাতীয় রঞ্জকপদার্থ দণ্ডের ন্যায় আকারযুক্ত করে বিক্রি করা হয়ে থাকে। যদিও প্রধানতঃ মহিলাদের মধ্যে লিপস্টিকের ব্যবহার বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তথাপি উপযুক্তভাবে ইহার ব্যবহার অনেক মহিলা ও পুরুষকে সুদর্শনা ও সুদর্শন করে তোলে। যেহেতু লিপস্টিকের মূল উপাদান তৈল বা চর্বি এবং মোম তাই ইহার ব্যবহারের ফলে ঠোঁট মোলায়েম থাকে ও ফাটা থেকে রক্ষা পায়।

10.6.1 ওষ্ঠরঞ্জকের গুণাবলী

ভালো লিপস্টিকের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন :

1. ভালো লিপস্টিক যেন ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শক্ত না হয়ে যায়।

2. অসাবধানতাবশতঃ শরীরের ভেতরে প্রবেশ করলে ভেতরের অংশের উপর যেন কোন প্রভাব সৃষ্টি না করে।

3. ব্যবহার করা সুবিধাজনক হওয়া চাই এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লিপস্টিক যেন সহজেই দূরীভূত করা যায়।

4. সহজেই যেন জলে দ্রবীভূত না হয়।

10.6.2 ওষ্ঠরঞ্জক তৈরীর উপাদানসমূহ

লিপস্টিক তৈরীতে ব্যবহৃত মূল উপাদানগুলি হল—কৃত্রিম রেজিন, মোম এবং রঞ্জকপদার্থ।

কৃত্রিম রেজিন হিসাবে ব্যবহৃত উপাদানগুলি হল কারবোমার, পলি ইথিলিন, ইত্যাদি।

ব্যবহৃত মোমের মধ্যে ক্যান্ডেলিলা-মোম, কারনোবা-মোম, মৌমাছি-মোম, পেট্রোলিয়ামঘটিত মোম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ঠোঁটের চকচকে ভাব আনতে এবং স্থায়ীত্বের জন্য যথাক্রমে প্রোপিলিন গ্লাইকল এবং কিছু বিশেষ ধরনের পলিমার ব্যবহার করা হয়।

লিপস্টিকে ব্যবহৃত রং অবশ্যই স্বীকৃত হওয়া চাই। এই ধরনের রং অবশ্যই ঠোঁটে ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়া চাই। রংগুলি যেন ঠোঁটে কোন ক্ষতিসাধন না করে বা জলে সহজেই দ্রবীভূত না হয়। সাধারণতঃ ঠোঁটে দুইভাবে রং করা হয়—

1. রঞ্জকপদার্থ দ্বারা প্রলেপ দিয়ে
2. একটি স্তরের সাহায্যে ঠোঁটের অসমৃণ চেপে রেখে

বর্তমান প্রচুর পরিমাণে যে রঞ্জকপদার্থগুলি লিপস্টিক উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে জলে দ্রাব্য ইওসিন এবং ফ্লুওরেসিন-এর হ্যালোজেন জাতকগুলির ব্যবহার সবচেয়ে বেশী।

10.6.3 ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি

একটি ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি মোটামুটি নিম্নরূপ—

1. কারনোবা-মোম—10%
2. পরিশোধিত মৌচাকের মোম—15%
3. ল্যানোলিন—5%
4. সিটাইল অ্যালকোহল—5%
5. ক্যাস্টর অয়েল—60%
6. স্বীকৃত অদ্রাব্য জৈব রং—1-5%
7. সুগন্ধি—2%
8. জারণ রোধক—0.1%

এক্ষণে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওষ্ঠরঞ্জক প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব পণ্যসামগ্রীর উৎকর্ষতা ও আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদার্থ ব্যবহার করে থাকেন। এইসব পদার্থের নাম ও শতকরা মাত্রা প্রকাশ করেন না, বাণিজ্যিক গোপনীয়তার (trade-secret) জন্য।

10.7 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি যে বিষয়গুলি জানতে পারলেন তার সার-সংক্ষেপ হল—

- ট্যালকম্ পাউডারের মূল উপাদান কি? এই পাউডার তৈরি করতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট এবং জিঙ্ক স্টিয়ারেটের প্রয়োজনীয়তা কোথায়

- বয়স বৃদ্ধির সঙ্গো সঙ্গো ত্বক তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও নমনীয়তা হারায় কেন? এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রীম ব্যবহার করার উপকারীতা কতখানি
- একটি আধুনিক ক্রীমের উপাদানগুলি কি কি
- চুলরঞ্জকপদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি কেমন, স্থায়ী চুলরঞ্জকপদার্থ প্রস্তুত করার সময় কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে
- চুলে স্প্রে করার উদ্দেশ্য কি? সাবধানতা অবলম্বন না করলে কি কি অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে
- একটি ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি সম্বন্ধে ধারণা

10.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

(A) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

1. ট্যালকম্ পাউডার ব্যবহৃত ট্যালক্ আসলে ——।

2. —— একটি সুগন্ধি দ্রব্য।

3. ট্রাইসোডিয়াম ইউটেট —— হিসাবে কাজ করে।

4. হেনায় যে রঞ্জক পদার্থটি থাকে তাকে —— বলে।

5. ত্বকের —— তন্তু নষ্ট হলে ত্বক শিথিল হয়ে যায়।

(B) সঠিক উত্তরটি লিখুন :

1. রেসরসিনল চুলে লাল / সবুজ / হলুদ রং করার জন্য ব্যবহার কার হয়।

2. একটি অস্থায়ী চুল রঞ্জকপদার্থ হল অ্যানথ্র্যাকুইনোন / নাইট্রোফেনিলিন ডায়ামিন / প্যরাঅ্যামিনো ফেনল।

3. ক্রীম ত্বকে আটকে থাকার জন্য জিংক স্টিয়ারেট / জিরানিয়ন / ডিথিথিকোন ব্যবহার করা হয়।

4. চুল রঞ্জকপদার্থে ব্যবহৃত জারক পদার্থটির নাম হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড / অ্যানথ্র্যাকুইনোন / ট্যালক্।

5. ওষ্ঠরঞ্জকের লাল রং করার জন্য ব্যবহৃত হয় টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড / রুজ / রোডথিন।

(C) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

1. চুলে স্থায়ী রং সৃষ্টির জন্য যে তিন প্রকার রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয় সেগুলি কি?

2. স্থায়ী চুলরঞ্জকের দুটি সংযোজক পদার্থের নাম লিখুন।

3. স্থায়ী চুলরঞ্জকে জারকরোধক পদার্থ মেশান হয় কেন? একটি জারক রোধক পদার্থের নাম লিখুন।

4. হেনারেঙ (henareng) বলতে কি বোঝেন?

5. চুলের রঞ্জকে ব্যবহৃত দুটি প্লাস্টিসাইজারের নাম লিখুন।

6. চুলের স্প্রেতে হাইড্রোকার্বন ব্যবহারের কি কি অসুবিধা তা উল্লেখ করুন।

7. চুলের স্প্রে ব্যবহারের কুফল কি তা উল্লেখ করুন।

8. আধুনিক ক্রীমের উপাদানগুলি কি কি তা উল্লেখ করুন।

9. ট্যালকম্ পাউডারের উপাদানগুলি লিখুন।

10. চুলরঞ্জক হিসাবে হেনা ব্যবহারের সুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

11. একটি ভাল ওষ্ঠরঞ্জকের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন।

(D) উদাহরণ দিন :

1. চুলরঞ্জকপদার্থে ব্যবহৃত হয় এমন একটি জারক দ্রব্যের উদাহরণ দিন।

2. একটি প্রাকৃতিক রঞ্জপদার্থের উদাহরণ দিন।

3. ওষ্ঠরঞ্জকের অস্বচ্ছতা সৃষ্টিকারী পদার্থের উদাহরণ দিন।

10.9 উত্তরমালা

(A)

1. ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট
2. জিরানিয়ল
3. সংরক্ষক
4. লাইসোন
5. কোলাজেন

(B)

1. সবুজ
2. অ্যানথ্র্যাকুইনোন
3. জিংক স্টিয়ারেট

4. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড

5. রুজ

(C)

1. 4.4.3 দেখুন।

2. রেসরসিনল ও মেটা-অ্যামিনোফেনল।

3. রঞ্জকপদার্থটি ব্যবহারের আগেই যাতে আলো ও বায়ুর সংস্পর্শে জারিত না হয়ে যায় তার জন্য রঞ্জকপদার্থটির সহিত জারণরোধক পদার্থ মিশ্রিত করা হয়। জারণরোধক পদার্থ— অ্যামেনিয়াম থায়োগ্লাইকোলেট।

4. নীলগাছের পাতার পাউডারের সঙ্গে হেনার মিশ্রণ নীলাভ-কালো রং উৎপন্ন করে, এই মিশ্রণকে হেনারেঙ বলে।

5. 4.5.1 দেখুন।

6. (a) হাইড্রোকার্বন ভাল দ্রাবক নয়। সে জন্য হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে দ্রাবক হিসাবে মিথিলিন ক্লোরাইড ও জল মেশাতে হয়।

(b) হাইড্রোকার্বন অত্যন্ত দাহ্য।

7. (a) স্প্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করলে বিভিন্ন শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগের সৃষ্টি হয়।

(b) অ্যারোসল স্প্রে ব্যবহারের হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভভাবনা থাকে।

8. 4.3.1 দেখুন।

9. 4.2.2 দেখুন।

10. হেনা ত্বকে জ্বালা সৃষ্টি করে না, স্থায়ীভাবে কোন বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, কেশরন্ধ্রে জমা হয় না।

11. 4.6.1 দেখুন।

(D)

1. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড

2. হেনা (ইহাতে লাইসোন থাকে)

3. টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড

গ্রন্থপঞ্জী (Reference Books)

1. Ranken, M. D. : *Food Industries Mannual,* 1984, Leonard Hill, London, 21. Edn.
2. Ghosh, U., Choudhuri, D. R., Gangopadhyay, H. : *Controlled & Modified Atmosphere Storage Studies on Fruits, Vegetables & Flowers,* 2.vols., 1997, FTBE, Jadavpur University, Kolkata.
3. Srilakshmi, B. : *Food Science,* 1997, New Age International (P) Ltd., Kolkata.
4. Manay, N. S. and Shadaksharaswamy, M. : *Food, Facts & Principles.* 1987, Wiley Eastern Ltd., Kolkata.
5. Mudambi, S. R., and Rajagopal, M. V. : *Fundamentals of Foods and Nutrition,* 1990, Wiley Eastern Ltd., Kolkata.
6. Mukherjee, S. and Lodh, S. C. : *A guide to Applied Nutrition,* 1999, Granthalaya P. Ltd., Kolkata.
7. Ayres, J. C. and Kirschman, J. C. : *Impact of Toxicology on Food Processing,* 1981, Avi Publishing Co., Westport, Conn.
8. Underkoffler and Hickey : *Industrial Fermentation.*
9. Prescott & Dunn. : *Industrial Microbiology.*
10. Banwart, G. T. : *Basic Food Microbiology.*